সুবোধ ঘোষের

শ্রেষ্ঠ গল্প

প্রকাশভবন

১৫, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

প্রথম সংস্করণ—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৫৬

প্রকাশক
শ্রীশচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
প্রকাশভবন
১৫ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট,
কলিকাতা—৭৩

মুদ্রাকর
শ্রীসুবীর কুমার সিকদার
সিকদার প্রিণ্টার্স
১৫এ, নলিন সরকার স্ট্রীট,
কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা
আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

লেখক পরিচিতি

জন্ম হাজারিবাগে, ১৯১০ সালে। পৈতৃক নিবাস বিক্রমপুরের বহর গ্রামে। সাহিত্যক্ষেত্রে অত্যল্পকালের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন আধুনিককালে একমাত্র সুবোধ ঘোষের পক্ষেই সম্ভব হয়েছে। 'আনন্দবাজার পত্রিকা'র প্রধান পরিচালক ও অন্যতম স্বত্বাধিকারী শ্রীসুরেশচন্দ্র মজুমদারের বিশেষ অনুগ্রহপূর্ণ সহায়তায় সুবোধবাবু ১৯৪০ সালে হাজারিবাগ থেকে কলকাতায় এসে সাংবাদিকতার কাজে যোগদান করেন। তাঁর সাহিত্যরচনার আরম্ভ-কালও এই সময়। প্রথম রচনা, ছোট গল্প 'অযান্ত্রিক,' দ্বিতীয় রচনা 'ফসিল'।

হাজারিবাগের স্কুলে ও কলেজে শিক্ষালাভ করেন। ছাত্রাবস্থাতেই হাজারিবাগের ঋষি, বিখ্যাত দার্শনিক ও বহুভাষাবিৎ পণ্ডিত মহেশচন্দ্র ঘোষের উৎসাহে ও আনুকুল্যে তাঁর গ্রন্থাগারে অবাধ অধ্যয়নের সুযোগলাভ করেছিলেন! জীবিকা অর্জনের সূত্রে এবং দেশভ্রমণের আকাঙ্ক্ষায় ভারতের বহু স্থানে এবং ভারতের বাইরেও গিয়েছেন। কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় অভিজ্ঞতা ও ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিনি 'আনন্দবাজার পত্রিকার' সহযোগী সম্পাদক ছিলেন। বিবিধ বিজ্ঞান, ইতিহাস এবং ক্লাসিক সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ ছিল।

সুবোধ ঘোষের রচিত ছোটগল্পের বই 'ফসিল', 'পরশুরামের কুঠার', 'শুক্লাভিসার', 'গ্রামযমুনা' ও 'মনিকর্ণিকা'। উপন্যাস—'তিলাঞ্জলি' 'একটি নমস্কারে', 'গঙ্গোত্রী' ও 'শতভিষা'। নৃতত্ত্ব সম্বন্ধে একখানি বই—'ভারতের আদিবাসী': 'ভারতীয় ফৌজের ইতিহাস' নামে একটি ঐতিহাসিক সন্দর্ভ এবং 'সিগমুণ্ড ফ্রয়েড্' নামে মনোবিজ্ঞানের একটি বই লিখেছেন। শিল্পকলার সমালোচনারূপে 'রঙ্গবল্লী' নামেও একটি গ্রন্থ আছে।

ভূমিকা

১

"ছয় রাগ আর ছত্রিশ রাগিণীর কৃপা ভরসা ক'রে থাকলে আর চলবে না। নতুন এক রাগ-সৃষ্টির লগ্ন ঘনিয়ে এসেছে। আজ ভারতবর্ষ আর নারদ ঋষির দেশ নয়—সারা পৃথিবীর আত্মীয়। গীতময় ভারতের আকাঙ্ক্ষা আজ এক নতুন সুরস্বরূপকে খুঁজছে। গুণীর কাজ তাকে আবিষ্কার করা, তাকে চেনা, তাকে পূর্ণতা দেওয়া। মিঞা তানসেন একদিন তাই করেছিলেন। কিন্তু তারপর? তার পর থেকে যুগের বাতাসে আমাদের জীবনে কত নতুন পাখি ডেকে গেল—আরও কত বিচিত্র ডাক এসেছে, কিন্তু নতুন মুরলী আর তৈরি হল না।......"

সুবোধ ঘোষের প্রথম উপন্যাস 'তিলাঞ্জলি'র সুরস্রষ্টা নায়ক এই মুরলীরচনার স্বপ্ন দেখেছিল। গীতময় ভারতের নতুন সুরস্বরূপের নাম সে দিয়েছিল 'রাগ-মহাদেশ'। সুবোধ ঘোষের নিজেরও শিল্পসাধনার মর্মমূলে রয়েছে এই 'রাগ-মহাদেশ' সৃষ্টির কল্পনা। যে ভারতবর্ষ সারা পৃথিবীর আত্মীয়, তার সুখ দুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা বাংলা সাহিত্যে নতুন নয়। কিন্তু এদেশ থেকে সহস্র যোজন দূরে লবণ-পারাবারের অপর প্রান্তে ওলন্দাজের দেশে মুদ্রালক্ষ্মী যেদিন বিধবা হয়, স্বর্ণমান বাতিল হয়ে বাট্টা আর বিনিময়ের হার পাল্টে যায় রাতারাতি; সেদিন সেই ক্ষুব্ধ বাণিজ্যবায়ু হুহু ক'রে আকাশ পাড়ি দিয়ে এসে কলকাতার বন্দরে নেমে কি ক'রে সৃষ্টি করে ইণ্ডিয়ান চেম্বারে বিষাদ, কি ক'রে ওলন্দাজ বাজারের সেই অভিশাপে ভারতের কোন্-এক চুরাশী পরগনার আখের ক্ষেতের কিষাণদের জীবন হয়ে ওঠে বিষজর্জর, রতনলাল শুগারমিলের ছাঁটাই-করা মজুরদের ধর্মঘট হয় অনিবার্য,—সে কথা ভারতীয় সাহিত্যে এর পূর্বে অমন শিল্পসুন্দর প্রতীতি নিয়ে আর বলা হয়নি। শুধু তাই নয়, সুবোধ ঘোষই বিশেষ ক'রে বাংলার ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম ক'রে সাহিত্যের ক্ষেত্র প্রসারিত করলেন ভারতের আসমুদ্র-হিমাচলের বুকে। তিনিই প্রথম আমাদের নিয়ে গেলেন সামন্ততান্ত্রিক ভারতের পীঠস্থান দেশীয় রাজ্যের চিরনির্যাতিত প্রজাসাধারণের সমষ্টিবদ্ধ সুখ-দুঃখের রঙ্গভূমিতে। নিয়ে গেলেন গোত্রমর্যাদাহীন অনার্য মানবগোষ্ঠীর আরণ্য আবাসে। কখনো তাঁর সঙ্গে নেমেছি খনিময় ভারতের তমসাবৃত জঠরলোকে, পাতালপুরীর যে পান্থশালায় মৃত্যুকে প্রাণের মতই ঘনিষ্ঠ ভাবে অনুভব করা যায়;

কখনো বায়ুসমুদ্রে ডানা ঝাপটে মৃত্যুগর্ভ শাস্তির মেঘে চড়ে পেরিয়ে গিয়েছি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত, যেখানে তোচিখেল আর ওয়াজিরিস্তানের আজাদী এলাকার রাষ্ট্রহীন যুথচারী মানুষের সঙ্গে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে পুরাতন মৈত্রী। কখনো কালের যাত্রা স্তব্ধ হয়েছে সহস্রাধিক বৎসরের প্রাচীন কল্যাণঘাটের বিষ্ণুমন্দিরের শিলীভূত শিল্পবিভূতির বুকে, কখনো আবার নবপ্রবুদ্ধ ভারতের নতুন-সরাই এর মাটিতে শহীদ অনন্তরামের বিসর্জিত রক্তোরক্তে রচিত হচ্ছে এযুগের শিবালয়। একদিকে গ্রাম-যমুনার কূলে কূলে উল্লসিত হোলির উৎসব-রজনীতে বেজে উঠছে চিরন্তন প্রেমের বাঁশরী, অন্যদিকে কালিমা-কলঙ্কিত কলিয়ারির কোলে দিগন্তবিস্তৃত সবুজ মাঠে স্বর্ণমরীচিকার মত ভেসে আসছে ইরানী বেদেনীর মায়া—মেরুমরালের পাখার মত পথের প্রেমে যার স্নায়ুশিরা সতত চঞ্চল। ক্ষয়ে-যাওয়া ধ্বসে-পড়া প্রাচীন সমাজ ভেঙে গুঁড়িয়ে যাচ্ছে, আবার গড়ে উঠছে চলিষ্ণু মানুষের নতুন উপনিবেশ। সতত-পরিবর্তমান জীবনসংগ্রামে পরাজিত মানুষ যাচ্ছে নিশ্চিহ্ন হয়ে, তাদের স্থান দখল করছে নতুন যুগের নবজাতকের দল। পরিস্ফীত অর্থনীতির দৌলতে পুরাতন মূল্যবোধ যাচ্ছে অর্থহীন হয়ে, তার বদলে রচিত হচ্ছে নতুন দৃষ্টিভঙ্গী, নতুন জীবনচৈতন্য। স্খলিতগোত্র মানুষ ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে কেন্দ্রানুগ সমাজশক্তির বৃত্ত থেকে, আবার জিজীবিষু মানুষের নতুন সংসারের মেল বেঁধে দিচ্ছেন ইতিহাসের দেবীবর মিশ্র।...শুধু বাঙালীরই প্রাণের কথা, বাঙালীরই ঘরের কথা নয়;—বিচিত্র ভারতের বিপুল জীবনের কলধ্বনিমুখর এ সাহিত্য। বাংলার বাণীসাধনা প্রাদেশিকতার সীমানা পেরিয়ে স্পর্শ করেছে সারা ভারতের জীবনস্পন্দনকে। জনমানবের ঐকতান-যন্ত্রে জীবনের সিম্‌ফনিতে 'রাগ-মহাদেশে'র সৃষ্টি হচ্ছে।

২

বস্তুত বাংলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব যেমন আকস্মিক তেমনি চমকপ্রদ। 'কল্লোল'-'কালিকলম'-'প্রগতি'-যুগের সৃষ্টিনিরীক্ষার মরশুমী অজস্রতার অবসানের পর যেমন বিভূতিভূষণের 'পথের পাঁচালী', তারাশঙ্করের 'জলসাঘর'; মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' ও 'পদ্মানদীর মাঝি' নবযুগসৃষ্টির প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছিল, তেমনি হঠাৎ ১৯৪০ সালে সুবোধ ঘোষের 'অযান্ত্রিক' ও 'ফসিল' গল্প দুটি বাংলা সাহিত্যের আঙিনায় নবপ্রতিভার আবির্ভাব ঘোষণা ক'রে দিল। অবিশ্বাস্য বলেই মনে হবে, কিন্তু 'অযান্ত্রিকে'র মত সর্বাঙ্গসুন্দর গল্পটিই নাকি লেখকের প্রথম রচনা। 'অযান্ত্রিকে' যন্ত্রযুগ যেন কথা কয়ে উঠল। জড়ে আর জীবে, যন্ত্রে আর

মানুষে এযুগের জীবন যে অবিচ্ছেদ্য ভাবে গ্রথিত, এই সত্যই যেন নতুন করে উদ্ভাসিত হল এই গল্পে। সুবোধ ঘোষের শিল্পিমানসে যন্ত্রযুগের প্রভাব যে কত গভীর, তার প্রমাণ পাই আরেকটি গল্পে, যেখানে যন্ত্রই মানুষের দেহযন্ত্রের উপমান হয়ে উঠেছে। পরিশ্রান্ত শ্রমজীবীর বর্ণনায় তিনি বলছেন, "সকাল সাড়ে ন'টা থেকে হাজারিমলের অটোমবিল স্টোরে হিসেব ক'ষে ক'ষে সন্ধ্যে ছটার সময় যখন কান্তিকুমারের মাথার ভেতর পিস্টনগুলি ক্ষয়ে গিয়ে ঝিমঝিম ক'রে থাকে, ঘাড়ের কাছে স্নায়ুর গিঁটগুলিতে স্পার্কের শক লাগে, বুকের ভেতর ফ্যানবেল্ট ছিঁড়ে গিয়ে দম ফুরিয়ে আসে—তখন ছুটি হয়।" এখানে যেমন পরশ্রমজীবী মানুষের কর্মশালায় মানুষও যন্ত্রের সামিল হয়ে উঠেছে, তেমনি 'অযান্ত্রিক' গল্পে যন্ত্রের প্রতি মানুষের মমতা, তার মান-অভিমান, রাগ-অনুরাগ-মিশ্র নৈষ্ঠিক আসক্তি চেতনার এক নূতন প্রদেশ উদ্ঘাটিত করেছে। সাবেক আমলের একটা জীর্ণ ফোর্ড-গাড়ির প্রতি ট্যাক্সি-চালক বিমলের মমত্ববোধই এই গল্পের উপজীব্য। বিমলের আচরণ দেখে মনে হয়, সুদীর্ঘ দিনের এই সাথীর সঙ্গে যেন বোঝা-না-বোঝার অতীত এক রহস্যময় হৃদয়-সম্পর্ক তার গড়ে উঠেছে। মানুষের প্রেম যেন অচেতন যন্ত্রের বুকেও প্রাণের সাড়া জাগাতে পেরেছে।

ছোটগল্পের ক্ষেত্রে, বিষয়বস্তুর অভিনবত্ব ছাড়া ব্যঞ্জনাময় ভাষাপ্রয়োগের সূক্ষ্ম কারুকার্যেও গল্পটি মনে-রাখার মত। কিন্তু সুবোধ ঘোষের শক্তিমত্তার নিঃসংশয় প্রমাণ প্রথম পাওয়া গেল 'ফসিলে'র মধ্যেই। নানা কারণেই আধুনিক বাংলা কথাসাহিত্যে এই গল্পটি ঐতিহাসিক মর্যাদা পেয়েছে। এতদিন ধরে সাম্যবাদী সমাজবিজ্ঞানের যে বলিষ্ঠ ভরসা সাহিত্যে শুধু প্রচারকার্যই চালিয়ে যাচ্ছিল, 'ফসিলে' এসে তা প্রথম শিল্প হিসাবে সার্থক হয়ে উঠল। এখানেই প্রথম ব্যক্তিকেন্দ্রিক মন-দেয়া-নেয়ার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের পাশে দেখা দিল অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির উপর প্রতিষ্ঠিত সমবেত মানুষের দুঃখচেতনা। সাড়ে আটষট্টি বর্গমাইল আয়তনের দেশীয় রাজ্য অঞ্জনগড়। সাবেক কালের কেল্লার দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মত তামা আর লোহার ঢাল। মহারাজার ক্ষমতা নেই, কিন্তু ফিউডলী দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জৎ-কমপ্লেক্সে জর্জর চিরকেলে নরপালদের তিনিও একজন। লাঠিতন্ত্রের দাপটে রাজ্যের শাসন চলে। সেখানে এল একদিন সর্বনাশকারী বিদেশী বণিকসঙ্ঘ। প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হল ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততন্ত্রের সঙ্গে অমিতবিত্ত ধনিকতন্ত্রের। রাজার বিরুদ্ধে রাজ্যের নির্যাতিত প্রজাদের বিদ্রোহে উস্কানি দিতে লাগল বণিকসঙ্ঘ খনিতে নগদ মজুরীর লোভ দেখিয়ে। দরিদ্রের দুঃখে মা'র চেয়ে মাসিমার দরদ বেশি ক'রে উথলে উঠল। কিন্তু আকস্মিক দুর্বিপাকে যেদিন সত্যকার বিপদ এল ঘনিয়ে, সেদিন দেখা গেল প্রবুদ্ধ জনশক্তির সংগ্রামী চেতনার সম্মুখে বেসামাল শাসক আর

বণিকশক্তি পরস্পরের বৈরিতা ভুলে গিয়ে একযোগে বিদ্রোহ-বিনাশ-যজ্ঞের আয়োজন করছে। খনিগর্ভে ধ্বসে-পড়া পীটের তলায় প্রোথিত হচ্ছে জনমানবের বিপ্লবপ্রচেষ্টা। নিশীথ রাত্রির ঘনতমিস্রার আবরণ ভেদ ক'রে গণআন্দোলনের সেই রক্তাক্ত কাহিনী কোনোদিনই আর দিনের আলোকে প্রকাশের পথ খুঁজে পাবে না। তারপর লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোনো-একটা জাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখবে কতকগুলি ফসিল। অর্ধপশুগঠন, অপরিণত-মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থিকঙ্কাল।...যারা আকস্মিক কোন ভূবিপর্যয়ে কোয়ার্টস আর গ্রানিটের স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখবে, শুধু কতকগুলি সাদা সাদা ফসিল ; তাতে আজকের এই লাল রক্তের কোনো চিহ্ন থাকবে না।...গল্পটি এ যুগের জীবনমহাকাব্যেরই প্রতীক। জন-আন্দোলনের শহীদদের প্রতি লেখকের গভীর সহানুভূতি উপসংহারে বক্রোক্তির মধ্যে বিধৃত হয়েছে। সুদূরভবিষ্যতের জ্ঞানবৃদ্ধদের কাছে আজকের এই মহৎ আত্মবিসর্জন আত্মহত্যাপ্রবণতা বলেই প্রতিভাত হবে। আজকের এই লাল-রক্তের কোনো চিহ্নই তাদের কাছে পৌছবে না। এযুগের বীর শহীদেরা হবে শুধু জাদুঘরের কতগুলি সাদা সাদা ফসিল !

৩

লক্ষ বছর পরের ফসিলই শুধু নয়, চলিষ্ণু কালের সঙ্গে তাল রেখে যারা এগিয়ে যেতে পারল না, মানিয়ে নিতে পারল না যুগান্তরের হাওয়া-বদলের সঙ্গে, তাদেরও কথা আছে 'ন তস্থৌ' আর 'ভাট তিলক রায়' গল্পে। বারো শত বৎসরের পুরাতন কল্যাণঘাটের সপ্তাবরণ বিষ্ণুমন্দির। তারই বিস্তীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মধ্যে প্রথম যাজকের বংশধর বৃদ্ধ উপাধ্যায় বেঁচে আছেন বিগতনিদ্র শ্মশানপালের মত। তাঁর বিশ্বাস, যে-অক্ষয় শিলাশিল্পে দেবতা আশ্রয় নিয়েছেন, তার বিনাশ নেই। তাক্‌লামাকানের ঝড় স্তূপ-বিহার-চৈত্যগৃহকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারেনি। শোনগঙ্গার প্লাবনে ভাসিয়ে নিতে পারেনি বুদ্ধগয়ার মন্দির। এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি মৃত অতীতকে পাহারা দিচ্ছেন। শুধু বৃদ্ধ উপাধ্যায়ই নন, সমগ্র কল্যাণঘাট মৌজাও জরাজীর্ণ শ্রীহীন। বিদঘুটে বিশ্বাস আর উদ্ভট কল্পনাকেলিতে এখানকার মানুষের দিন কাটে। তাদের অতীত গেছে, ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমানও অলীক। কৃষ্টিভ্রষ্ট দুর্ভাগারা—না ঘাটের না ঘরের। তবু টিঁকে আছে। এই মৃতপ্রায় অতীতের বুকে বর্তমানের অভিশাপ নিয়ে এল উপাধ্যায়ের ছেলে সোমনাথ। নতুন দিনের অন্বেষণে সে মানুষ।

লাগল দুই যুগের মধ্যে সংঘাত। চলন্ত বর্তমানের কাছে অচল অতীতের পরাভবের দূতী হয়ে এল সোমনাথের বাক্সে সযত্নে রক্ষিত এক অনাম্নী তরুণীর ছবি। কল্যাণঘাটের শিল্পবিভূতি সোমনাথের মনেও যে প্রভাব বিস্তার করেনি এমন নয়। রজনীর শেষযামে অস্তায়মান চন্দ্রালোকে কালের ব্যবধান ঘুচে গিয়ে তারও কাছে অতীত যেন জীবন্ত হয়ে উঠল, মোহাচ্ছন্ন অনুভূতিতে ধরা পড়ল, রভসে আকুল এক দিব্যাঙ্গনা অতিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে। গুরুনিতম্বে রত্নসূত্র, কঠিন কুচকলিকা আবেগে কোমল হয়ে রয়েছে। সুপুষ্ট বর্তুল দুটি হাতে ধরে আছে পদ্মবীজের মালা, যেন গায়ে ছুঁড়ে মারবে। তার বুকের উত্তাপ লাগছে সোমনাথের গায়ে। সোমনাথের মনে হল, এই বিরাট সুরমন্দিরের প্রাঙ্গণে যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে এক উদ্দাম জয়জয়ন্তী রাগ। এই ন্যগ্রোধ আর নাগরঙ্গবনে উৎসবের প্রদীপ যদি আর একবার জ্বলসে ওঠে, দেখা দেবে শত শত জীবন্ত নরনারীর রূপ। তবু আধুনিক সোমনাথের জীবনে এ নিশির-ডাকের ঘোর দিনের আলোকে নিতান্তই অলীক স্বপ্নমাত্র। অতীতের ধ্বংসস্তূপকে পেছনে ফেলে সে এগিয়ে গেল নবজীবনের চলার পথে। কল্যাণঘাটের এক বিকলাঙ্গ বিগ্রহের মত পড়ে রইলেন বৃদ্ধ উপাধ্যায়। তাঁর চোখে কল্যাণঘাট যেন ধীরে ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে। শ্বেত-কৃষ্ণ-ধূম্র-পাটল-বহ্নিবর্ণ সন্নিভ কঠিন প্রস্তরের শত শত মূর্তি কীর্তি ও বিগ্রহ গলে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্তর্ধানের স্রোতে। মজ্জমান উপাধ্যায় যেন শেষ দৃষ্টি মেলে দেখছেন—তীর সরে গেছে বহু দূরে; শুধু দিক্‌প্রান্তে জেগে রয়েছে অনাম্নী সুতনুকা এক মূর্তির ছলনা। সে মূর্তি চলন্ত কালের অগ্রদূতী, নবজীবনের লীলাসঙ্গিনী।

উপাধ্যায় নীরবেই পরাভব স্বীকার ক'রে নিয়েছিলেন, কিন্তু ভাট তিলক রায় তা পারেনি। শিল্পযুগের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে সে লড়াই ক'রে গেছে। এক নিদ্রাহীন যখের মত অতীতের যত পাপতাপ, আনন্দ-বিষাদ, প্রেম-প্রণয়, প্রতিজ্ঞা-প্রতিহিংসাকে সে সতর্ক পাহারায় আগলে ছিল। রূপকথার দেশের স্বপ্ন সম্বল ক'রে যন্ত্রযুগের বিরুদ্ধে মানুষকে সে বিদ্বিষ্ট করবার চেষ্টা করেছে। নিমিয়াঘাটে লালকি নদীর বাঁধের কল্পনা তার কাছে বিভিষিকার মতই ছিল। সে-বিভীষিকাকে সে জয় করবারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে বারুদ দিয়ে বাঁধের একটা পিলার উড়িয়ে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে নিজের ক্ষুব্ধ প্রাণটুকুকেও অপঘাত-মৃত্যুর হাতে সঁপে দিয়ে গেছে। তিলক রায় যেন সেই প্রচণ্ড বন্য-আত্মা, ক্যাপিটাল আর ইণ্ডাস্ট্রির কলের মারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই ক'রে অবশেষে গেল ফুরিয়ে।

বর্তমান সংকলনের 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ', 'গোত্রান্তর' ও 'উচলে চড়িনু'—এই তিনটি গল্প জীবনের একটি মূলসূত্রের উপর আলোকপাত করছে। ক্রিস্টোফার কড্ওয়েল তাঁর 'স্টাডিস্ ইন ডায়িং কাল্‌চার' গ্রন্থে বলেছেন, Those defects in bourgeois social relations all arise from cash nexus which replaces all other social ties, so that society seems held together, not by mutual love or tenderness or obligation, but simply by profit. Money makes the bourgeois world go round and this means that selfishness is the hinge on which bourgeois society turns, for money is a dominating relation to an owned thing. This commercialisation of all social relations invades the most intimate of emotions, and the relation of the sexes is affected by the differing economic situations of man and woman. অর্থনীতির এই প্রতিপাদ্য 'কাঞ্চনসংসর্গাৎ' গল্পে যেন অক্ষরে অক্ষরে সত্য। দু'পয়সা কমিশনের লোভে গিরিমাটিয়া কুলি রিক্রুট ক'রে ফিরতেন অটলনাথ চৌধুরী। অবশেষে আঙুল ফুলে হলেন কলাগাছ। অটলবাবু হয়ে উঠলেন লক্ষ লক্ষ টাকার মালিক, বাণিজ্যবীর অটলনাথ। পাপের পথে তাঁর আর্থিক স্বর্গারোহণের কার্যে তাঁর সহায় হল 'উপকারের সুগ্রীব' কান্তিকুমার। মুগ্ধা বঙ্গজননীর শান্ত-শিষ্ট-সাধু সাত-কোটি সন্তানেরই একজন। কান্তিকুমার দরিদ্র প্রতাপবাবুর মেয়ে জয়াকে ভালবাসে। কিন্তু যে পৌরুষ থাকলে হৃদয়-দৌর্বল্যকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে ধন্য হওয়া যায়, কাপুরুষ কান্তিকুমারের তা নেই। জয়া দীর্ঘদিন কান্তিকুমারের প্রতীক্ষায় কাটিয়েছে। অবশেষে দারিদ্র্য পৌছল চরমে। নিঃস্ব প্রতাপবাবু লক্ষ্মীর বরপুত্র অটলনাথের কাছে পড়লেন বাঁধা। ধূর্ত অটলনাথ চাকুরী দিয়ে পিতাকে করলেন স্থানান্তরিত, পুত্রী আশ্রয় পেল তাঁর শুদ্ধান্তঃপুরে। কান্তিকুমার অটলনাথের জীবনী লিখছিল। তাঁর মুখে এ কীর্তি-কাহিনী শুনে আহত জানোয়ারের মত সে অকস্মাৎ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। কিন্তু প্রতিহিংসা গ্রহণেও শক্তিমত্তার প্রয়োজন হয়। ভর্তার একটি মাত্র অনুগ্রহের ডাকে কান্তিকুমারের সমস্ত প্রতিশোধস্পৃহা চুপসে গেল। সতত-সৎপথে-চলা, কৃতজ্ঞতায়-বাঁধা, পরোপকারে ডগমগ ও পুরস্কার-প্রীত একটি অতিভদ্র পরবশ-আত্মা শান্ত হয়ে নিজের স্বরূপে ফিরে এল। এ গল্পে কান্তিকুমারের ব্যক্তিগত ক্লীবত্বের ফলেই তার হৃদয়লক্ষ্মী রাবণের স্বর্ণলঙ্কায় ধরা পড়েছে। কিন্তু যে সমাজব্যবস্থায় আর্থিক অনুগ্রহ দিয়ে মানুষকে কিনে রাখা যায়,

সেখানে মানুষের হৃদয়বৃত্তি কতটা ক্লিন্ন ও কলুষিত হতে পারে, এ গল্পটি তারও একটি জ্বলন্ত চিত্র।

'উচলে চড়িনু' গল্পের নায়ক দিনেশ, দত্ত কোম্পানীর অভ্রখনির ওভারম্যান। বলিষ্ঠ স্বাস্থ্যবান যুবক। কিন্তু মাইনে মাত্র পঁয়ত্রিশ টাকা। বাঙালী সমাজে কানা-খোঁড়ার জীবনেও বিয়ের ফুল ফোটে। ভবিষ্য পুরুষের ধমনীতে তারা সঁপে দিয়ে যায় শুধু কতগুলি পঙ্গু বীজাণুর প্রবাহ। তাতে দোষ নেই। যত বিচার আর ব্যতিক্রম শুধু দিনেশের অদৃষ্টে! বিয়ের সম্বন্ধ আসে আর ভেঙে যায়। পাত্রের যা রোজগার এক সপ্তাহের পেটের খোরাক যোগাতেই নিঃশেষ! কন্যাপক্ষ আতঙ্কে পিছিয়ে যায়। বাধ্য হয়েই দিনেশের জৈবক্ষুধা অসামাজিকতার চোরাপথ অবলম্বন করে। তার জীবনে এসেছে দুটি নারী, খনির মজুরনী বিলাসী—পাতালপুরীর মেয়ে, ধরিত্রীর তামসাবৃত জঠরলোকে যার অয়স্কান্তির কঠিন লাবণ্য নয়নাভিরাম হয়ে ওঠে। আর ইরানী বেদের মেয়ে যাযাবরী সারা, নিষ্কলঙ্ক রুবি-অভ্রের মত সুন্দর যার চেহারা। দুদিকের দুই আহ্বান। বিলাসী ডাকে মৃত্যুর গহনে, আর সারা ডাকছে জীবনের খরস্রোতে। সারার নীল চোখের দিকে তাকিয়ে স্বর্গঙ্গার কলরোল শুনতে পায় দিনেশ, শুধু ভেসে চলে-যাবার আহ্বান। কিন্তু বিলাসীর কালো চোখ তাকিয়ে আছে নিঃসঙ্গ ভোগবতীর অতল থেকে যেন ডুব দিয়ে তলিয়ে যেতে ডাকছে বার বার। বিলাসী সহজলভ্যা, তাই তার আকর্ষণে উন্মাদনা নেই। সারা দিগন্তের স্বর্ণমরীচিকার মত দুষ্প্রাপণীয়া, তাই তার আকর্ষণ দুর্নিবার। যেদিন দিনেশ মনে করল সারাকে সে জয় করেছে, সেদিন তার জীবনের সব চেয়ে বড় বঞ্চনার ক্ষতে যেন একটু জ্বালাহর প্রলেপ পড়ল। কিন্তু সারা অর্থশুল্কা। অর্থপণে সে দিনেশের কাছে বিক্রীত হতে প্রস্তুত। অর্থের সন্ধানও দিনেশের অজানা নয়। অভ্রখনির অভ্যন্তরে—যেখানে মরণ ও মিলন মিশে আছে একাকার হয়ে—সেখানে কোন-এক প্রাক্-পুরাণিক কুবেরের রত্ন লুক্কায়িত আছে ধরিত্রীর পাঁজরের তলায়। পাতালপুরীর সেই পরস্বাপহরণ করতে হলে প্রাণ পণ করতে হয়। দিনেশ বিলাসীকে সেই মৃত্যুর গহ্বরে পাঠিয়ে সংগ্রহ করল তার কন্যাপণ। সমাজের বঞ্চনার যেন সে প্রতিশোধ গ্রহণ করল সমাজ-কন্যার প্রাণ নিয়ে।

'গোত্রান্তর' গল্পে অর্থগোত্র মানুষের অধঃপতন আরো শোচনীয়, আরো বীভৎস। মধ্যবিত্ত যৌথপরিবারের এম-এ পাশ ছেলে সঞ্জয়, বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী ধনবিজ্ঞানের সমস্ত সূক্তগুলি মুখস্থ ক'রে ফেলেছে। সে বুঝেছে, এ সংসারে প্রত্যেকটি স্নেহ পণ্যমাত্র, প্রত্যেকটি আশীর্বাদ এক-একটি পাওনার নোটিস। প্রেম ক্ষুরধার ককেট্রির অধিক কিছু নয়। ওপর থেকে দেখতে কী সুন্দর, মা-বাপ-ভাই-বোন, আপন জন, আত্মীয়তার নীড়। কত গালভরা প্রবচন! কিন্তু একটু আঁচড় দিলেই চামড়া ভেদ ক'রে দেখা দেয় নির্লজ্জ

মহাজনের মাংস। পশুর মত নিছক একটা গোত্রমোহের তাড়নায় এই ভণ্ডহাস ভদ্র-সংসারের ছলনার কাছে সঞ্জয় নিজের বিপ্লবী মনুষ্যত্বকে কিছুতেই সস্তায় বিকিয়ে দিতে রাজি নয়। সঞ্জয় পরিবারের সংস্রব পরিত্যাগ ক'রে চাকরি গ্রহণ করল রতনলাল শুগার মিলে। কিন্তু আত্মসর্বস্ব, অর্থান্বেষী, সুখবাদী, স্খলিতগোত্র মানুষের অধঃপতনের পথটি বড়ই সুগম। পুরাকল্পের বর্বর পৃথিবীর কুপিত ডাইন আর ডাইনীরা তুক্ ক'রে বসে আছে পাতালমুখী পতনের দ্বার উন্মুক্ত ক'রে। গোত্রহীন নেমিয়ার আর তার বোন রুক্মিণী সঞ্জয়কে চরিত্রভ্রংশের শেষ সীমায় পৌঁছে দিলে। কিন্তু স্খলিতগোত্র আর গোত্রহীন মানুষে আকাশ-পাতাল তফাত। সে তফাত ধরা পড়ল যেদিন মিলের মালিকের সঙ্গে শ্রমিকদের বাধল লড়াই। সেদিন অস্বাস্থ্যে আর অল্পাহারে কুঁকড়ে-যাওয়া কেন্নো নেমিয়ার লোহার মূর্তির মত ঋজু ও কঠিন হয়ে দাঁড়াল। গোত্রহীন মানুষের সেই বিদ্রোহী রূপ দেখে আঁৎকে উঠল ভ্রষ্টগোত্র মধ্যবিত্তের সন্তান। মালিকে-শ্রমিকে একটা সামান্য দলাদলির এ রুদ্র পরিণাম সে কল্পনা করতেও পারেনি। সার্কাস দেখাবার জন্য যে সিংহকে খাঁচার বাইরে আনা হয়েছে, একটু সামান্য খোঁচা দিতেই সেটা এমন বুনো হাঁক ছেড়ে অবাধ্য হয়ে উঠবে, এ কথা সঞ্জয়ের কল্পনাতীত। বিপ্লবের এ ঝড় আত্মসুখান্বেষী মানুষের সহ্যের অতীত। তাই সঞ্জয় শ্রমিকদের প্রতি চরম বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ধূর্ত জম্বুকের মতই পালিয়ে আত্মরক্ষা করল। এ কাহিনী একটি বিশেষ ব্যক্তি-মানুষেরই অধঃপতনের কাহিনী। কিন্তু এ যুগের অর্থপরায়ণতার একটি সম্ভাব্য পরিণাম-বর্ণনায় লেখকের সন্ধানী দৃষ্টি বিপ্লবী ধনবিজ্ঞানের মর্মস্থল পর্যন্ত উদ্‌ঘাটিত করেছে।

৫

বিশুদ্ধ মনস্তত্ত্বের সার্থক বিশ্লেষণ 'গরল অমিয় ভেল' আর 'বারবধূ' গল্প দুটি। নারীর একটি স্বভাবধর্ম—সে হতে চায় বল্লভী। যৌবনাগমে পুরুষের প্রার্থিতা হয়েই সে ধন্য। মালা বিশ্বাসও পুরুষ-পূজারীর দৃষ্টি আকর্ষণের কম চেষ্টা করেনি। দুর্নামও সে কুড়িয়েছে। কিন্তু দুর্নামই ত বিজয়িনীর জয়মালা। সে যে অন্যবাঞ্ছিতা, তারই ত পরিচয় ওর মধ্যে নিহিত থাকে। মালা বিশ্বাসের যৌবন কিন্তু বিফলেই গেল। কোনো পুরুষের চিত্ত সে জয় করতে পারল না। এমন দিনে মতিঝিলের এক অজ্ঞাতনামা কুৎসাবিশারদ ব্যক্তি পথের পাশের কালো পাথরের বুকে খড়ির আখরে শহরের মেয়েদের নামে কুৎসা রটাতে লাগল। মতিঝিলের প্রতি গৃহ সেই রসনারোচন কুৎসার কলগুঞ্জনে মুখর হয়ে উঠল। কালো পাথরের বুকে একটি একটি নাম ফুটে

উঠতে লাগল—পূর্ণিমা, সুস্মিতা, সুধা, প্রীতি। মালা বিশ্বাসের মনে হল, সার্থক জীবন ওদের। ওরাই প্রার্থিতা। আড়াল থেকে মুক্ত ক'রে এনে সংসার ওদেরই মুখ দেখতে চায়। ওরা দয়িতা—কামনার লীলাকুরঙ্গী। কুৎসা-কলুষও ধন্য হতে চায় ওদেরই আশ্রয়ের প্রসন্নতায়। আর, সকল কামনার সীমানার ওপারে এক বেদনাহীন বিরাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে আছে মালা। সে একা, সে নিঃস্ব। জীবনসংগ্রামে মালা পরাজিত। কিন্তু সে এই পরাজয়ের গ্লানি স্বীকার ক'রে নিল না। একদিন সকলের অজ্ঞাতসারে কালো পাথরের বুকে নিজেই নিজের নামে মিথ্যা কুৎসার কাহিনী প্রচার ক'রে ছিল। মিথ্যা হোক, কিন্তু লোকে ত জানবে মালা বিশ্বাসও অন্যের কামনার ধন!

'বারবধূ' গল্পে বারবধূর জীবনে গৃহবধূর অভিনয় কি ক'রে একটি সত্য আকাঙ্ক্ষায় রূপান্তরিত হয়ে দেহজীবিনীর মানস-পরিবর্তন ঘটালে তারই ইতিকথা। জমিদার প্রসাদ রায় তারকেশ্বরের পঞ্চীবিবিকে নিয়ে বরাকর কলোনির একান্তে মধুনীড় রচনা করেছিলেন। কিন্তু সেখানকার আসঙ্গলোভী নরনারী সংগুপ্ত নিরালা থেকে এই ছদ্মদম্পতিকে আবিষ্কার করল। পঞ্চীবিবি সাজল প্রসাদবধূ লতা। কিন্তু আকস্মিক একটি সন্ধ্যার কপট-বধূবৃত্তির নির্মোক তার জীবনে এক নতুন চেতনার রুদ্ধদ্বার খুলে দিয়ে গেল। তারপর থেকে চলল এক কৃত্রিম সংসারের শিবিরে দিনরাত গৃহিণীপনার অভিনয়। এই মিথ্যাপরিচয়ে সামাজিক মানুষের কাছে যে সম্মান, যে আদর সে পেল, তার মাদকতা নিগূঢ় সঞ্চারে তার সমস্ত মনকে অধিকার ক'রে বসল। কিন্তু এই নিষিদ্ধ এলাকায় স্থায়ী প্রবেশাধিকারের কি কোনোই উপায় নেই? উপায় সত্যিই নেই, কারণ উপযাচিকা কুলকন্যা প্রভারা সেখানকার দ্বার আগলে আছে। প্রভা বিধবা, সে প্রসাদ আর লতাকে সত্যসত্যই স্বামী-স্ত্রী ব'লে জানে। কিন্তু তা জেনেও সে প্রসাদকে কামনা করল। তার মায়াজালে ধরা পড়ল প্রসাদ। বারবধূর বদলে কুলনারীর স্পৃহণীয় আকর্ষণ এবং লতার সত্য-পরিচয়-প্রকাশে তার সামাজিক ইজ্জৎনাশের আশঙ্কা প্রসাদের কাছে লতার সংস্রব অসহ্য ক'রে তুলল। তার ধারণা, ক'টা বেশি টাকা পেলেই বারবনিতা কৃতার্থ হয়ে স্বস্থানে ফিরে যাবে। লতাও মনে মনে আভাকে তাচ্ছিল্যই করেছে। তার একটা মেকি আধুলি চুরি ক'রে আভার যদি কিছু লাভ হয় হোক। তথাপি উচুঁদরের প্রেমে রঙিন ঐ ভদ্র রক্তবীজের পাপমুক্ত পৌরুষের ওপর শেষবাবের মত পঞ্চীবিবির ভাষার থু থু ছিটিয়ে দিয়ে সে যাবার বেলা প্রতিশোধ নিয়ে যাবে স্থির করল। কিন্তু পঞ্চীবিবির যে নবজন্ম হয়েছে! বিদায় মুহূর্তে প্রসাদ যখন তার হাতে টাকার নোটগুলি তুলে দিয়ে বললে, 'আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাই নি—ক্ষতি করিনি'; তখন লতা চোখের জল লুকোবার চেষ্টা

ক'রে বলছে 'না, তুমি করবে কেন, আভা-ঠাকুরঝি আমার এ সর্বনাশটা করলে।' ...মানুষের নীড় ভাঙবার কাজে অসংবৃতকামা কুললললনার বিরুদ্ধে অনভিজাত বারবধূর এই অভিযোগ ক্ষমাহীন ধিক্কারে ভদ্রসমাজকে ব্যঙ্গ ক'রে উঠেছে।

৬

'সুন্দরম্', 'পরশুরামের কুঠার' ও 'তিন অধ্যায়'—এই তিনটি গল্পে সভ্যতা ও সংস্কৃতিগর্বে গর্বিত মানুষের সুকর্ষিত সৌন্দর্যানুভূতি, সমাজরক্ষী নীতিচেতনা ও উন্নাসিক আভিজাত্যবোধের ভিত্তিমূল পর্যন্ত বৃহত্তর জীবন-চৈতন্যের আলোকে পরীক্ষিত হয়েছে। 'সুন্দরম্' গল্পে সুকুমারের পাত্রীনির্বাচন ব্যাপারে সৌন্দর্যের ভাব-ব্যবচ্ছেদ করা হয়েছে। ঋষিবালকের মত কাঁচা মন ব্রহ্মচারী সুকুমারের। অতি বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কখন কোন পথে রিপুতাড়নায় চরিত্রের স্খলন হবে কে বলতে পারে! তাই নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে অগুরু পুড়িয়ে ঘরের বাতাস পবিত্র ক'রে তবে সে উপন্যাস পড়তে বসে। এহেন যোগিবরের কিন্তু পাত্রী আর কিছুতেই পছন্দ হয়না। কোনো মেয়ের মধ্যে প্রচ্ছন্ন মঙ্গোলিনীকে সে দেখতে পায়, কারো ঘনকৃষ্ণ দেহবর্ণে দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্তি ভেসে ওঠে। কিন্তু এই অতি-দুর্বল ভদ্রসন্তানের সংযম ও সৌন্দর্যের চর্চা যে কত ঠুনকো, তার প্রমাণ পাওয়া যায় যখন সে ভিখারিনী তুলসীর প্রতি যৌনাসক্ত হয়। কুষ্ঠী বোষ্টম হাবু আর বসন্তে-কানা ইরানী বেদেনী হামিদার মেয়ে তুলসী। কোন ডাকিনীর টেরাকোটা মূর্তির মত কালিমাখা শরীর। যেমন কুদর্শন তেমনি কদর্য নোংরা তার বেশভূষা। তবু সুকুমারের ঔরসে তুলসীর জঠরে এল সন্তান। কিন্তু এই আদিম জৈবশক্তির জয়লাভে সৌন্দর্যবিলাসী সভ্যতার ভিত্তিমূল পর্যন্ত ধ্বসে পড়বে, এই ভেবে সুকুমার বিষপ্রয়োগে ভ্রূণ ও নারীহত্যা করতেও পশ্চাৎপদ হয়নি। সুকুমারের পিতা কৈলাসবাবু ময়না-ঘরে লাস-কাটা ডাক্তার। মানুষের দেহাভ্যন্তরে নাড়ী-ধমনী-পেশী অস্থিমালায় বিন্যস্ত এক অন্তরঙ্গ সৌন্দর্যের সাক্ষাৎ তিনি পেয়েছেন। বংশাভিজাত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত সৌন্দর্যবাদ তাঁর কাছে মিথ্যা। তিনি বলেন, মানুষের দেহের উপরকার চর্মাবরণ সরিয়ে নিয়ে গেলে সব মানুষের রূপই ত এক! তখন কে আলপাইন, কে নেগ্রিটো, আর কে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড, তা ধরবার কারো সাধ্য আছে কি? দেহগত উপাদানের ভিত্তিতে, তান্ত্রিক-পন্থায়, কৈলাস ডাক্তার সবার-উপরে-মানুষ-সত্য-বাদ দিয়ে এক নূতন সৌন্দর্যচেতনার প্রতিষ্ঠা করতে চান। তাই ময়না-ঘরে কুৎসিতা তুলসীর লাস কেটে তার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্যের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি ভাবেন, মানুষের এ তিমিরদৃষ্টি

হয়ত একদিন ঘুচে যাবে। গল্পের শেষভাগে হতভাগিনী তুলসীর প্রতি ডাক্তারের স্নেহার্দ্র করুণা মর্মস্পর্শী হয়েছে, যখন তিনি তার হত্যার কারণ সন্ধান করতে গিয়ে তলপেট থেকে পরিশঙ্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল পেটিকাটির সন্ধান পেলেন। মাতৃত্বের রসে উর্বর মানবজাতির মাংসল ধরিত্রী সর্পিল নাড়ির আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু বসিয়া। সৌন্দর্য সম্পর্কে মানুষের তির্যকদৃষ্টি কি সর্বনাশ করতে পারে, এ যেন তারি প্রত্যক্ষ উদাহরণ। এক দিকে এই করুণা, অন্যদিকে যদু ডোমের মুখ থেকে উচ্চারিত বক্রোক্তি—'শালা বুড়ো লাতির মুখ দেখছে'—তীব্রব্যঙ্গে সুকুমারদের মত সৌন্দর্যবিলাসীদের ঘন কশাঘাত করে উঠছে।

'পরশুরামের কুঠার' গল্পে স্তন্যপীযূষদায়িনী জননীকে সমাজের অনুশাসন-কুঠারে হত্যা ক'রে তাকে মার্কা-মারা পারবনিতার দলে ঠেলে দেওয়ার মর্মান্তিক কাহিনী বিবৃত হয়েছে। তিনকের মা ধনিয়া। আত্মীয় বলতে তার কেউ নেই, তার সমাজ নেই। বহু-পরিচর্যাকারিণী ভর্তৃহীনা এই নারী, তুঁতিন বৎসরের নিয়মিত-ব্যবধানে হাসপাতালে এক-একটি সন্তানের জন্ম দিয়ে মাতৃস্তন্যের উৎস অব্যাহত রাখে। দেহে-মনে সে শুধু জননী। পরে অনাথ-শিশুদের শোভাযাত্রা দেখে ওদের মধ্যে নিজের অনামিক সন্তানের কল্পনায় প্রিয়সঙ্গসুখের চরমক্ষণে উৎসারিত চন্দ্রাসারের মত এক পুলকের বন্যা তার সমস্ত শরীরে উপচে ওঠে, উৎসারিত মাতৃধারায় বুকের কাঁচুলি যায় ভিজে। তবু নিজের জঠরজাত সন্তানের প্রতিপালনদায়িত্ব গ্রহণ করতে সে প্রস্তুত নয়। তার অসামাজিক জীবন সম্বন্ধে সে সচেতন, সন্তান বড় হয়ে তার দুশমন হবে, তা সে সহ্য করতে পারবে না। তা ছাড়া তার ঘরে মানুষ হওয়া মানেই ত ভিখিরীর সংখ্যা বাড়ানো। তার চেয়ে শিশুরা নার্সারীতে প্রতিপালিত হলে, মানুষও হবে আর বিশেষ-পরিচয়ের কলঙ্ক-মুক্ত হয়ে নির্বিশেষে অপরিচয়ে হবে শুধু মানবসন্তান।

ধনিয়ার জীবন অসামাজিক, কিন্তু শীর্ণস্বাস্থ্য সমাজের এঁড়েলাগা নবজাতকদের ধুকপুকে আয়ু স্তন্যদানে জীইয়ে রাখবার গরজে ভদ্রবাড়ির আঁতুড়ে ও অন্তঃপুরে তার ডাক পড়ে। এই তার জীবিকা, এই তার জীবনমূল্য। কিন্তু সে-মূল্য একদিন যায় দেউলে হয়ে। সাগর-পার থেকে আমদানি-করা হরেক রকম বিলিতি ফুডের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সে হয় পরাজিত। তার প্রয়োজন ফুরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজের নীতিচেতনা টনটনে হয়ে দেখা দেয়। কলিযারি-সহর নয়াবাদের ক্রমোন্নত নাগর-ব্যবস্থায় পৌরসভার দায়িত্ববোধ যায় বেড়ে। খাতায় নাম লিখিয়ে ধনিয়াকে গিয়ে দাঁড়াতে হয় বারবনিতা-পল্লীতে। ভদ্রঘরের যে-সব সন্তানদের নিজের বুকের স্তন্যে সে একদিন বাঁচিয়ে রেখেছে, তাদেরই অসংযত যৌনবাসনার সামগ্রী হতে হয় তাকে।

একটিমাত্র মানুষের প্রতিপালনের দায়িত্ব নিয়েছিল ধনিয়া। আশী বছরের অথর্ব প্রসাদী ডোম, জীবনের অর্ধেকেরও বেশী সময় যার কেটেছে জেলের ভাত খেয়ে। ঝড়ে-গাছ-চাপা-পড়ে-কোমর-ভাঙা এক মুমূর্ষু মানবপ্রাণ। তার মাতৃত্বের শেষ সুধা আসন্নমরণ ঐ স্থবিরকে পান করিয়ে ক্ষুব্ধ অভিমানে ধনিয়া কেঁদে বলছে—

—হাঁ চাচা। আমার জাত নেই, আমি নাকি রাণ্ডী!

—ছি ছি, এ কি বলছিস?

—হাঁ চাচা, আমাকে নাম লেখাতে হয়েছে। কাল থেকে বাজারে থাকতে হবে।

—আরে না, তুই তো লছমী।

—না চাচা, আমার স্বামী নেই।

—গাইগরুরও স্বামী নেই, তারা কি লছমী নয়?

—তা বললে চলে না, আমি ত গাই নই। আমি মানুষ।

সমাজবদ্ধ মানুষের হাতে মানুষের এই পশুর চেয়েও অধিক অসম্মান যতটা শোচনীয় ততটাই অমানুষিক!

'তিন অধ্যায়' গল্পে জীবিকান্বেষী মধ্যবিত্তের বাধ্যতামূলক ক্রমাবনতি এবং সত্যকার গোত্রান্তর গ্রহণের কাহিনীর মধ্য দিয়ে সমাজের ভাঙন-গড়নের ইতিহাস রচিত হয়েছে। বামুনের ছেলে অহিভূষণের বিদ্যা ফোর্থ ক্লাস পর্যন্ত। ম্যুনিসিপ্যালটিতে অ্যাসিস্টেণ্ট কন্‌জারভেন্সী সুপারভাইসারের কাজ করে। মাইনে নগণ্য মাত্র। তাতেও অহিভূষণের আপত্তি ছিল না, মধ্যবিত্তের ইজ্জৎটুকু আশ্রিত ছিল চাকরীর গালভরা নামের খোলসে। কিন্তু সে-নামও পাল্টে গিয়ে হল সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার। শহরের ময়লা-গাড়ির তদারকির কাজের উপযুক্ত নাম। অহিভূষণ প্রথমে আপত্তি করেছে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জীবিকার দায়ে ভাগ্যকে স্বীকার ক'রেই নিয়েছে। দেনা দৈন্য আর বেকার অবস্থায় জীবনের বারো-আনা ভাগ পণ্ড ক'রে শেষকালে পুলিন বাঁড়ুজ্জে খুললেন জুতোর দোকান। সাত পুরুষের কৌলিক চেতনাকে একটা উপার্জনের দায়ে বিকিয়ে দিতে প্রথমে ব্রাহ্মণ্যগর্ব বাধা দিয়েছে। দোকানে কর্মরত মুচিদের পাশে একটা রঙিন পর্দার আড়াল সৃষ্টি ক'রে নিজের শ্রেণীমর্যাদাটুকু বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চেষ্টা করেছেন। কিন্তু যেদিন পুলিন বাঁড়ুজ্জে সমাজে 'পুলিন চামার' বলে অভিহিত হলেন সেদিন থেকে তাঁর মর্যাদার মিথ্যা মোহটুকু খসে পড়ল। এই পুলিন বাঁড়ুজ্জেরই মেয়ে বন্দনা। হাসপাতালে নার্সদের সহকারিণীর কাজ নিল। রূঢ় ভাষায় সে কাজের নাম জমাদারনী। অহিভূষণ আর পুলিনবাবুরা ভদ্রসমাজে সম্পর্ক রক্ষার প্রাণপণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু উন্নাসিক মধ্যবিত্ত সমাজের মর্যাদাবোধ

সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার, জমাদারনী ও চামারকে তাদের রুচিগত জীবনের আসরে ও বাসরে গ্রহণ করতে পারে না। ওদের জীবিকা ভিন্ন, তাই ওদের জীবনও ভিন্ন। মধ্যবিত্তের সমাজ থেকে ওদের খারিজ ক'রে দিতে না পারলে ভদ্রতা কলুষিত হয়। কিন্তু ওদের পারস্পরিক মিলনে নতুন সমাজ-গঠনের পথে কোনো বাধা সৃষ্টিরই ত উপায় নেই। তাই সকল ভদ্রয়ানার ষড়যন্ত্রের আবর্জনা সরিয়ে পুলিনবাবুর বাগান আর উঠোনের এক কোণে অহিভূষণ-বন্দনার মিলন-বাসরে এক নতুন সংসারের পত্তন হয়। সেখানে ইতিহাসের দেবীবর মিশ্র আড়ালে আড়ালে মেল বেঁধে দিচ্ছেন। কাকা আর ক্লাবের সুগম্ভীর ষড়যন্ত্র এখানে এসে চরমভাবে ভুয়ো হয়ে গেছে। মধ্যবিত্তের উন্নাসিকতা ও মিথ্যা মর্যাদাবোধের বিরুদ্ধে লেখকের বিদ্রূপবাণী যেমন তীব্র, সমাজস্তরে অবনীয়মান মানুষের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও তেমনি প্রীতিস্নিগ্ধ। 'তিন অধ্যায়' গল্পটি সমাজচেতন সাহিত্যের নূতন অধ্যায় রচনা করেছে।

৭

বাংলা সাহিত্যে সুবোধ ঘোষের আবির্ভাব দশ বৎসরও হয়নি। কিন্তু এর মধ্যেই তাঁর শিল্পিমানসের বিবর্তন লক্ষ্য করবার মত। 'ফসিল' ও 'কর্ণফুলির ডাক' থেকে আরম্ভ ক'রে 'তিলাঞ্জলি' ও 'একটি নমস্কারে' পর্যন্ত তাঁর গতিপথ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে জীবন-পরিক্রমায় তিনি ক্রমশ ভারত-পথের পথিক হয়ে উঠেছেন। বর্তমান সংকলনে 'কালাগুরু', 'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ', 'বৈরনির্যাতন', 'মা হিংসীঃ', ও 'শিবালয়'—এইপাঁচটি গল্পে তাঁর জীবনবোধে ভারত-চৈতন্যের প্রভাব পরিলক্ষিত হবে। 'কালাগুরু' গল্পে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের ভারত-তত্ত্ববিৎ অফিসার টেনব্রুকের তথাকথিত ভারতপ্রেমের মুখোস খসিয়ে ধূর্ত শাসকের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়েছে। টেনব্রুক ভারতের পুরাতত্ত্বের সন্ধান করতে গিয়ে রাজগীরের মাঠে লালচে বেলেপাথরের ফোটা পদ্মফুলের মত একটা ধূপদান কুড়িয়ে পেয়েছিলেন। প্রতি সন্ধ্যায় তাতে কালাগুরু পোড়ানো হয়। টেনব্রুক বলেন—এর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাচ্য সৌগন্ধ্যের জাদু লুকিয়ে আছে। এই ধূপদানের দগ্ধ কালাগুরুর মতই টেনব্রুকের চরিত্রের প্রাচ্য সৌগন্ধ্যও একটা প্রসাধন মাত্র। স্বরূপলক্ষণে তিনিও ঝানু সাম্রাজ্য-বাদীদেরই একজন। জন-কোম্পানীর বেনেবুদ্ধি দিয়ে বিংশ শতাব্দীর কলোনি শাসন চলেনা, এ প্রাজ্ঞতা আছে বলেই তাঁর কণ্ঠে প্রাচ্যপ্রেম আর উদার ডেমোক্রেসির বুলি। কিন্তু নবজাগ্রত ভারতের নয়া-জমানার প্রভাত-ফেরীর সঙ্গে সিপাহী বিদ্রোহের অবিচ্ছেদ্য ইতিহাস মিশে বিদ্রোহী ভারতের মনে যে বিজয়-প্রণাদ উদ্দাম হয়ে ওঠে, তাকে

রোধ করবার জন্যে ডিষ্ট্রিক্ট গেজিটিয়ারের পৃষ্ঠা বদলে ঐতিহাসিক সত্যকে পুরাতত্ত্বের অলীক কাহিনী দিয়ে চাপা দেবার চেষ্টারো ক্রটি নেই তাঁর। কিন্তু কপটপ্রেমের সমস্ত কুসুমশায়ক প্রয়োগ ক'রেও যখন প্রভাত-ফেরীর কণ্ঠরোধ করা গেল না, তখন দমননীতির সনাতন পন্থার নির্দেশই তাঁর কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত হলো—সশস্ত্র পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর উদ্দেশ্যে।

'চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে' এদেশে শ্বেতাঙ্গ-অভিযানের আরেকটি রূপ ফুটে উঠেছে। পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল উত্তর ভারতের সমগ্র মুসলিম শক্তি। অন্য পক্ষে মারাঠার পরাক্রম। কিন্তু সে যুদ্ধে হিন্দু ও রাজপুতেরা সহযোগিতা না করায় এবং সঙ্কট-মুহূর্তে রঘুজী ভোঁস্‌লা নিরপেক্ষ থাকায় মারাঠার পরাজয় ঘটে। এই যুদ্ধেই ভারতের ভাগ্য নির্ণীত হয়। কারণ খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত ভারতকে একসূত্রে গ্রথিত করার মারাঠা-স্বপ্ন ধূলিসাৎ হওয়ায় বাংলায় ব্রিটিশ শক্তি ক্ষমতা-বৃদ্ধির অবকাশ পায় এবং ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-স্থাপন সম্ভবপর হয়। আলোচ্য গল্পটিতে ভারতের আদিবাসীদের সাঁওতাল-ভূমিতে খ্রীষ্টীয় ধর্মযাজকদের অভিযান এবং সে-উৎপাতের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান অরণ্যবাসীদের পরাজয়ের করুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। অনাত্মীয়-জ্ঞানে অবজ্ঞা ভরে আদিবাসীদের আমরা দূরে সরিয়ে রেখে ওদের জীবন-সংগ্রামে নিরপেক্ষ রয়েছি বলেই যে ওরা পরাজিত হচ্ছে—গল্পের মাধ্যমে এই সত্যকেই লেখক পরিস্ফুট ক'রে তুলেছেন।

ভারত সম্পর্কে আমাদের শত্রুমিত্র নিরূপণের জটিল মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কাহিনী আছে 'বৈরনির্যাতনে'। ফৌজ। কৌলাণ্যের ফুলের মুকুটি যে রাজকীয় বিমানবহর, তাতে চড়ে বাঙালী বীর দিলীপ দত্ত চলেছে উত্তর পশ্চিম সীমান্তের উপদ্রবকারী পাঠানদের শাস্তি দিতে। শত্রুপুরীর উদ্দেশ্যে এই বোমারু অভিযানের যাত্রাপথে তার মানসপটে পর-পর ভেসে উঠছে দুটি নারীর চিত্র। নন্দী সাহেবের কন্যা ডোরা, আর পাঁচু ডাক্তারের স্বরাজ-ওয়ালী মেয়ে শোভা। এ অভিযানে ডোরা জানিয়েছে অভিনন্দন, তার দৃষ্টিতে দিলীপের এ গৌরবে কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। পক্ষান্তরে শোভা দিয়েছে তাকে ধিক্কার, বিদেশী শাসকের অনুগ্রহ-ধন্য একটি চাকুরিই কি বীরত্বের মাপকাঠি? তাছাড়া ভারতের প্রতিবেশীকে শত্রু ব'লে চিহ্নিত করল কে? ঠাকুরদার আমলের দরবেশী রশিদ খলিফার মামাবাড়ি ত এই দেশেই। শত্রুপুরী নয়, বাল্যস্মৃতিতে এই এলাকাই ত রূপকথার দেশ হয়ে আছে। তাছাড়া দিলীপের অনুভূতিপ্রবণ চিত্তকে আকাশ-লোকের চেতনা অভিভূত ক'রে ফেলল; তার মনে হল, অদ্ভুত এক শব্দের উৎসবে মহাব্যোম স্পন্দিত হচ্ছে। যেন গান গাইছে একটা বিদেহী পরমাণুর জগৎ। এই রম্য দৃশ্য দেখে আর মধুর শব্দ শুনে দিলীপ ফিরে

পেল তার হারানো অভিজ্ঞান ; —পাহাড়ের মাথায় একটা জীর্ণ বৌদ্ধ স্তূপ। অমনি যুগযুগান্তরের ভারত-ইতিহাস তার চোখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠ্‌ল—মীরাগ্রাম থেকে তক্ষশীলা—তক্ষশীলা থেকে পুরুষপুর—পুরুষপুর থেকে রাজগৃহ। এই সেই পুরাতন হৃদয়ের পথ, আজও পড়ে রয়েছে—অবহেলা ও অপরিচয়ের কাঁটায় ঢাকা। দিলীপ দত্তের জীবনে ডোরা নয়, শোভারই জয় হল।

'মা হিসীঃ' গল্পে মানুষের চরম অপরাধের শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ড-দানের বিরুদ্ধে মানবতার আবেদন। আদালতে, আদালতের বাইরে এবং জেলের ভেতরে ফাঁসির আসামীর প্রতি মানুষের আচরণ এবং একটা-মানুষের প্রাণহরণের জন্য অনেকের সম্মিলিত ও প্রণালীবদ্ধ আয়োজনের মধ্যে যে অমানুষিক পৈশাচিকতা আছে, পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণের মধ্যে তা অতি নিষ্ঠুর ভাবে প্রতিভাত হয়ে উঠেছে। ফাঁসির পূর্বসন্ধ্যায় বধ্যভূমির গন্ধ পেয়ে একটা পশু যেন সেলের ভেতর আর্তনাদ করছে। ওদিকে ফাঁসির তক্তা পাহারা দিচ্ছে শাস্ত্রী। পোষা অজগরের মত চর্বিমাখানো ফাঁসির দড়িটা গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে আছে অফিস ঘরের একটা সিন্দুকে। আর-একটি নম্বরের কুঠুরিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে জল্লাদ বংশী দোসাদ। ফাঁসি প্রতি পাঁচ টাকা রেট। রাত শেষ হয়ে সকাল হতেই বংশী দোসাদের রোজগারের হিসেবে পাঁচটাকা জমা হবে। একজন মানুষের আকস্মিক উন্মাদনা বা ভ্রান্তিবশে যে নরহত্যা, তারই শাস্তি স্বরূপ এই সঙ্ঘবদ্ধ প্রাণহননের বিধান সভ্যপৃথিবীর চরম কলঙ্ক। অহিংসার জন্মভূমিতে উদ্ভূত শিল্পীর চোখে তার বীভৎসতা আরো কদর্য রূপেই ধরা পড়েছে।

'শিবালয়' গল্পে পারিবারিক প্রণয়-প্রতিদ্বন্দ্বিতা শিব-রামের প্রতীকী সংঘাতের রূপ নিয়েছে। রামচরিত-ভক্ত অনন্তরাম, তার স্ত্রী প্রমীলা, আর অনন্তরামের সম্পর্কিত ভ্রাতা মদ্যাসক্ত কৈলাস। কৈলাস জানে এই পবিত্র পরিবারের প্রাণলোকে প্রবেশ করতে হলে কোনো দৈবশক্তির আশ্রয় চাই। তাই সে মদ ছেড়ে আত্মশুদ্ধি ক'রে শিবভক্ত হয়ে প্রমীলার চিত্ত জয় করল। শিবালয় প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে উভয়ে রইল মশগুল হয়ে। দূর থেকে অনন্ত তার সংসারে এই নূতন প্রেমের রূপ দেখে, আর রামচরিতমানসে সান্ত্বনার ভাষা খোঁজে। এমনি দিনে এল ভারতের স্বাধীনতা-যজ্ঞের পূর্ণাহুতির লগ্ন। রামচরিতের সব মহিমা পুঁথির বন্ধন ছিঁড়ে হিন্দুস্থানের আকাশে-বাতাসে ছড়িয়ে পড়ল। কী মনোমোহা তার রূপ! স্তবে গানে শুচিতায় ও শুভ্রতায় এক অনুপম উৎসবের মত। সংসারের গরল কণ্ঠে নিয়ে নীলকণ্ঠের মতই অনন্তরাম সেই যজ্ঞে আত্মাহুতি দিয়ে হল প্রথম শহীদ। রামভক্তের আত্মবিসর্জনের বেদীমূলেই গড়ে উঠল প্রমীলা-কৈলাসের শিবালয়। গল্পটিতে ব্যক্তিগত প্রণয়সঙ্ঘাত ফল্গুধারার মতই অন্তঃসলিলা, কিন্তু ব্যক্তি-জীবনেই হোক্, কিংবা রাষ্ট্র-আন্দোলনেই হোক্, অহিংস আত্মদানের দ্বারাই যে

প্রতিপক্ষের হৃদয় জয় করা যায়, ভারতীয় শহীদ-জীবনের এই আদর্শই শিবালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৮

সুবোধ ঘোষের মননশীল শিল্পিমানস ও রীতিপ্রধান সৃষ্টিকর্মের স্বরূপনির্ণয়ে দেখা যাবে, বস্তুরূপে নয়, ভাবরূপেই তিনি জীবনকে অপরোক্ষ করেছেন। বস্তুজগতের প্রত্যক্ষানুভূতির দ্বারা জীবনকেই শিল্প ক'রে তোলার পদ্ধতি তাঁর নয়। ভাবলোকের অনুধ্যান-অনুভূতি দিয়ে বাণীবিগ্রহ রচনা ক'রে তাকে জীবনাশ্রিত ক'রে তোলাই তাঁর সাধনা। তাঁর গল্পে রূপ ভাবের মাঝে ছাড়া পায়নি, ভাবই রূপের মাঝে অঙ্গ পেয়েছে। এদিক দিয়ে তাঁর রচনা ক্লাসিক-পন্থী, এপিক-ধর্মী। ভাবের উপযুক্ত আধার-সন্ধানে প্রতীক-বা টাইপ-চরিত্র-সৃষ্টিও এ-পন্থায় অপরিহার্য। স্বভাবতই তাঁর লেখায় জীবন-পরিচিতির চেয়ে শিল্পপ্রতীতিই বড়। অপরিচিত লোকে অনাবিষ্কৃত রহস্য-সন্ধানের দিকেই তাঁর প্রবণতা। গল্পের ক্ষেত্রে কলম্বাসের মত নূতন দেশ ও নূতন মানুষের সন্ধানেই তাঁর সমধিক আনন্দ। পাঠকের মন মাঝে-মাঝে ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে, সুবোধ ঘোষ যেন অতিমাত্রায় অসাধারণ। তিনি যদি আরেকটু সাধারণ হতেন, তাহলে আমাদের পরিচিত জীবনের সহজ রূপটি তাঁর লেখায় আরো জীবন্ত হয়ে ধরা পড়ত! কিন্তু তাঁর কল্পনা দূর-দুর্গমের পথেই পাঠককে হাতছানি দিয়ে ডাকে। তবু পরিবেশ-সৃষ্টির জাদুতে তিনি অপরিচিত পটভূমিকেও প্রত্যক্ষবৎ ক'রে তুলেছেন; কল্পনালোকের ভাববিগ্রহকেও করেছেন প্রাণচঞ্চল। আর এ সাফল্যের মূলে রয়েছে তাঁর সবচেয়ে বড় সম্পদ—তাঁর অনন্যসাধারণ ভাষাশিল্প। বাংলায় প্রমথ চৌধুরীর মত সুবোধ ঘোষকেও নূতন 'স্টাইল' বা গদ্যরীতির স্রষ্টা বলে অভিনন্দিত করা যেতে পারে। শ্লেষ ও বক্রোক্তির তীক্ষ্ণতায়, বুদ্ধিদীপ্ত সমাসোক্তির ব্যঞ্জনায়, কাব্যমণ্ডিত বর্ণনা ও গভীরভাবদ্যোতক মন্তব্যযোজনায় তাঁর বাগ্‌বৈদগ্ধ্য সাহিত্যের শিল্পরূপকে এক অভিনব সৌন্দর্যে বিভূষিত করেছে। জীবনবোধের পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে এই অসামান্য শিল্পায়ন-সুষমার সমন্বয়েই বাংলার কথাসাহিত্যে সুবোধ ঘোষের নিজস্ব আসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

বঙ্গবাসী কলেজ

বৈশাখ, ১৩৫৬

জগদীশ ভট্টাচার্য

অযান্ত্রিক

বিমলের একগুঁয়েমি যেমন অব্যয়, তেমনি অক্ষয় তার ঐ ট্যাক্সিটার পরমায়ু। সাবেক আমলের একটা ফোর্ড—প্রাগৈতিহাসিক গঠন, সর্ব্বাঙ্গে একটা কদর্য্য দীনতার ছাপ। যে নেহাৎ দায়ে পড়েছে বা জীবনে দেখেনি, সে ছাড়া আর কেউ ভুলেও বিমলের ট্যাক্সির ছায়া মাড়ায় না। দেখতে যদিও জবুথবু কিন্তু কাজের বেলায় বড়ই অদ্ভুত-কর্ম্মা বিমলের এই ট্যাক্সি। বড় বড় চাঁইগাড়ীর পক্ষে যাহা অসাধ্য, তা ওর কাছে অবলীলা। এই দুর্গম অভ্রখনি অঞ্চলের ভাঙ্গাচোরা ভয়াবহ জংলীপথে—ঘোর বর্ষার রাত্রে—যখনই ভাড়া নিয়ে ছুটতে সব গাড়ীই নারাজ, তখন সেখানে অকুতোভয়ে এগিয়ে যেতে পারে শুধু বিমলের এই পরম প্রবীণ ট্যাক্সিটি। তাই সবাই যখন জবাব দিয়ে সরে পড়ে, একমাত্র তখনি শুধু গরজের খাতিরে আসে তার ডাক, তার আগে নয়।

ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে সারি সারি জমকালো তরুণ নিউ মডেলের মধ্যে বিমলের বুড়ো ফোর্ড দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ঝিমোয়, জটায়ুর মত তার জরাভার নিয়ে। বাস্তবিক বড় দৃষ্টিকটু। তালিমারা হুড, সামনের আশিটা ভাঙ্গা, তোবড়ানো বনেট, কালিঝুলি মাখা পরদা আর চারটে চাকার টায়ার পটি লাগানো; সে এক অপূর্ব্ব শ্রী। পাদানীতে পা দিলে মাড়ানো কুকুরের মত কঁ্যাচ করে আর্ত্তনাদ করে ওঠে। মোটা তেলের ছাপ লেগে সীটগুলি এত কলঙ্কিত যে, সুবেশ কোন ভদ্রলোককে পায়ে ধরে সাধলেও তাতে বসতে রাজী হবে না। দরজাগুলো বন্ধ করতে বেশ বেগ পেতে হয়, আর যদিও বন্ধ হল তো তাকে খোলা হয়ে ওঠে দুঃসাধ্য. সীটের ওপর বসলেই উপবেশকের মাথায় আর মুখে এসে লাগবে ওপরের দড়িতে ঝোলানো বিমলের গামছা, নোংরা গোটা দুই গেঞ্জী আর তেলচিটে আলোয়ান।

বিমলের গাড়ীর দূরায়ত ভৈরব হর্ষ শোনা মাত্র প্রত্যেকটি রিক্সা সভয়ে রাস্তার শেষ কিনারায় সরে যায়—অতি দুঃসাহসী সাইকেল-ওয়ালারও বিমলের ধাবমান গাড়ীর পাশ কাটিয়ে যেতে বুক কাঁপে। রাত্রির অন্ধকারে একবার দেখা যায়, দূর থেকে যেন একটা একচক্ষু দানব অট্টশব্দে হা হা করে তেড়ে আসছে; বুঝতে হবে ঐটি বিমলের গাড়ী। হেড লাইটের আলো নির্ব্বাণপ্রাপ্ত, আলগা আলগা শরীরের গাঁটগুলো যে কোন সময়ে বিস্ফোরকের মত শতধা হয়ে ছিটকে পড়তে পারে।

সব চেয়ে বেশী ধুলো ওড়াবে, পথের মোষ ক্ষ্যাপাবে আর কানফাটা আওয়াজ করবে বিমলের গাড়ী। তবু কিছু বলবার জো নেই বিমলকে। চটাং চটাং মুখের ওপর

তুকথা উল্টে শুনিয়ে দেবে—মশাই বুঝি কোন নোংরা কন্ম করেন না, চেঁচান না, দৌড়ান না ? যত দোষ করেছে বুঝি আমার গাড়ীটা !

কত রকমই না বিদ্রূপ আর বিশেষণ পেয়েছে এই গাড়ীটা—বুড়্চা ঘোড়া, খোঁড়া হাঁস, কাণা ভঁইস ! কিন্তু বিমলের কাছ থেকে একটা আদুরে নাম পেয়েছে এই গাড়ী—জগদ্দল। এই নামেই বিমল তাকে ডাকে, তার ব্যস্ত-ত্রস্ত কর্ম্মজীবনে সুদীর্ঘ পনেরটি বছরের সাথী এই যন্ত্রপশুটা ; সেবক, বন্ধু আর অন্নদাতা।

সন্দেহ হতে পারে, বিমল তো ডাকে, কিন্তু সাড়া পায় কি ? এটা অন্যের পক্ষে বোঝা কঠিন। কিন্তু বিমল জগদ্দলের প্রতিটি সাধ-আহ্লাদ অভিমান এক পলকে বুঝে নিতে পারে।

'ভারী তেষ্টা পেয়েছে, না রে জগদ্দল ? তাই হাঁসফাঁস কচ্ছিস ? দাঁড়া বাবা দাঁড়া।' জগদ্দলকে রাস্তার পাশে একটা বড় বট গাছের ছায়ায় থামিয়ে, বিমল কুঁয়ো থেকে বালতি ভরে ঠাণ্ডা জল আনে, রেডিয়েটরের মুখে ঢেলে দেয় বিমল। বগ বগ করে চার-পাঁচ বালতি জল খেয়ে জগদ্দল শান্ত হয়, আবার চলতে থাকে।

এ ট্যাক্সির মালিক ও চালক বিমল স্বয়ং। আজ নয়, একটানা পনর বছর ধরে।

ষ্ট্যাণ্ডের এক কোণে তার সব দৈন্য আর জরাভার নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকে বুড়ো জগদ্দল। পাশে হাল মডেলের গাড়ীটার সুমসৃণ ছাইরঙা বনেটের ওপর গা এলিয়ে বসে পিয়ারা সিং বিমলকে টিটকারী দিয়ে কথা বলে—'আর কেন, এ বিমলবাবু ? এবার তোমার বুড়িকে পেনসন দাও।'

—'হুঁ, তারপর তোমার মত একটা চটকদার হাল-মডেল বেশ্চে রাখি'। বিমল সটান উত্তর দেয়। পিয়ারা সিং আর কিছু বলা বাহুল্য মনে করে ; কারণ বললেই বিমল রেগে যাবে, আর, তার রাগ বড় বুনো ধরণের।

কার্ত্তিক পূর্ণিমায় একটা মেলা বসবে এখান থেকে মাইল বারো দূরে, সেখানে আছে নরসিংহ দেবের বিগ্রহ নিয়ে এক মন্দির। ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে যাত্রীর ভীড়। চটপট ট্যা ক্সগুলো যাত্রী ভরে নিয়ে হুস হুস করে বেরিয়ে গেল। শূন্য স্ট্যাণ্ডে একা পড়ে থেকে শুধু ধুঁকতে লাগলো বুড়ো জগদ্দল। কে আসবে তার কাছে—যার ঐ প্রাগৈতিহাসিক গঠন আর পৌরাণিক সাজসজ্জা !

গোবিন্দ এসে সমবেদনা জানিয়ে বলল—কি গো বিমলবাবু, একটাও ভাড়া পেলে না ?

—না।

—তবে ?

—তবে আর কি ? এর শোধ তুলব সন্ধ্যের। তবল ওভারলোড নেব, যা থাকে কপালে।

—ও করে আর কদিন কারবার চলবে ? বরং এইবার আর দেরী না করে জগদ্দলকে এক্সচেঞ্জে দিয়ে ঝরিয়া থেকে আনিয়ে নাও মগনলালের গাড়ীটা। তোফা ছ'সিলিণ্ডার সিডান, সত্যি।

—আরে যেতে দাও, কে অত ঝঞ্ঝাট করে বল ?

—এটা হল ঝঞ্ঝাট ? আর নিত্যি এই লুকিয়ে পাকিয়ে ওভার-লোড নেবার হয়রাণী, সেটা ঝঞ্ঝাট নয় ?

—না ভাই যেতে দাও ওসব কথা। নাও, বিড়ি খাও।

গোবিন্দ চুপ করে গেল। জগদ্দলের প্রসঙ্গ পরের মুখে আলোচনা বিমল কোনদিনই বরদাস্ত করে না। চেপে যাওয়াই ভাল, নইলে এখনি হয়ত একটা পপভাষা ব্যবহার করে বসবে।

বাজে কথায় মন না দিয়ে বিমলও ক্যানেস্তারা ভরে জল নিয়ে এল—পিচকারি দিয়ে বুড়ো জগদ্দলের ধুলোকাদা ধুতে লেগে গেল। হামা দিয়ে গাড়ীটার তলায় ঢুকে চিৎ হয়ে শুয়ে পিচকারির জল ছড়ায়। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে, টাইরডের গলায় গোবরের দাগটা গেল কি না ? ডিফারেন-সিয়ালের বর্তুল পেটটা ন্যাতা দিয়ে ঘসে ঘসে চকচকে করে ফেলে। আবার দাঁড়িয়ে দাড়িয়ে দেখে—আঃ, হুডটা বেজায় পুরণো, দু'জায়গায় ফেটে মস্ত বড় দুটো ফাঁক হাঁ করে আছে।

—কি করব জগদ্দল! এবার তালি নিয়েই কাজ চালা। আসছে পুজোয় কটা ভাল রিজার্ভ পেলে তোকে নতুন রেক্সিনের হুড পরাবো, নিশ্চয়!

জগদ্দলের প্রসাধন এখানেই ক্ষান্ত হয় না। পকেট হাতড়ে বিমল শেষ দুয়ানীটা বার করে—কেরোসিন তেল কিনে এনে বোল্টুগুলোর মরচে মুছতে লেগে যায়।

গৌর এসে বলল—'এঁ্যা, এ কি হচ্ছে বিমলবাবু, ভাঙা মন্দিরে চুণকাম!'

বিমল বিশ্রীভাবে মুখ বিকৃত করে খেঁকিয়ে উঠল—সোজা কেটে পড় না রাজা এখান থেকে, কে তোমায় ধক ধক করতে ডেকেছে ?

বিমল এইটেই বুঝে উঠতে পারে না যে, তার এইসব প্রাইভেট ব্যাপারে অপরে এত মাথা ঘামাতে আসে কেন ?

'প্রাইভেট'—পিয়ারা সিং হেসে যেন গড়িয়ে পড়ে।—'গাড়ীভি ঘরকা আওরাত হায় ক্যা ?

কারবার ডুবতে বসেছে, তবুও বিমলের ঐ এক রোখ। এই কুদৃশ্য বুড়ো গাড়ীটার উপর একটা উৎকট মায়া তার কারবারি বুদ্ধিকেও দিয়েছে ঘুলিয়ে! তা না হলে এতবড়

মক্ষিচোষক কৃপণ বিমল—যে ধানবাদে পুরির দাম বেশী বলে দিনটা উপোষে কাটিয়ে পরদিন গয়ায় ফিরে সস্তাদরে দুগুণ খাওয়া খায়; সেই বিমল অকুণ্ঠহাতে এ গাড়ীর পিছনে খরচ করে চলেছে, ভস্মে ঘি ঢালছে!

বুলাকি পাগলারও এমনি ধরণের স্নেহান্ধতা ছিল তার একটা ভাঙা টিনের গামলার উপর। নিজে বসে বসে বৃষ্টিতে ভিজত, কিন্তু ছাতা দিয়ে সযত্নে ঢেকে রাখতো তার ভাঙা গামলাটিকে।

সন্ধ্যের আবছা অন্ধকার নেমে এল, দোকানগুলোতে দু-একটা পেট্রম্যাক্স বাতি উঠল জ্বলে। ময়রার দোকানের উনুন থেকে পুঞ্জ পুঞ্জ ধোঁয়া ছড়িয়ে পড়ে অন্ধকারটা আরো পাকিয়ে তুলল। অদূরে ট্রাফিক পুলিশটাকেও একটু আনমনা দেখাচ্ছে। পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে একদল চাষী গেরস্থ আসছে এইদিকে—দূর দেহাতের যাত্রীসব। এই তো শুভ লগ্ন।

বিমল হাকল, গলা নয়তো চোঙবিশেষ -চলা আও, চলা আও। রামগড়, রাঁচী, নয়াসরাই। মজুদগঞ্জ, চিত্রপুর, ঝালদা। কনসেসান রেট—কনসেসান।

আগন্তুক যাত্রিদলের কাণের ভেতর দিয়ে মরমে পৌঁছাল এ ডাক। কনসেসান রেট—কিন্তু সংখ্যায় চোদ্দজন, বুড়ো জগদ্দলের উদর গহ্বরে ছ'জনের স্থানে ঠেসে দিল চৌদ্দজনকে। হুবহু কাঙ্গারুর পেটে, কার সাধ্য বোঝে বাইরে থেকে কটি জীব সেখানে প্রচ্ছন্ন। ক্ষিপ্র হাতে ঘুরিয়ে দিল স্টার্টিং হ্যাণ্ডেল—মাত্র দু-তিন পাক। মত্ত সিংহের মত বুড়ো জগদ্দল গর্জ্জে উঠল—পানের দোকানে লাল জলের বোতলগুলো কেঁপে উঠল ঠুং ঠুং করে। দুর্গের বিলাপে বাজার মাত করে একটুকরো কাল-বোশেখীর মত জগদ্দল স্ট্যাণ্ড ছেড়ে ডাইনের সড়ক ধরে উধাও হয়ে গেল।

হাঁ, একখানা গাড়ী গেল বটে—পান ওয়ালা বলল—'আজব এক চীজ হ্যায় বিমলবাবুকা ট্যাক্সি।'

এই হল বিমলের নিত্যদিনের সংক্ষিপ্ত কর্মসূচী।

জগদ্দলের বিরুদ্ধে সমস্ত দুনিয়াটা ষড়যন্ত্র করছে। এই রকম একটা সংশয় বিমলের মনে দৃঢ়মূল হয়ে গেছে। দেখে আর আশ্চর্য্য হয়—উড়ন্ত চিলগুলোও বেছে ঠিক 'জগদ্দলের' মাথার ওপর মলত্যাগ করে; পথচারী লোকেরা পান খেয়ে হাতের চুণটি নিঃসঙ্কোচে জগদ্দলের গায়েই মুছে দিয়ে সড়ে পড়ে। স্ট্যাণ্ডে আরো তো ভালমন্দ সাতাশটা গাড়ী রয়েছে; তাদের তো কেউ এতটা অশ্রদ্ধা করতে সাহস করে না। জগদ্দলই বা কার পাকা ধানে এমন মই দিল?

জগদ্দল! বিমল আস্তে আস্তে ডাকে। স্নেহে দ্রব হয়ে আসে তার কণ্ঠস্বর। তার

সকল মমতা রক্ষাকবচের মত জগদ্দলকে যেন এই সমবেত অভিশাপ আর নিত্য গঞ্জনা থেকে আড়াল করে রাখতে চায়।

—'কুছ পরোয়া নেই জগদ্দল। আমি আর তুই আছি।' · একটা সুদর্পিত চ্যালেঞ্জ ঘোষণা করে বিমল বেপরোয়াভাবে, বিড়িতে জোরে জোরে টান দিয়ে যেন প্রতিসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত হয়ে নেয়।

ঝড় ঝঞ্ঝা নিয়ে এক আধটা দুর্দিনও আসে, আকস্মিক আধিব্যাধি মেরামতও থাকে—তাই প্রত্যেক গাড়ীই এক আধবার কামাই দিতে বাধ্য। কিন্তু জগদ্দলের উপস্থিতি ছিল সূর্যোদয়ের চেয়েও নিয়মিত ও নিশ্চিত। সমব্যবসায়ী ট্যাক্সিচালক মহলে এ-ও একটা ঈর্ষার কারণ হতে পারে। অন্ততঃপক্ষে বিমলের তাই বিশ্বাস! একটা খুনখুনে বুড়ো যদি দিনের পর দিন অনায়াসে লাফ-ঝাপ ডনকুস্তি মেরে বেড়ায়, কোন্ জোয়ান না তাকে হিংসে করে?

জগদ্দলকে নিয়ে এই সহেতুক গর্বে বিমল ফুলে থাকত সর্বদা। জগদ্দল -তার গত পনের বছরের বিলাসে ব্যাসনে দুর্দিনে নিত্য-সহচর। একাগ্র সেবায় তাকে পরিপুষ্ট করে এসেছে। দেব নরসিংহের কাছে কত লোক কত বিচিত্র মানত করে—কত রূপং দেহি যশো দেহি! বিমল দুপয়সার ফুল বাতাসা নরসিংহের পায়ের কাছে রাখে, মনে মনে ধ্বনিত হয়—একান্ত প্রার্থনা, সামান্য একটু দাবী। 'হে বাবা, জগদ্দল যেন বিকল না হয়। এ-বয়সে আর আমায় সঙ্গীহীন করো না বাবা, দোহাই।'

'লোকটাও একটা যন্ত্র'— বেঙ্গলী ক্লাবে আলোচনা হয়।— 'নইলে পনের বছর ধরে অহর্নিশি মোটরধ্যান। এ মানুষের সাধ্য নয়।'

বিমল নিজেই বলে, পোড়া পেট্রলের গন্ধে ওর কেমন-বেশ-একটু মিঠে মিঠে নেশা লাগে।

"আমিও যন্ত্র। বেঙ্গলী ক্লাব বলেছে ভাল।" বিমল খুশী হয়ে মনে মনে হাসে। কিন্তু জগদ্দলও যে মানুষের মত, এ তত্ত্ব বেঙ্গলী ক্লাব বোঝে না, এইটেই যা দুঃখ। এই কম্পিটিশনের বাজারে এই বুড়ো জগদ্দলই তো দিন গেলে নিদেন দুটি টাকা তার হাতে তুলে দিচ্ছে! আর তেল খায় কত কম। গ্যালনে সোজা বাইশটি মাইল দৌড়ে যায়। বিমল গরীব— জগদ্দল যেন এটুকু বোঝে।

আরবী ঘোড়ার মত প্রমত্ত বেগে জগদ্দল ছুটে চলেছে রাঁচীর পথে। সাবাস তার দম, দৌড় আর লোড টানার শক্তি। কম্পমান স্টিয়ারিং হুইলটাকে দুহাতে আঁকড়ে বুক ঠেকিয়ে বিমল ধরে রয়েছে। অনুভব করছে দুঃশীল জগদ্দলের প্রাণস্ফূর্তির শিহর।

কনকনে মাঘী হাওয়া ইস্পাতের ফলার মত চামড়া চেঁছে চলে যাচ্ছে। মাথায় জড়ানো কম্ফোর্টারটা দু'কানের ওপর টেনে নামিয়ে দিল—বিমলের বয়স হয়েছে, আজকাল ঠাণ্ডাফাণ্ডা সহজে কাবু করে দেয়।

সুমুখে পড়লো একটা পাহাড়ী ঘাট—এই সুবিসর্পিত চড়াইটা জগদ্দল কষ্ট চিতা বাঘের মত একদমে গোঁ গোঁ করে কতবার পার হয়ে গেছে। সেদিনও অভ্যস্ত বিশ্বাসে ঘাটের কাছে এসে বিমল চাপলো এক্সিলেটার—পুরো চাপ। জগদ্দল পঞ্চাশ গজ এগিয়ে খং খং করে কঁকিয়ে উঠল। যেন তার বুকের ভেতর কটা হাড় সরে গিয়েছে। উৎকর্ণ হয়ে বিমল শুনলো সে আওয়াজ। না ভুল নয়, সেরেছে আজ জগদ্দল—পিস্টন ভেঙে গেছে।

কদিন পরে মাঝ পথে এমনি আকস্মিক ভাবে বেয়ারিং গলে গিয়ে একটা বড় রিজার্ভ নষ্ট হয়ে গেল। তারপর একটা না একটা উপসর্গ লেগেই রইল। এটা দূর হয়তো ওটা আসে। আজ ফ্যানবেল্ট ছিঁড়ে, কাল কারবুরেটারে তেল পার হয় না, পরশু প্লাগগুলো অচল হয়ে পড়ে—শর্ট সারকিট হয়।

এত বড় বিশ্বাসের পাহাড়টা শেষে বুঝি টলে উঠল। বিমল কদিন থেকে অস্বাভাবিক রকমের বিমর্ষ—এদিক সেদিক ছোটাছুটি করে বেড়ায়। জগদ্দলেরও নিয়মভঙ্গ হয়েছে—স্ট্যাণ্ডে আসা বাদ পড়ছে মাঝে মাঝে। উৎকণ্ঠায় বিমলের বুক দুর দুর করে। তবে কি শেষে সত্যই জগদ্দল ছুটি নেবে?

"—না, আমি আছি জগদ্দল; তোকে সারিয়ে টেনে তুলবই, ভয় নেই।" মোটরবিশারদ পাকা মিস্ত্রী বিমল প্রতিজ্ঞা করলো।

কলকাতায় অর্ডার দিয়ে আনাল প্রত্যেকটি জেনুইন কলকব্জা। নতুন ব্যাটারী, ডিস্ট্রিবিউটর, এক্সেল, পিস্টন—সব আনিয়ে ফেললো। অকৃপণ হাতে সুরু হলো খরচ; প্রয়োজন বুঝলে রাতারাতি তার করে জিনিষ আনায়। রাত জেগে খুটখাট মেরামত, পার্টস বদল আর তেলজল চলেছে। জগদ্দলকে রোগে ধরেছে—বিমল প্রায় ক্ষেপে উঠল। অর্থাভাব—বেচে ফেলল ঘড়ি, বাসনপত্র, তক্তপোষটা পর্যন্ত।

সর্ব্বস্ব তো গেল, যাক। পনর বছরের বন্ধু জগদ্দল এবার খুশী হবে, সেরে উঠবে। খুব করা গেছে যা হোক; এবার নতুন হুড, রং আর বার্ণিস পড়লে একখানি বাহার খুলবে বটে।

রাত্রি দুপুরে জগদ্দলকে গ্যারেজে বন্ধ করার সময় বিমল একবার আলো তুলে দেখে নিল। খুশী উপচে পড়লো তার দু'চোখে।—এই তো বলিহারী মানিয়েছে জগদ্দলকে। কদিনের অক্লান্ত সেবায় জগদ্দলের চেহারা গেছে ফিরে; দেখাচ্ছে যেন একটি তেজী পেশীওয়ালা পালোয়ান—এই ইসারায় দঙ্গলে ভিড়ে যেতে প্রস্তুত! হাত মুখ ধুয়ে শুয়ে

পড়লো বিমল—বড় পরিশ্রমের চোট গেছে ক'দিন। কিন্তু কি আরামই না লাগছে ভাবতে—জগদ্দল সেরে উঠেছে; কাল সকালে সগর্জ্জনে নতুন হর্ণের শব্দে সচকিত করে জগদ্দলকে নিয়ে যখন স্ট্যাণ্ডে গিয়ে দাঁড়াবে, বিস্ময়ে হতবাক হবে সব, আবার জ্বলবে হিংসেতে।

হঠাৎ বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। শেষ রাত্রি তবু নিরেট অন্ধকার। ঝুপ ঝুপ করে বৃষ্টি পড়ছে। ধড়ফড় করে উঠে বসল বিমল।—জগদ্দল ভিজছে না তো! গ্যারেজের টিনের ছাদটা যা পুরানো, কত ফুটো ফাটাল আছে কে জানে! কোন ফাঁকে ইঞ্জিনে জল ঢুকলে হয়েছে আর কি। বড়ির নতুন পালিসটাকেও স্রেফ ঘা করে দেবে।

হ্যারিকেনটা জ্বালিয়ে নিয়ে গ্যারেজে ঢুকে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল—'আরে হায়! হায়! ছাদের ফুটো দিয়ে ঝপ্ ঝপ্ করে বৃষ্টির জল ঝরে পড়ছে ঠিক ইঞ্জিনের ওপর। দৌড়ে শোবার ঘর থেকে নিয়ে এল তার বর্ষাতিটা, টেনে আনল বিছানার কম্বল সতরঞ্চি চাদর।

ইঞ্জিনের ভেজা বনেটটা মুছে ফেলে কম্বলটা চাপিয়ে দিল—তার ওপর বর্ষাতিটা। সতরঞ্চি আর চাদর দিয়ে গাড়'টার সর্ব্বাঙ্গ ঢেকে দিয়ে নিজেও ঢুকে পড়ল ভেতরে; নতুন নরম গদিটার ওপর গুটিসুটি মেরে বিমল শুয়ে পড়ল; আরামে তার দু' চোখে ঘুমের ঢল এল নেমে।

পরদিনের ইতিহাস। স্ট্যাণ্ডের উদগ্রীব জনতা জগদ্দলকে ঘিরে দাঁড়ালো- যেন একটা অঘটন ঘটে গেছে। স্তুতিমুখর দর্শকেরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল বিমলের অপূর্ব্ব মিস্ত্রী-প্রতিভার নিদর্শন। বিমল টেনে টেনে কয়েকবার হাসল। কিন্তু কেমন যেন একটু অস্বচ্ছ সে হাসি একটা শঙ্কার ধূসর স্পর্শে আবিল।

কেন? বিমলের মন গেছে ভেঙে। জগদ্দল চলছে সত্যি, কিন্তু কৈ সেই স্টার্ট মাত্র শক্তির উচ্চকিত ফুৎকার, সেই দর্পিত হ্রেষাধ্বনি আর দুরন্ত বনহরিণের গতি?

সহর থেকে দূরে একটা মাঠের ধারে গিয়ে বিমল বেশ করে জগদ্দলকে পরীক্ষা করে দেখল।

—'চল বাবা জগদ্দল: একবার পক্ষিরাজের মত ছাড় তো পাখা!' চাপল এক্সিলেটার! নাঃ বৃথা, জগদ্দল অসমর্থ।

ফার্ষ্ট, সেকেণ্ড, থার্ড—প্রত্যেকটি গিয়ার পর পর পাল্টে টান দিল। শেষে রাগ চড়ে গেল মাথায়—চল, নইলে মারব লাথি।

অক্ষম বৃদ্ধের মত জগদ্দল হাঁপিয়ে হাঁপিয়ে খানিক দূর দৌড়ল!

—'আদর বোঝে না, কথা বোঝে না শালা লোহার-বাচ্চা, নির্জীব ভূত—বিমল সত্যি সত্যি ক্লাচের ওপর সজোরে দুটো লাথি মেরে বসল।

বিমলের রাগ ক্রমশঃ বাড়ছে, সেই বুনো রাগ! আজ শেষ জবাব জেনে নেবে সে! জগদ্দল থাকতে চায়, না যেতে চায়? অনেক তোয়াজ করেছে সে, আর নয়।

রাগে মাথাটা খারাপই হয়ে গেল বোধ হয়। বিমল ঠেলে ঠেলে প্রকাণ্ড সাত আটটা পাথর নিয়ে এলো। ঘামে ভিজে ঢোল হয়ে গেল তার খাকি কামিজ। এক এক করে সব পাথরগুলো গাড়ীতে দিল তুলে—একেই বলে লোড!

চল্। জগদ্দল চলল; গাঁটে গাঁটে আর্ত্তনাদ বেজে উঠল ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে। অসমর্থ—আর পারবে না জগদ্দল এ ভার বইতে!

এইবার বিমল নিশ্চিন্ত। জগদ্দলকে যমে ধরেছে—এ সত্যে আর সন্দেহ নেই। এত কড়া কলজে জগদ্দলের তাতেও ঘুণ ধরল আজ। কৃতান্তের কীট—আর রক্ষে নেই, এইবার দিন ফুরিয়ে সন্ধ্যা নামবে। শেষ কড়ি খরচ করেও রইল না জগদ্দল।

আমি শুধু রৈনু বাকী—পরিশ্রান্ত বিমল মনে মনে যেন বলে উঠল।—কিন্তু আমারো তো হয়ে এসেছে। চুলে পাক ধরেছে, রগগুলো জোঁকের মত গা ছেড়ে ফেলেছে সব।

—'জগদ্দল আগেই যাবে মনে হচ্ছে। তারপর আমার পালা। যা জগদ্দল, ভাল মনেই বিদেয় দিলাম। অনেক খাইয়েছিস, পরিয়েছিস, আর কত পারবি? আমার যা হবার হবে।—যা কোন দিন হয়নি তাই হলো। ইস্পাতের গুলির মতই শুকনো ঠাণ্ডা বিমলের চোখে দেখা দিল দু' ফোঁটা জল।

ফিরে এসে বিমল জগদ্দলকে গ্যারেজের বাইরে বেলতলায় দাঁড় করিয়ে নেমে পড়ল। পেছন ফিরে আর তাকাল না। সোজা গিয়ে উঠোনে বসে পড়ল—সামনে রাখল দু বোতল তেজালো মহুয়া।

একটি চুমুক সবে দিয়েছে, শোনা গেল কে ডাকছে—বিমলবাবু আছে! গোবিন্দের গলা।

গোবিন্দ এল, সঙ্গে একজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক।

—আদাব বাবুজী।

—আদাব, কোন্ গাড়ীর এজেন্ট আপনি? বিমল প্রশ্ন করল। গোবিন্দ পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—'গাড়ীর এজেন্ট নন উনি; পুরানো লোহা কিনতে এসেছেন কলকাতা থেকে। তোমার তো গাদাখানেক ভাঙা এ্যাক্সেল রীমটিম জমে আছে। দর বুঝে ছেড়ে দাও এবার।

বিমল খানিকক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইল দুজনের দিকে। ভবিতব্যের ছায়ামূর্ত্তি তার পরম ক্ষুধার দাবী নিয়ে, ভিক্ষাভাণ্ডটি প্রসারিত করে আজ দাঁড়িয়েছে সম্মুখে। এমনিতে ফিরবে না সে, শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা চাই; বিমল ব্যাপারটা বুঝল।

—হাঁ আছে পুরানো লোহা, অনেক আছে, কত দর দিচ্ছেন?

—চৌদ্দ আনা মণ বাবুজী, মারোয়াড়ীর ব্যগ্র জবাব এল।—লড়াই লেগেছে, এই, তো মৌকা ; ঝেড়ে পুছে সব দিয়ে ফেলুন বাবুজী।

—হাঁ সব দেব। আমার ঐ গাড়ীটাও। ওটা একেবারে অকেজো হয়ে গেছে।

হতভম্ব গোবিন্দ শুধু বলল—সে কি গো বিমলবাবু?

নেশা ভাঙলো এক ঘুমের পর। তখনো রাত, বিমল আর এক বোতল পার করে শুয়ে পড়লো।

ভোর হয়ে এসেছে। থেকে থেকে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে বিমলের। বাইরের জাগ্রত পৃথিবীর সমস্ত কোলাহল উপচে একটি শুধু শব্দ বিমলের কানে এসে আছড়ে পড়ছে—ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং। মারোয়াড়ীর লোকজন ভোরে এসেই বিমলের গাড়ী টুক্‌রো টুক্‌রো করে খুলে ফেলছে।

শোক আর নেশা। জগদ্দলের পাঁজর খুলে পড়ছে একে একে। বিমলের চৈতন্যও থেকে থেকে কোন অন্তহীন নৈঃশব্দ্যের আবর্ত্তে যেন পাক দিয়ে নেমে যাচ্ছে অতলে। তার পরেই লঘুভার হয়ে ভেসে উঠছে ওপরে। এরই মাঝে শুনতে পাচ্ছে—ঠং ঠং ঠকাং ঠকাং—জগদ্দলের সমাধি খনন চলেছে। যেন কোদাল আর শাবলের শব্দ।

ফসিল

নেটিভ স্টেট অঞ্জনগড ; আয়তন কাঁটায় কাঁটায় সাড়ে-আটষট্টি বর্গ-মাইল। তবুও নেটিভ স্টেট, বাঘের বাচ্চা বাঘই। মহারাজা আছেন ; ফৌজ, ফৌজদার, সেরেস্তা, নাজারৎ সব আছে। এককুড়ির ওপর মহারাজার উপাধি। তিনি ত্রিভুবনপতি, তিনি নরপাল, ধর্ম্মপাল এবং অরাতিদমন। ছ'পুরুষ আগে এ-রাজ্যে বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় প্রথায় অপরাধীকে শূলে চড়ানো হ'ত ; এখন সেটা আর সম্ভব নয়। তার বদলে শুধু ন্যাংটো করে মৌমাছি লেলিয়ে দেওয়া হয়।

সাবেক কালের কেল্লাটা যদিও লুপ্তশ্রী, তার পাথরের গাঁথুনিটা আজও অটুট। কেল্লার ফটকে বুনো হাতীর জীর্ণ কঙ্কালের মতো দুটো মরচে-পড়া কামান। তার নলের ভেতর পায়রার দল স্বচ্ছন্দে ডিম পারে ; তার ছায়ায় বসে ক্লান্ত কুকুরেরা ঝিমোয়। দপ্তরে দপ্তরে শুধু পাগড়ী আর তরবারির ঘটা ; দেয়ালে দেয়ালে ঘুঁটের মত তামা আর লোহার ঢাল।

সচিব, সচিবোত্তম আর ন্যায়াধীশ—ফৌজদার, আমিন, কোতোয়াল, আর সেরেস্তাদার। ক্ষত্রিয় আর মোগল এই ছ'জাতের আমলাদের যৌথ-প্রতিভার সাহায্যে মহারাজা প্রজারঞ্জন করেন। সেই অপূর্ব্ব অদ্ভুত শাসনের ঝাঁজে রাজ্যের অর্দ্ধেক প্রজা সরে পড়েছে দূর মরিসাসের চিনির কারখানায় কুলির কাজ নিয়ে।

সাড়ে-আটষট্টি বর্গমাইল অঞ্জনগড—শুধু ঘোড়ানিম আর ফণীমনসায় ছাওয়া রুক্ষ কাঁকরে মাটির ডাঙা আর নেড়া নেড়া পাহাড়। কুর্ম্মি আর ভীলেরা ছ'ক্রোশ দূরের পাহাড়ের গায়ে লুকানো জলকুণ্ড থেকে মোষের চামড়ার থলিতে জল ভরে আনে—জমিতে সেচ দেয়—ভুট্টা যব আর জনার ফলায়।

প্রত্যেক বছর স্টেটের তসীল বিভাগ আর ভীল ও কুর্ম্মি প্রজাদের ভেতর একটা সংঘর্ষ বাধে। চাষীরা রাজভাণ্ডারের জন্য ফসল ছাড়তে চায় না। কিন্তু অর্দ্ধেক ফসল দিতেই হবে। মহারাজার সুগঠিত পোলো টীম আছে। হয়শ্রেষ্ঠ শতাধিক ওয়েলারের হ্রেষারবে রাজ-আস্তাবল সতত মুখরিত। সিডনির নেটিভ এই দেবতুল্য জীবগুলির ওপর মহারাজার অপার ভক্তি। তাদের তো আর খোল ভুষি খাওয়ানো চলে না। ভুট্টা যব জনার চাই-ই।

তসীলদার অগত্যা সেপাই ডাকে। রাজপুত বীরের বল্লম আর লাঠির মারে

ক্ষাত্রবীর্য্যের স্ফুলিঙ্গ বৃষ্টি হয়। এক ঘণ্টার মধ্যে সব প্রতিবাদ স্তব্ধ, সব বিদ্রোহ প্রশমিত হয়ে যায়।

পরাজিত ভীলেদের অপরিমেয় জংলী সহিষ্ণুতাও ভেঙে পড়ে। তারা দলে দলে রাজ্য ছেড়ে গিয়ে ভর্ত্তি হয় সোজা কোন ধাঙড়-রিক্রুটারের ক্যাম্পে। মেয়ে মরদ শিশু নিয়ে কেউ যায় নয়াদিল্লী, কেউ কলকাতা, কেউ শিলং। ভীলেরা ভুলেও আর ফিরে আসে না।

শুধু নড়তে চায় না কুর্মি প্রজারা। এ-রাজ্যে তাদের সাতপুরুষের বাস। ঘোড়ানিমের ছায়ায় ছায়ায় ছোট বড় এমন ঠাণ্ডা মাটির ডাঙা, কালমেঘ আর অনন্তমূলের চারার এক একটা ঝোপ; সালসার মত সুগন্ধ মাটিতে। তাদের যেন নাড়ীর টানে বেঁধে রেখেছে। বেহায়ার মত চাষ করে, বিদ্রোহ করে আর মারও খায়। ঋতুচক্রের মত এই ত্রিদশার আবর্ত্তনে তাদের দিনসন্ধ্যের সমস্ত মুহূর্ত্তগুলি ঘুরপাক খায়। এদিক ওদিক হবার উপায় নেই।

তবে অঞ্জনগড থেকে দয়াধর্ম্ম একেবারে নির্ব্বাসিত নয়। প্রতি রবিবারে কেল্লার সামনে সুপ্রশস্ত চবুতরায় হাজারের ওপর দুস্থ জমায়েত হয়। দরবার থেকে বিতরণ করা হয় চিঁড়ে আর গুড়। সংক্রান্তির দিনে মহারাজা গায়ে-আল্পনা-আঁকা হাতীর পিঠে চড়ে জলুস নিয়ে পথে বার হন প্রজাদের আশীর্ব্বাদ করতে। তাঁর জন্মদিনে কেল্লার আঙিনায় রামলীলা গান হয়—প্রজারা নিমন্ত্রণ পায়। তবে অতিরিক্ত ক্ষত্রিয়ত্বের প্রকোপে যা হয়—সব ব্যাপারেই লাঠি। যেখানে জনতা আর জয়ধ্বনি সেখানে লাঠি চলবেই, আর দুচারটে অভাগার মাথা ফাটবেই। চিঁড়ে আশীর্ব্বাদ বা রামলীলা—সবই লাঠির সহযোগে পরিবেশন করা হয়। প্রজারা সেই ভাবেই উপভোগ করতে অভ্যস্ত।

লাঠিতন্ত্রের দাপটে স্টেটের শাসন, আদায় উসুল আর তসীল চলছিল বটে, কিন্তু যেটুকু হচ্ছিল তাতে গদির গৌরব টিকিয়ে রাখা যায় না। নরেন্দ্রমণ্ডলের চাঁদা আর পোলো টিমের খরচ! রাজবাড়ীর বাপের কালের সিন্দুকের রূপো আর সোনার গাদিতে ক্রমে ক্রমে হাত পড়ল।

অঞ্জনগড়ের এই অদৃষ্টের সন্ধিক্ষণে দরবারের ল-এজেন্টের পদে আনানো হল একজন ইংরেজী আইনবীশ। আমাদের মুখার্জীই এল ল-এজেণ্ট হয়ে। মুখার্জীর চওড়া বুক—যেমন পোলো ম্যাচে তেমনি স্টেটের কাজে অচিরে মহারাজার বড় সহায় হয়ে দাঁড়ালো। ক্রমে মুখার্জীই হয়ে গেল 'ডি ফ্যাক্টো' সচিবোত্তম আর সচিবোত্তম রইলেন শুধু সই করতে।

আমাদের মুখার্জী আদর্শবাদী। ছেলেবেলার ইতিহাস-পড়া মার্কিণী ডেমোক্রেসীর স্বপ্নটা আজো তার চিন্তার পাকে পাকে জড়িয়ে আছে। বয়সে অপ্রবীণ হলেও সে

অত্যন্ত শান্তবুদ্ধি। সে বিশ্বাস করে —যে সৎ-সাহসী সে কখনো পরাজিত হয় না, যে কল্যাণকৃৎ তার কখনো দুর্গতি হতে পারে না।

মুখার্জী তার প্রতিভার প্রতিটি পরমাণু উজাড় করে দিল স্টেটের উন্নতি সাধনায়। অঞ্জনগড়ের আবালবৃদ্ধ চিনে ফেলল তাদের এজেণ্ট সাহেবকে, একদিকে যেমন কড়া অন্য দিকে তেমনি হমদরদ। প্রজারা ভয় পায় ভক্তিও করে। মুখার্জীর নির্দেশে বন্ধ হল লাঠিবাজী। সমস্ত দপ্তর চুলচেরা অডিট করে তোলপাড় করে তুললো। স্টেটের জরীপ হল নতুন করে; সেন্সাস নেওয়া হল। এমন কি মরচে-পড়া কামান দুটোকেও পালিস করে চকচকে করে ফেলা হ'ল।

স-এজেণ্ট মুখার্জীই একদিন আবিষ্কার করল অঞ্জনগড়ের অন্তর্ভৌম সম্পদ। রত্নগর্ভ অঞ্জনগড়—তার গ্রানিটে গড়া পাঁজরের ভাঁজে ভাঁজে অভ্র আর অ্যাসবেস্টসের স্তূপ! কলকাতার মার্চ্চেণ্টদের ডাকিয়ে ঐ কাঁকরে মাটির ডাঙাগুলিই লাখ লাখ টাকায় ইজারা করিয়ে দিল। অঞ্জনগড়ের শ্রী গেল ফিরে।

আজ কেল্লার এক পাশে গড়ে উঠেছে সুবিরাট গোয়ালিয়রী স্টাইলের প্যালেস। মার্বেল, মোজেয়িক কংক্রীট আর ভিনিসিয়ান সার্সীর বিচিত্র পরিসজ্জা! সরকারী গ্যারেজে দামী দামী জার্ম্মান লিমুজিন, সিডান আর টুরার। আস্তাবলে নতুন আমদানি আইরিস পনির অবিরাম লাথালাথি। প্রকাণ্ড একটা বিদ্যুতের পাওয়ার হাউস—দিবারাত্র ধক্‌ ধক্‌ শব্দে অঞ্জন গড়ের নতুন চেতনা আর পরমায়ু ঘোষণা করে।

সত্যই নতুন প্রাণের জোয়ার এসেছে অঞ্জনগড়ে। মার্চ্চেণ্টরা একজোট হয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে —মাইনিং সিণ্ডিকেট। খনি অঞ্চলে ধীরে গড়ে উঠেছে খোয়াবাঁধানো বড় বড় সড়ক, কুলির ধাওড়া, পাম্প-বসানো ইঁদারা, ক্লাব, বাংলো কেয়ারিকরা ফুলের বাগিচা আর জিমখানা। কুর্ম্মি কুলিরা দলে দলে ধাওড়া জাঁকিয়ে বসেছে। নগদ মজুরী পায়, মুর্গি বলি দেয়, হাঁড়িয়া খায় আর নিত্য সন্ধ্যায় মাদল ঢোলক পিটিয়ে খনি অঞ্চল সরগরম করে রাখে।

মহারাজা এইবার প্ল্যান আঁটছেন—দুটো নতুন পোলো গ্রাউণ্ড তৈরী করতে হবে; আরো এগার বিঘা জমি যোগ করে প্যালেসের বাগানটাকে বাড়াতে হবে। নহবতের জন্য একজন মাইনে-করা ইটালীয়ান ব্যাণ্ড মাষ্টার হ'লেই ভাল।

অঞ্জনগড়ের মানচিত্রটা টেবিলের ওপর ছড়িয়ে মুখার্জী বিভোর হয়ে ভাবে—তার ইরিগেশন স্কীমটার কথা।—উত্তর থেকে দক্ষিণ, সমান্তরাল দশটা ক্যানেল। মাঝে মাঝে প্ল্যান-করা কড়া-গাঁথুনির স্লুস-বসানো বড় বড় ডাম। অঞ্জনা নদীর সমস্ত জলের ঢল কায়দা করে অঙ্গনগড়ের পাথুরে বুকের ভেতর চালিয়ে দিতে হবে—রক্তবাহী শিরার মত। প্রত্যেক কুর্ম্মি প্রজাকে মাথা পিছু তিন কাঠা জমি। আউশ আর আমন। তা ছাড়া

একটা রবি। বছরের এই তিন কিস্তি ফসল তুলতেই হবে। উত্তরের প্লটের সমস্তটাই নার্সারী, আলু আর তামাক; দক্ষিণে আখ, যব আর গম। তারপর—

তারপর ধীরে একটা ব্যাঙ্ক; ক্রমে একটা ট্যানারী আর কাগজের মিল। রাজকোষের সে অকিঞ্চনতা আর নেই। এই তো শুভ মাহেন্দ্রক্ষণ! শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত এক একটি পরিকল্পনায় সে অঞ্জনগড়ের রূপ ফিরিয়ে দেবে। সে দেখিয়ে দেবে রাজ্যশাসন লাঠিবাজি নয়; এও একটা আর্ট।

একটা স্কুল—এইটাতে মহারাজার স্পষ্ট জবাব, কভি নেহি! মুখার্জী উঠলো। দেখা যাক্, বুঝিয়ে বাগিয়ে মহারাজার আপত্তিটা টলাতে পারে কি না।

মহারাজা তাঁর গালপাট্টা দাড়ির, গোছাটাকে একটা নির্মম মোচড় দিয়ে মুখার্জীর সামনে এগিয়ে দিল দুটো কাগজ—এই দেখ।

প্রথম পত্র—প্রবল প্রতাপ দরবার আর দরবারের ঈশ্বর মহারাজ! আপনি প্রজার বাপ। আপনি দেন বলেই আমরা খাই। অতএব এ বছর ভুট্টা, যব, জনার যা ফলবে, তাতে যেন সরকারী হাত না পড়ে। আইনসঙ্গতভাবে সরকারকে যা দেয়, তা আমরা দেব ও রসিদ নেব। ইতি দরবারের অনুগত ভৃত্য: কুর্মি সমাজের তরফে দুলাল মাহাতো বকলম খাস।

দ্বিতীয় পত্র—মহারাজার পেয়াদা এসে আমাদের খনির ভেতর ঢুকে চারজন কুর্মি কুলিকে ধরে নিয়ে গেছে আর তাদের স্ত্রীদের লাঠি দিয়ে মেরেছে। আমরা একে অধিকারবিরুদ্ধ মনে করি এবং দাবী করি মহারাজার পক্ষ থেকে শীঘ্রই এ-ব্যাপারের সুমীমাংসা হবে। ইতি সিণ্ডিকেটের চেয়ারম্যান গিবসন।

মহারাজা বললেন—দেখছ তো মুখার্জী, শালাদের সাহস।

—হ্যাঁ, দেখছি।

টেবিলে ঘুসি মেরে বিকট চীৎকার করে অরাতিদমন প্রায় ফেটে পড়ল—মুড়ো, শালাদের মুড়ো কেটে এনে ছড়িয়ে দাও আমার সামনে। আমি বসে বসে দেখি, দুদিন দুরাত দেখি।

মুখার্জী মহারাজকে শান্ত করল—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। আমি একবার ভেতরে ভেতরে অনুসন্ধান করি, আসল ব্যাপার কি।

বৃদ্ধ দুলাল মাহাতো বহুদিন পরে মারসাস থেকে অঞ্জনগড়ে ফিরেছে। বাকী জীবনটা উপভোগ করার জন্য সঙ্গে নগদ সাতটি টাকা এবং বুকভরা হাঁপানি নিয়ে ফিরেছে। তবু তার আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে কুর্মিদের জীবনেও যেন একটা চঞ্চলতা—একটা নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে।

কুর্মিরা দুলালের কাছে শিখেছে—নগদ মজুরী কি জিনিষ। কয়লাবাদ ষ্টেশনে কোন বাবুসাহেবের একটা দশসেরী বোঝা ট্রেণের কামরায় তুলে দাও! ব্যস্—নগদ একটি আনা, হাতে হাতে।

দুলাল বলতো—ভাইসব, এই বুড়োর মাথায় য'টা সাদা চুল দেখছ, ঠিক ততবার সে বিশ্বাস করে ঠকেছে। এবার আর কাউকে বিশ্বাস নয়। সব নগদ নগদ। এক হাতে নেবে তবে অন্য হাতে সেলাম করবে।

সিণ্ডিকেটের সাহেবদের সঙ্গে দুলাল সমানে কথা চালায়। কুলিদের মজুরীর রেট, হপ্তা পেমেণ্ট, ছুটি, ভাতা আর ওষুধের ব্যবস্থা—এ সবই দুলাল কুর্মিদের মুখপাত্র হয়ে আলোচনা করেছে; পাকা প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছে। সিণ্ডিকেটও দুলালকে উঠতে বসতে তোয়াজ করে—চলে এস দুলাল। বলতো রাতারাতি বিশ ডজন ধাওড়া করে দিচ্ছি। তোমার সব কুর্মিদের ভর্ত্তি করে নেব।

দুলাল জবাব দেয়—আচ্ছা, সে হবে। তবে আপাততঃ কুলি পিছু কিছু কয়লা আর কেরোসিন তেল মুফতি দেবার অর্ডার হোক্।

—আচ্ছা তাই হবে। সিণ্ডিকেটের সাহেবরা তাকে কথা দিত।

দুলালের আমন্ত্রণ পেয়ে একদিন রাজ্যের কুর্মি একত্রিত হ'ল ঘোড়ানিমের জঙ্গলে। পাকাচুলে ভরা মাথা থেকে পাগড়ীটা খুলে হাতে নিয়ে দুলাল দাঁড়ালো—আজ আমাদের মণ্ডলের প্রতিষ্ঠা হ'ল। এখন ভাব কি করা উচিত। চিনে দেখ, কে আমাদের দুসমন আর কেই বা দোস্ত। আর ভয় করলে চলবে না। পেট আর ইজ্জৎ, এর ওপর যে ছুরি চালাতে আসবে তাকে আর কোন মতেই ক্ষমা নয়।

ভাঙা শঙ্খের মত দুলালের স্থবির কণ্ঠনালীটা অতিরিক্ত উৎসাহে কেঁপে কেঁপে আওয়াজ ছাড়ল—ভাই সব, আজ থেকে এ মাহাতোর প্রাণ মণ্ডলের জন্য, আর মণ্ডলের প্রাণ···।

কুর্মি জনতা একসঙ্গে হাজার লাঠি তুলে প্রত্যুত্তর দিল—মাহাতোর জন্য। ঢাক ঢোল পিটিয়ে একটা নিশান পর্যন্ত উড়িয়ে দিল তারা। তারপর যে যার ঘরে গেল ফিরে।

ঘটনাটা যতই গোপনে ঘটুক না কেন মুখার্জীর কিছু জানতে বাকী রইল না। এটুকু সে বুঝল—এই মেঘে বজ্র থাকে। সময় থাকতে চটপট একটা ব্যবস্থা দরকার। কিন্তু মহারাজা যেন ঘুণাক্ষরেও জানতে না পায়। ফিউডলী দেমাকে অন্ধ আর ইজ্জৎ কমপ্লেক্সে জর্জ্জর এই সব নরপালদের তা হ'লে সামলানো দুষ্কর হবে। বৃথা একটা রক্তপাতও হয়তো হয়ে যাবে। তার চেয়ে নিজেই একহাত ভদ্রভাবে লড়ে নেওয়া যাক্।

পেয়াদারা এসে মহারাজকে জানালো—কুর্মিরা রাজবাড়ীর বাগানে আর পোলো লনে বেগার খাটতে এল না। তারা বলছে—বিনা মজুরীতে খাটলে পাপ হবে; রাজ্যের অমঙ্গল হবে।

ডাক পড়ল মুখার্জীর। দুলাল মাহাতোকেও তলব করা হ’ল। জোড় হাতে দুলাল মাহাতো প্রণিপাত করে দাঁড়ালো। মেষশিশুর মত ভীরু—দুলাল যেন ঠক্ ঠক্ করে কাঁপছে।

—তুমিই এসব সয়তানী করছ! মহারাজা বললেন।

—হুজুরের জুতোর ধুলো আমি।

—চুপ থাক।

—জী সরকার।

—চুপ! মহারাজা জীমূতধ্বনি করলেন। দুলাল কাঠের পুতুলের মত স্থির হয়ে গেল।

—ফিরিঙ্গি বেনিয়াদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ছাড়তে হবে। আমার বিনা হুকুমে কোন কুর্মি খনিতে কুলি হয়ে খাটতে পারবে না।

—জী সরকার। আপনার হুকুম আমার জাতকে জানিয়ে দেব।

—যাও।

দুলাল দণ্ডবৎ করে চলে গেল। এবার আদেশ হ’ল মুখার্জীর ওপর।—সিণ্ডিকেটকে এখুনি নোটীশ দাও, যেন আমার বিনা সুপারিশে আমার কোন কুর্মি প্রজাকে কুলির কাজে ভর্ত্তি না করে।

অবিলম্বে যথাস্থান থেকে উত্তর এল একে একে। দুলাল মাহাতোর স্বাক্ষরিত পত্র। —যেহেতু আমরা নগদ মজুরী পাই, না পেলে আমাদের পেট চলবে না, সেই হেতু আমরা খনির কাজ ছাড়তে অসমর্থ। আশা করি দরবার এতে বাধা দেবেন না।...... আগামী মাসে আমাদের নতুন মন্দির প্রতিষ্ঠা হবে। রাজ-তহবিল থেকে এক হাজার টাকা মঞ্জুর করতে সরকারের হুকুম হয়। ....আগামী শীতের সময়ে বিনা টিকিটে জঙ্গলের ঝুরি আর লকড়ি ব্যবহার করার অনুমতি হয়।

নোটিশের প্রত্যুত্তরে সিণ্ডিকেটেরও একটা জবাব এল—মহারাজার সঙ্গে কোন নতুন সর্ত্তে চুক্তিবদ্ধ হতে আমরা রাজি আছি। তবে আজ নয়। বর্ত্তমান চুক্তির মেয়াদ যখন ফুরোবে—নিরানব্বই বছর পরে।

—কি রকম বুঝছ মুখার্জী? অগত্যা দেখছি ফৌজদারকেই ডাকতে হয়। জিজ্ঞাসা করি, খাল-কাটার স্বপ্নটা ছেড়ে দিয়ে এখন আমার ইজ্জতের কথাটা একবার ভাববে কি না?

মহারাজ আস্তে আস্তে বললেন বটে, কিন্তু মুখ-চোখের চেহারা থেকে বোঝা গেল, রুদ্ধ একটা আক্রোশ শত ফণা বিস্তার করে তাঁর মনের ভেতর ছট্ফট্ করছে।

মুখার্জী সবিনয়ে নিবেদন করল—মন খারাপ করবেন না সরকার। আমাকে সময় দিন, সব গুছিয়ে আনছি আমি।

মুখার্জী বুঝেছে দুলালের এই দুঃসাহসের প্রেরণা যোগাচ্ছে কারা? সিণ্ডিকেটের দুষ্ট

উৎসাহেই কুর্মি সমাজের নাচানাচি। এই যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন না করলে রাজ্যের সমূহ অশান্তি—অমঙ্গলও। কিন্তু কি করা যায়!

দুলাল মাহাতোর কুঁড়েঘরের কাছে মুখার্জী এসে দাঁড়ালো। ব্যস্তভাবে দুলাল বেরিয়ে এসে একটা চৌকী এনে মুখার্জীকে বসতে দিল। মাথার পাগড়ীটা খুলে মুখার্জীর পায়ের কাছে রেখে দুলালও বসলো মাটির ওপর। মুখার্জী এক এক করে তাকে সব বুঝিয়ে শেষে বড় অভিমানে ভেঙ্গে পড়ল—একি করছো মাহাতো! দরবারের ছেলে তোমারা; কখনো ছেলে দোষ করে, কখনো করে বাপ। তাই বলে পরকে ডেকে কেউ ঘরের ইজ্জৎ নষ্ট করে না। সিংকেট আজ না হয় তোমাদের ভাল খাওয়াচ্ছে, কিন্তু কাল যখন তার কাজ ফুরোবে তখন তোমাদের দিকে ফিরেও তাকাবে না। এই দরবারই তখন দুমুঠো চিঁড়ে দিয়ে তোমাদের বাচাবে।

মুখার্জীর পায়ে হাত রেখে দুলাল বলল—কসম, এজেন্ট বাবা, তোমার কথা রাখব। বাপের তুল্য মহারাজা, তাঁর জন্য আমরা প্রাণ দিতে তৈরী। তবে ঐ দরখাস্তটি একটু জলদি জলদি মঞ্জুর হয়।

দ্বিতীয় প্রশ্ন বা উত্তরের অপেক্ষা না করে মুখার্জী দুলালের কুঁড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে পড়ল।—নাঃ, রোগে তো ধরেই ছিল অনেকদিন। এইবার দেখা দিয়েছে বিকারের লক্ষণ।

স্নান, আহার আর পোষাক বদলাবার কথা মুখার্জীকে ভুলতে হ'ল আজ। একটানা ড্রাইভ করে থামলো এসে সিংকেটের অফিসে।

- দেখুন মিঃ গিবসন, রাজা প্রজা সম্পর্কের ভেতর দয়া করে হস্তক্ষেপ করবেন না আপনারা। আপনাদের কারবারের সুখ সুবিধার জন্য দরবার তো পূর্ণ গ্যারান্টি দিয়েছে।

গিবসন বললো—মিষ্টার মুখার্জী, আমরা মনিমেকার নই, আমাদের একটা মিশনও আছে। নির্যাতিত মানুষের পক্ষ নিয়ে আমরা চিরকাল লড়ে এসেছি। দরকার থাকে, আরো লড়বো।

—সব কুর্মি প্রজাদের লোভ দেখিয়ে আপনারা কুলি করে ফেলছেন। স্টেটের এগ্রিকালচার তাহ'লে কি করে বাঁচে বলুন তো!

ঝোঁকের মাথায় মুখার্জী তার ক্ষোভের আসল কারণটি ব্যক্ত করে ফেললো।

—এগ্রিকালচার না বাঁচুক. ওয়েল্‌থ তো বাঁচছে। এটা অস্বীকার করতে পারেন? গিবসন বিদ্রূপের স্বরে উত্তর দেয়।

—তর্ক ছেড়ে কো-অপারেশনের কথা ভাবুন মিষ্টার গিবসন। কুলি ভর্তির সময় দরবার থেকে একটু অনুমোদন করিয়ে নেবেন, এই মাত্র। মহারাজও খুসি হবেন এবং তাতে আপনাদেরও অন্যদিকে নিশ্চয়ই ভাল হবে।

—সরি, মিষ্টার মুখার্জী! গিবসন বাঁকা হাসি হেসে চুরুট ধরালো।

নিদারুণ বিরক্তিতে লাল হয়ে উঠল মুখার্জীর কর্ণমূল। সজোরে চেয়ারটা ঠেলে দিয়ে সে অফিস ছেড়ে চলে গেল।

ম্যাক্‌কেনা এসে জিজ্ঞাসা করল—কি ব্যাপার হে গিবসন?

—মুখার্জী, হ্বাট্‌ মংকি অফ অ্যান এ্যাডমিনিস্ট্রেটার, মুখের ওপর শুনিয়ে দিয়েছি। কোন টার্মই গ্রাহ্য করিনি।

—ঠিক করেছ। শুনেছ তো, ওর ঐ ইরিগেশন স্কীমটা? সময় থাক্‌তে ভণ্ডুল ক'রে দিতে হবে, নইলে সাংঘাতিক লেবারের অভাবে পড়তে হবে। কারবার এখন বাড়তির মুখে। খুব সাবধান।

—কোন চিন্তা নেই। পোষা বিড়াল মাহাতো রয়েছে আমাদের হাতে। ওকে দিয়েই স্টেটের সব ডিজাইন ভণ্ডুল করবো।

পরস্পর হাস্ত বিনিময় করে ম্যাককেনা বলল—মাহাতো এসে বসে আছে বোধ হয়। দেখি একবার।

অফিসের একটা নিভৃত কামরায় মাহাতোকে নিয়ে গিয়ে গিবসন বলল—এই যে দরখাস্ত তৈরী। সব কথা লেখা আছে এতে। সই করে ফেল; আজই দিল্লীর ডাকে পাঠিয়ে দি।

মাহাতোর পিঠ থাবড়ে ম্যাক্‌কেনা তাকে বিদায় দিল—ডরো মৎ মাহাতো, আমরা আছি। যদি ভিটে মাটি উৎখাত করে, তবে আমাদের ধাওড়া খোলা রয়েছে তোমাদের জন্য, সব সময়! ডরো মৎ।

নিজের দপ্তরে বসে মুখার্জী শুধু আকাশপাতাল ভাবে। কলম ধরতে আর মন চায় না। মহারাজাকে আশ্বাস দেবার মত সব কথা ফুরিয়ে গেছে তার। পরের রথের সারথ্য আর বোধ হয় চলবে না তার দ্বারা। এইবার রথীর হাতেই তুলে দিতে হবে লাগাম। কিন্তু মানুষগুলোর মাথার ঘিলু নিশ্চয় শুকিয়ে গেছে সব। সবাই নিজের নিজের মূঢ়তায়—একটা আত্মবিনাশের উৎকট কল্পনা-তাণ্ডবে মজে আছে যেন। কিংবা সেই ভুল করেছে কোথাও।

মহারাজার আহ্বান; খাস কামরায়।

সচিবোত্তম ও ফৌজদার শুষ্ক মুখে বসে আছেন। মহারাজা কৌচের চারদিকে পায়চারী করছেন ছটফট করে। মুখার্জী ঢুকতেই একেবারে অগ্নুদ্‌গার করলেন।

—নাও, এবার গদিতে থুথু ফেলে আমি চললাম। তুমিই বসো তার ওপর আর স্টেট চালিও।

হতভম্ব মুখার্জী সচিবোত্তমের দিকে তাকালো। সচিবোত্তম তার হাতে তুলে দিল এক চিঠি। পলিটিক্যাল এজেন্টের নোট।—স্টেটের ইন্টার্ণাল ব্যাপার সম্বন্ধে বহু অভিযোগ এসেছে। দিন দিন আরো নতুন ও গুরুতর অভিযোগ সব আসছে। আমার হস্তক্ষেপের পূর্ব্বে, আশা করি, দরবার শীঘ্রই সুব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হবে।

ফৌজদার একটু ভ্রূকুটি করেই বলল—এই সবের জন্য আপনার কনসিলিয়েশন পলিসিই দায়ী, এজেন্ট সাহেব।

ফৌজদারের অভিযোগের সূত্র ধরে মহারাজা চীৎকার করে উঠলেন—নিশ্চয়, খুব সত্য কথা। আমি সব জানি মুখার্জী। আমি অন্ধ নই।

—সব জানি? এ কি বলছেন সরকার?

—থাম, সব জানি। নইলে আমার রাজ্যের ধুলো মাটি বেচে যে বেনিয়ারা পেট চালায় তাদের এত সাহস হয় কোথা থেকে! কে তাদের ভেতর ভেতর সাহস দেয়?

মহারাজা যেন দমবন্ধ করে কৌচের ওপর এলিয়ে পড়লেন। একটা পেয়াদা ব্যস্তভাবে ব্যজন করে তাঁকে সুস্থ করতে লাগল। সচিবোত্তম ফৌজদার আর মুখার্জী ভিন্ন ভিন্ন দিকে মুখ ফিরিয়ে বোবা হয়ে বসে রইল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে মহারাজাই আবার কথা পাড়লেন।—ফৌজদার সাহেব, এবার আপনিই আমার ইজ্জৎ বাঁচান।

সচিবোত্তম বলল—তাই হোক্, কুর্ম্মিদের আপনি সায়েস্তা করুন ফৌজদার সাহেব, আর আমি সিণ্ডিকেটকে একটা সিভিল স্যুটে ফাঁসাচ্ছি। চেষ্টা করলে কণ্ট্রাক্টের মধ্যে এমন বহু ফাঁক পাওয়া যাবে।

মহারাজা মুখার্জীর দিকে চকিতে তাকিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। কিন্তু মুখার্জী এরি মধ্যে দেখে ফেলেছে, মহারাজার চোখ ভেজা ভেজা।

সিংহের চোখে জল। এর পেছনে কতখানি অন্তর্দাহ লুকিয়ে আছে, তা স্বভাবতঃ শশক হলেও মুখার্জী আন্দাজ করে নিল। সত্যিই তো, এ দিকটা তার এতদিন চোখে পড়েনি! তার ভুল হয়েছে। মহারাজার সামনে এগিয়ে গিয়ে সে শান্তভাবে তার শেষ কথাটা জানালো।—আমার ভুল হয়েছে সরকার। এবার আমায় ছুটি দিন। তবে আমায় যদি কখনো ডাকেন, আমি আসবই।

মহারাজা মুহূর্ত্তের মধ্যে একেবারে নরম হয়ে গেলেন—না, না মুখার্জী, কি যে বল! তুমি আবার যাবে কোথায়? অনেকে অনেক কিছু বলছে বটে, কিন্তু আমি তা বিশ্বাস করি না। তবে পলিসি বদলাতেই হবে; একটু কড়া হতে হবে। ব্যাঙের লাথি আর সহ্য হয় না মুখার্জী।

শীতের মরা মেঘের মত একটা রিক্ততা, একটা ক্লান্তি যেন মুখার্জীর হাতপায়ের

গাঁটগুলোকে শিথিল করে দিয়েছে। দপ্তরে যাওয়া ছেড়ে দিয়েছে সে! শুধু বিকেল হলে, ব্রিচেস চড়িয়ে বয়ের কাঁধে দু'ডজন ম্যালেট চাপিয়ে পোলো লনে উপস্থিত হয়। সমস্তটা সময় পুরো গ্যালপে ক্ষ্যাপা ঝড়ের মত খেলে যায়। ডাইনে বাঁয়ে বেপরোয়া আণ্ডার-নেক হিট্ চালায়। কড় কড় করে এক একটা ম্যালেট ভেঙে উড়ে যায় ফালি হয়ে। মুখের ফেনা আর গায়ের ঘামের স্রোতে ভিজে চুপ্‌সে যায় কালো ওয়েলারের পায়ের ফ্ল্যানেল। তবু স্কোরের নেশায় পাগল হয়ে মুখার্জী চার্জ্জ করে। বিপক্ষদল ভ্যাবাচাকা খেয়ে অতি মন্থর ট্রটে ঘুরে ঘুরে আত্মরক্ষা করে। চক্কর শেষ হবার পরেও সে বিশ্রাম করার নাম করে না। অকারণে পোলো লনের চারদিকে বিদ্যুদ্বেগে, ঘোড়া ছুটিয়ে বেড়ায়। রেকাবে ভর দিয়ে মাঝে মাঝে চোখ বুঁজে দাঁড়িয়ে থাকে—বুক ভরে যেন স্পীড পান করে।

খেলা শেষে মহারাজা অনুযোগ কবেন।—বড় রাফ্ খেলা খেলছ মুখার্জী।

সেদিনও সন্ধ্যার আগে নিয়মিত সূর্যাস্ত হল অঞ্জনগড়ের পাহাড়ের আড়ালে! মহারাজা সাজগোজ করে লনে যাবার উদ্যোগ করছেন। পেয়াদা একটা খবর নিয়ে এল।—চৌদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে, এখনো ধসছে। নব্বই জন পুরুষ আর মেয়ে কুলি চাপা পড়েছে।

—অতি সুসংবাদ! মহারাজা গালপাট্টায় হাত বুলিয়ে উৎকট আনন্দের বিস্ফোরণে চেঁচিয়ে উঠলেন। এইবার দুসমন মুঠোর মধ্যে, নির্দ্দয়ের মত পিষে ফেলতে হবে এইবার।—সচিবোত্তম কোথায়? শীগগির ডাক।

সচিবোত্তম এলেন, কিন্তু মরা কাতলা মাছের মত দৃষ্টি তাঁর চোখে। বললেন—দুঃসংবাদ।

—কিসের দুঃসংবাদ?

বিনা টিকিটে কুর্মিরা লকড়ি কাটছিল। জঙ্গলের রেঞ্জার বাধা দেয়। তাতে রেঞ্জার আর গার্ডদের কুর্মিরা মেরে তাড়িয়ে দিয়েছে।

—তারপর?—মহারাজার চোয়াল দুটো কড় কড় করে বেজে উঠল।

—তারপর ফৌজদার গিয়ে গুলি চালিয়েছে। ছর্‌রা ব্যবহার করলেই ভাল ছিল! তা না করে চালিয়েছে মুঙ্গেরী গাদা আর দেড় ছটাকী বুলেট। মরেছে বাইশজন আর ঘায়েল পঞ্চাশের ওপর। ঘোড়ানিমের জঙ্গলে সব লাস এখনো ছড়িয়ে পড়ে আছে।

মহারাজা বিমূঢ় হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তাঁর চোখের সামনে পলিটিকাল এজেন্টের হুঁসিয়ারী চিঠিটা যেন চকচকে সূচীমুখ বর্শার ফলার মত ভেসে বেড়াতে লাগল।

—খবরটা কি রাষ্ট্র হয়ে গেছে ?

—অন্ততঃ সিণ্ডিকেট তো জেনে ফেলেছে।—সচিবোত্তম উত্তর দিল।

মুখার্জীকে ডাকলেন মহারাজা।—এই তো ব্যাপার মুখার্জী। এইবার তোমার বাঙালী ইলম্ দেখাও ; একটা রাস্তা বাতলাও।

একটু ভেবে নিয়ে মুখার্জী বলল—আর দেরী করবেন না। সব ছেড়ে দিয়ে মাহাতোকে আগে আটকান।

জন পঞ্চাশ পেয়াদা সড়কী লাঠি লণ্ঠন নিয়ে অন্ধকারে দৌড়ল ছুলালের ঘরের দিকে।

মুখার্জী বলল—আমার শরীর ভাল নয় সরকার ; কেমন গা বমি বমি করছে। আমি যাই।

চোদ্দ নম্বরের পীট ধসেছে। মার্চ্চেণ্টরা দস্তরমত ঘাবড়ে গেল। তৃতীয় সীমের ছাদটা ভাল করে টিম্বার করা ছিল না, তাতেই এই দুর্ঘটনা। উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত পাথরের কুচি আর ধূলোর সঙ্গে রসাতল থেকে যেন একটা আর্ত্তনাদ থেমে থেমে বেরিয়ে আছছে—বুম্ বুম্ বুম্। কোয়ার্টসের পিলারগুলো চাপের চোটে তুবড়ির মত ধূলো হয়ে ফেটে পড়ছে। এরি মধ্যে কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে পীটের মুখটা ঘিরে দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য ধাওড়া থেকে দলে দলে কুলিরা দৌড়ে আসছিল। মাঝ পথেই দারোয়ানেরা তাদের ফিরিয়ে দিয়েছে।—কাজে যাও সব, কিছু হয় নি। কেউ ঘায়েল হয়নি, মরেও নি কেউ।

মার্চ্চেণ্টরা দল পাকিয়ে অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় আলোচনা করছে। গিবসন বলল—মাটি দিয়ে ভরাট করবার উপায় নেই, এখনো ছ'দিন ধরে ধসবে। হাজিরা বইটা পুড়িয়ে আজই নতুন একটা তৈরী করে রাখ।

ম্যাককেনা বলল—তাতে আর লাভ কি হবে ? দি মহারাজার কানে পৌছে গেছে সব। তা ছাড়া, হ্যাট মাহাতো ; তাকে বোঝাবে কি দিয়ে ? কালকের সকালেই সহরের কাগজগুলো খবর পেয়ে যাবে আর পাতা ভরে স্ক্যাণ্ডাল ছড়াবে দিনের পর দিন। তারপর আসবেন একটি এনকোয়ারী কমিটি ; একটা গান্ধিয়াইট বদমাসও বোধ হয় তার মধ্যে থাকবে। বোঝ ব্যাপার ?

সে রাতে ক্লাব ঘরে আর আলো জ্বললো না! একসঙ্গে একশো ইলেকট্রিক ঝাড়ের আলো জ্বলে উঠল প্যালেসের একটা প্রকোষ্ঠে। আবার ডাক পড়ল মুখার্জীর।

অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য! মহারাজা, সচিবোত্তম আর ফৌজদার—গিবসন, ম্যাককেনা, মূর আর প্যাটার্সন! সুদীর্ঘ মেহগনি টেবিলে গেলাস আর ডিকেণ্টারের ঠাসাঠাসি।

সস্মিতবদনে মহারাজা মুখার্জীকে অভ্যর্থনা করলেন।—মাহাতো ধরা পড়েছে মুখার্জী। ভাগ্যিস সময় থাকতে বুদ্ধিটা দিয়েছিলে।

গিবসন সায় দিয়ে বলল—নিশ্চয়, অনেক ক্লামজি ঝঞ্ঝাট থেকে বাঁচা গেল। আমাদের উভয়ের ভাগ্য ভাল বলতে হবে।

এ বৈঠকের সিদ্ধান্ত ও আশু কর্ত্তব্য কি নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে, ফৌজদার তাই মুখার্জীর কানে কানে সংক্ষেপে শুনিয়ে দিল। নিরুত্তর মুখার্জী শুধু হাতের চেটোয় মুখ গুঁজে বসে রইল।

গিবসন মুখার্জীর পিঠ ঠুকে একবার বলল—এসব কাজে একটু শক্ত হ'তে হয় মুখার্জী, নার্ভাস্ হবেন না।

রাত দুপুরে অন্ধকারের মধ্যে আবার চৌদ্দ নম্বর পীটের কাছে মোটর গাড়ী আর মানুষের একটা জনতা। ফৌজদারের গাড়ীর ভেতর থেকে দারোয়ানেরা কম্বলে মোড়া দুলাল মাহাতোর লাসটা টেনে নামালো। ঘোড়ানিমের জঙ্গল থেকে ট্রাক বোঝাই লাস এল আরো। ক্ষুধার্ত্ত পীটটার মুখে মৃতদেহগুলি তুলে নিয়ে দারোয়ানেরা ভূজ্যি চড়িয়ে দিলে একে একে।

শ্যাম্পেনের পাতলা নেশা আর চুরুটের ধোঁয়ায় ছলছল করছিল মুখার্জীর চোখ দুটো। গাড়ীর বাম্পারের ওপর এলিয়ে বসে চৌদ্দ নম্বর পীটের দিকে তাকিয়ে সে ভাবছিল অন্য কথা। অনেক দিন পরের একটা কথা।

লক্ষ বছর পরে এই পৃথিবীর কোন একটা যাদুঘরে জ্ঞানবৃদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিকের দল উগ্র কৌতূহলে স্থির দৃষ্টি মেলে দেখছে কতগুলি ফসিল! অর্দ্ধপশুগঠন, অপরিণত-মস্তিষ্ক ও আত্মহত্যাপ্রবণ তাদের সাবহিউম্যান শ্রেণীর পিতৃপুরুষের শিলীভূত অস্থি-কঙ্কাল। আর ছেনি হাতুড়ির গাঁইতা—কতগুলি লোহার ক্রুড কিম্ভূত অস্ত্রশস্ত্র; যারা আকস্মিক কোন ভূবিপর্য্যয়ে কোয়ার্টস্ আর গ্রানিটের স্তরে স্তরে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিল। তারা দেখছে, শুধু কতকগুলি সাদা সাদা ফসিল; তাতে আজকের এই এত লাল রক্তের কোন দাগ নেই!

সুন্দরম্

সমস্যাটা হলো সুকুমারের বিয়ে। কি এমন সমস্যা! শুধু একটি মনোমত পাত্রী ঠিক করে শুভলগ্নে শাস্ত্রীয় মতে উদ্বাহ কার্য সমাধা করে দেওয়া; মানুষের একটা জৈব সংস্কারকে সংসারে পত্তন করে দেওয়া। এই তো!

কিন্তু বাধা আছে—সুকুমারের ব্রহ্মচর্য্য। বার বছর বয়স থেকে নিরামিষ ফোঁটা তিলক করেছে সে! আজও পায়ে সেধে তাকে মুসুরির ডাল খাওয়ান যায় না। সাহিত্য কাব্য তার কাছে অস্পৃশ্য। পাঠ্যপুস্তক ছাড়া জীবনে সে পড়েছে শুধু ক'খানি যোগশাস্ত্রের দীপিকা। বাগানের পুকুরঘাটে নির্জ্জন দুপুর রাতে একাগ্র প্রাণায়ামে কতবার শিউরে উঠেছে তার সুষুম্না। প্রতি কুম্ভকে রেচকে সুকুমার অনুভব করেছে এক অদ্ভুত আত্মিক শক্তির তড়িৎ স্পর্শ—শ্বাসে প্রশ্বাসে রক্তে ও স্নায়ুতে।

সুকুমার চোখ বুঁজলেই দেখতে পায় তার অন্তরের নিভৃত কন্দরে সমাসীন এক বিবাগী পুরুষ। আবিষ্ট অবস্থায় কানে আসে, কে যেন বলছে—মুক্তি দে, মুক্তি দে। জপ ছেড়ে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পায়, কার এক গৈরিক উত্তরীয় ক্ষণিকের দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেল বাতাসে।

সুকুমার বন্ধুদের অনেকবার জানিয়েছে—বাস্, এই এগজামিনটা পর্য্যন্ত। তারপর আর নয়। হিমালয়ের ডাক এসে গেছে আমার।

সুকুমারের বাবা কৈলাস ডাক্তার বলতেন—প্রোটিনের অভাব। পেটে দুটো ভাল জিনিস পড়ুক, গায়ে মাংস লাগুক—এসব ব্যামো দু'দিনেই কেটে যাবে। কত পাকামি দেখলাম্!

কিন্তু মা, পিসিমা, ছোট বোন রানু আর ঝি—তাদের মন প্রবোধ মানে না।

সকলে মিলে চেপে ধরলো কৈলাস ডাক্তারকে—যত শীগগির পার পাত্রী ঠিক করে ফেল। আর দেরী নয়! ঝিয়ের কোঁদল তো লেগেই আছে—ছি ছি, সংসারে থেকেও ছেলের বনবাস। ছোটজাতের ছোটঘরেও এমন কসাইপনা করে না বাপু।

সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা হলো। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখবেন। ভগ্নীপতি কানাইবাবু সুকুমারের মতিগতির চার্জ্জ নিলেন। যেমন করে পারেন কানাইবাবু সুকুমারের মনকে সংসারমুখো করবেন।

পাশের খবর বেরিয়েছে। কানাইবাবু সুকুমারকে দিয়ে জোর করে দরখাস্তে সই

করালেন।—নাও সই কর। মুন্সেফী চাকরী, ঠাট্টা নয়! সংসারে থেকেও সাধনা হয়। ঐ যাকে বলে, পাঁকাল মাছের মত থাকবে। জনকরাজা যেমন ছিলেন।

বাড়ীর বিষন্ন আবহাওয়া ক্রমে উৎফুল্ল হয়ে আসছে। কৈলাসবাবু পাত্রী দেখে এসেছেন। এখন সমস্যা সুকুমারকে কোন মতে পাত্রী দেখাতে নিয়ে যাওয়া। কানাইবাবু সকলকে আশ্বস্ত করলেন—কিছু ভাববার নেই; সব হো যায় গা।

সংসারের ওপর সুকুমারের এই নির্লেপ, এখনও কেটে যায় নি ঠিকই! তবু একটু চাঞ্চল্য, আচারে, আচরণে রক্তমাংসের মানুষের মেজাজ একআধটুকু দেখা দিয়েছে যেন।

তবু একদিন পড়ার ঘরে কানাইবাবুর সঙ্গে সুকুমারের একটা বচসা শোনা গেল। বাড়ীর সবারই বুক দুরদুর করে উঠলো। ব্যাপার কি?

কানাইবাবুর কথার ফাঁদে পড়ে সুকুমারকে উপন্যাস পড়তে হয়েছে, জীবনে এই প্রথম। নাভিমূলে চন্দনের প্রলেপ দিয়ে, অগুরু পুড়িয়ে ঘরের বাতাস পবিত্র করে নিয়ে অতি সাবধানে পড়তে হয়েছে তাকে। বলবান ইন্দ্রিয়গ্রাম, কি হয় বলা তো যায় না।

কিন্তু উপন্যাস না নরক। যতসব নীচ রিপুসেবার বর্ণনা। সমস্ত রাত ঘুম হয় নি, এখনও গা ঘিন ঘিন করছে।

সুকুমার বললো—আপনাকে এবার ওয়ার্ণিং দিয়ে ছেড়ে দিলাম কানাইবাবু।

মানে অপমানে সম্পূর্ণ উদাসীন কানাইবাবু বললেন—আজ সন্ধ্যেয় সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাব তোমায়। যেতেই হবে ভাই, তোমার আজ্ঞা-চক্রের দিব্যি। তা ছাড়া ভাল ছবি—ধ্রুবের তপস্যা। মনটাও তোমার একটু পবিত্র হবে।

কানাইবাবুর এক্সপেরিমেণ্ট বোধ হয় সার্থক হয়ে উঠলো। সুকুমার কাব্য পড়ে, বার কয়েক আখড়ায় গিয়ে মাথুর শুনে এসেছে, ঘন ঘন সিনেমায় যায়। এদিকে অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট পত্রও চলে এসেছে।

কিন্তু অনাসক্তির ঘোর সম্পূর্ণ কাটেনি। আজকাল সুকুমারের অতীন্দ্রিয় আবেশ হয়। জ্যোৎস্না রাতে বাগানে একা বসে বসে নেবু ফুলের সুগন্ধে মনটা অকারণেই উড়ে চলে যায়—ধূলিধূসর সংসারের বন্ধন ছেড়ে যেন আকাশের নীলিমায় সাঁতার দিয়ে বেড়ায়। একটা বিষণ্ণ সুখকর বেদনা। কিসের অভাব! কাকে যেন চাই! কে সেই না-পাওয়া? দীর্ঘশ্বাস চাপতে গিয়ে লজ্জা পায় সুকুমার।

রাত ক'রে সিনেমা দেখে বাড়ী ফিরবার পথে কানাইবাবু সুকুমারকে জিজ্ঞাসা করলেন—নাচটা কেমন লাগলো?

সুকুমার সহসা উত্তর দিল না। একটু চুপ করে থেকে বললো—কানাইবাবু।

—কি ?

—মানুষের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।

—নিশ্চয়। কালই চল বারাসত। যাদব বোসের মেয়ে বনলতা। তোমার মেজদি যেতে লিখেছে, আর বাবা তো আগেই দেখে এসেছেন।

উকীলের মুহুরী যাদব বোস। বংশ ভাল আর মেয়ে বনলতা দেখতে ভালই। যাদব বোস অল্পপণে দয়ালু সৎপাত্র খুঁজছেন।

মেজদি একটি বছর পনের বয়সের মেয়েকে হাত ধরে সামনে টেনে নিয়ে এলেন। —ভাল করে দেখে নে সুকু। মনে যেন শেষে কোন খুঁত খুঁত না থাকে।

যাত্রাকালে রাজকুমারীর মত মেয়েটাকে যতদূর সম্ভব জবরজং করে সাজানো হয়েছে। বিরাট একটা ঝকঝকে বেনারসী সাড়ী আর পুরু সাটিনের জ্যাকেট। পাড়ার মেয়েদের কাছে ধারকরা চুড়ি, রুলি, বালা ও অনন্ত কনুই পর্যন্ত বোঝাই করা দুটি হাত। ঘামে চুপসে গেছে কপালের টিপ, পাউডারের মোটা খড়ির স্রোত গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়েছে গলার ওপর। মেয়েটি দম বন্ধ করে, চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যেন যজ্ঞের পশুর মত এসে দাঁড়ালো।

বনলতার শক্ত খোঁপাটা চট্ করে খুলে, চুলের গোছা দুহাতে তুলে ধরে মেজদি বললেন—দেখে নে সুকু। গাঁয়ের মেয়ে হলে হবে কি ? তেলচিটে ঘাড় নয়, যা তোমাদের কত কলেজের মেয়ের দেখেছি। রামোঃ।

মেজদি যেন ফিজিয়লজি পড়াচ্ছেন। বনলতার থুতনিটা ধরে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে দেখালেন। চোখ মেলে তাকাতে বললেন—ট্যারা কানা নয়। পায়চারী করালেন—খোঁড়া নয়। সুকুমারের মুখের সামনে বনলতার হাতটা টেনে নিয়ে আঙুলগুলি ঘেঁটে ঘেঁটে দেখালেন—দেখছিস তো, নিন্দে করার জো নাই !

দেখার পালা শেষ হ'লো। বাড়ী ফিরে কানাইবাবু জিজ্ঞাসা করলেন—কি হে যোগীবর, পছন্দ তো ?

সুকুমার চুপ করে রইল। মুখের চেহারা প্রসন্ন নয়। কানাইবাবু বুঝলেন, এক্ষেত্রে মৌনং অসম্মতি লক্ষণং।

—সিনেমায় বনানী দেবীর নাচ দেখে চোখ পাকিয়েছ ভায়া, এ সব মেয়ে কি পছন্দ হয় !—কানাইবাবু মনের বিরক্তি মনে চেপেই রাখলেন।

পিসিমা বললেন—ছেলের আপত্তি তো হবেই। হাঘরের মেয়ে এনে হবে কি ? মুহুরী টুহুরীর সঙ্গে কুটুম্বিতে চলবে না।

সুন্দরী মেয়ে চাই। এইটেই বড় বাধা দাঁড়িয়েছে এখন। কৈলাস ডাক্তার পাত্রী দেখছেন আর বিপদের কথা এই যে, তাঁর চোখে অসুন্দর তো কেউ নয়।

তাই কৈলাস ডাক্তার কাউকে সুন্দরী বলে সার্টিফিকেট দিলেই চলবে না। এ বিষয়ে তাঁর রুচি সম্বন্ধে সকলের যথেষ্ট সংশয় আছে। প্রথম ছেলে, জীবনসঙ্গিনী নিয়ে ঘর করতে হবে যাকে, তারই মতটা প্রথম গ্রাহ্য। তারপর আর সকলের।

কৈলাসবাবু নিজে কুরূপ। কুৎসা করা যাদের আনন্দ তারা আড়ালে বলে 'কালো জিভ' ডাক্তার। ভদ্রলোকের জিভটাও নাকি কালো। যৌবনে এ গঞ্জনা কৈলাস ডাক্তারকে মর্ম্মপীড়া দিয়েছে অনেক। আজ প্রৌঢ়ত্বের শেষ ধাপে এসে এ দৌর্ব্বল্য তাঁর আর নেই।

বাংলোর বারন্দায় সোফায় বসে নিবিষ্ট মনে কৈলাস ডাক্তার এই কথাই ভাবছিলেন। এই রূপতত্ত্ব তাঁর কাছে দুর্বোধ্য। আজ পঁচিশ বছর ধরে যে ঝানু সার্জ্জন ময়না ঘরে মানুষের বুক চিরে দেখে এসেছে, তাকে আর বোঝাতে হবে না—কা'কে সোনার দেহ বলে। মানুষের অন্তরঙ্গ রূপ—এর পরিচয় কৈলাস ডাক্তারের মত আর কে জানে! কিন্তু তাঁর এই ভিন্ জগতের সুন্দরম্, তাকে কদর দেবার মত দ্বিতীয় মানুষ কই? দুঃখ এইটুকু।

হঠাৎ শেকল-বাঁধা হাউণ্ডটার বিকট চিৎকার আর লাফঝাঁপ! ফটক ঠেলে হুড়মুড় করে ঢুকলো মানুষের ব্যঙ্গমূর্ত্তি কয়েকটি প্রাণী। যদু ডোম আর নিতাই সহিস দৌড়ে এল লাঠি নিয়ে।

যদু ও নিতাইয়ের গলাধাক্কা গ্রাহ্য না করে ফটকের ওপর জুৎ করে বসলো একটা ভিখারী পরিবার। নোংরা চটের পোঁটলা, ছেঁড়া মাদুর, উনুন, হাঁড়ি, ক্যানেস্তারা, পিঁপড়ে ও মাছি নিয়ে একটা কদর্য্য জগতের অংশ। সোরগোল শুনে বাড়ীর সবাই এল বেরিয়ে।

কৈলাসবাবু বললেন—কে রে এরা যদু? চাইছে কি?

—এ ব্যাটার নাম হাবু বোষ্টম, তাঁতীদের ছেলে। কুষ্ঠ হয়ে ভিক্ষে ধরেছে।

কুষ্ঠী হাবু তার পটিবাঁধা হাত দুটো তুলে বললো—কৃপা কর বাবা!

—এই বুড়িটা কে?

—এ মাগীর নাম হামিদা। জাতে ইরাণী বেদিয়া—বসন্তে কানা হবার পর দল ছাড়া হয়েছে। ও এখন হাবুরই বৌ।

হামিদা কোলের ভেতর থেকে নেকড়ায় জড়ানো ক'মাসের একটা ছেলেকে দু'হাতে তুলে ধরে নকল কান্নায় কঁকিয়ে কঁকিয়ে বললো—বাচ্চাকা জান হুজুর! এক পিয়ালী দুধ হুজুর! এক মুঠ্‌ঠি দানা হুজুর!

—আর এই ধিঙ্গি ছুঁড়িটা কে? পিসিমা প্রশ্ন করলেন।

—ওর নাম তুলসী। হাবু আর হামিদার মেয়ে।

—আপন মেয়ে ?

হ্যাঁ পিসিমা। যদু উত্তর দিল।

তুলসী একটা কলাই করা থালা হাতে বসে আছে চুপ করে। পরিধানে খাটো একটা নোংরা পর্দার কাপড়, বুকের ওপর থেকে গেরো দিয়ে ঝোলানো। আভরণের মধ্যে হাতে একটা কৌড়ির তাবিজ।

দেখবার মত চেহারা এই তুলসীর। বছর চৌদ্দ বয়স, তবু সর্বাঙ্গে একটা রূঢ় পরিপুষ্টি কোন ডাকিনীর টেরাকোট্টা মূর্তির মত কালি-মাড়া শরীর। মোটা থ্যাবড়া নাক। মাথার খুলিটা বেটপ টেরে বেঁকে গেছে। চোয়াল জুড়ে দস্তুর মতো একটা হিংসা ফুটে রয়েছে যেন। মুখের সমস্ত পেশী ভেঙেচুরে গেছে ছন্নছাড়া বিক্ষোভে। এ মুখের দিকে তাকিয়ে দাতাকর্ণও দান ভুলে যায়, গা শির শির করে। কিন্তু যদু বললো—তুলসীর ভিক্ষের রোজগারই নাকি এদের পেটভাতের একমাত্র নির্ভর।

হাবু ঠিক ভিক্ষে করতে আসেনি। মিউনিসিপ্যালিটি এদের বস্তি ভেঙে দিয়েছে। দেশী মদের একটা নতুন ভাটিখানা হবে সেখানে। সহরের এলাকায় এদের থাকবার আর হুকুম নাই।

হাবু কান্নাকাটি করলো—একটা সার্টিফিকেট দিন বাবা। মুচিপাড়ার ভাগাড়ের পেছনে থাকবো। দীননাথের দিব্যি, হাটবাজারে ঘেঁসবো না কখনো। তুলসীই ভিক্ষে খাটবে, ওর তো রোগ বালাই নেই।

পিসিমা বল্লেন—যেতে বল, যেতে বল। গা ঘিন ঘিন করে। কিছু দিয়ে বিদেয় করে দে রাণু।

রাণু বললো—আমার ছেঁড়া ফ্লানেলের ব্লাউজটা দিয়ে দিই, এই শীতে তবু ছেলেটা বাঁচবে।

—হ্যাঁ, দিয়ে দে। থাকে তো একটা ছেঁড়া শাড়ীও দিয়ে দে। বয়স হয়েছে মেয়েটার, লজ্জা রাখতে হবে তো।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—আচ্ছা যা তোরা। সার্টিফিকেট দেব, কিন্তু খবরদার হাটবাজারে আসিস না।

হাবু তার সংসারপত্র নিয়ে আশীর্ব্বাদ করে চলে যাবার পর তুলসীর কথাটাই আলোচনা হলো আর একবার। কৈলাসবাবু হেসে হেসে বললেন—দেখলে তো সুন্দরী তুলসীকে। ওরও বিয়ে হয়ে যাবে জানো ?

ঝি উত্তর দিল—বিয়ে হবে না কেন ? সবই হবে। তবে সেটা আর সত্যিই বিয়ে নয়।

কৈলাসবাবু আর একটি পাত্রী দেখে এসেছেন। নন্দ দত্তের বোন দেবপ্রিয়া। মেয়েটি ভালই, তবে সুকুমার একবার দেখে আসুক।

দেখান হলো দেবপ্রিয়াকে। মেদের প্রাচুর্য্যে বয়স ঠিক ঠাহর হয় না। চওড়া কপাল, ছোট চিবুক, গোল গোল চোখ। গায়ের রং মেটে কিন্তু সুমসৃণ। ভারি ভুরু দুটোতে যেন তিব্বতী উপত্যকার ধূর্ত্ত একটু ছায়া—প্রচ্ছন্ন এক মঙ্গোলিনীকে ইসারায় ধরিয়ে দিচ্ছে। ঠোঁটে হাসি লেগেই আছে। সে বোধ হয় জানে, তার এই অপ্রাকৃত পৃথুলতা লোক হাসাবার মতই। দেবপ্রিয়ার গলা মিষ্টি, গান গায় ভাল।

সুকুমার হাঁ না কিছুই বলে না। বলা তার স্বভাব নয়। বোঝা গেল এ মেয়ে তার পছন্দ নয়।

পিসিমাও বললেন—হবেই না তো পছন্দ। শুধু গলা দিয়েই তো আর সংসার করা যায় না।

তা ছাড়া নন্দরা বংশেও খাটো।

কৈলাস ডাক্তার দুশ্চিন্তায় পড়লেন। সমস্যা ক্রমেই ঘোরালো হচ্ছে। এ মোটেই সহজ সরল ব্যাপার নয়। নানা নতুন উপসর্গ দেখা দিচ্ছে একে একে। শুধু সুন্দরী হলেই চলবে না। বংশ, বিত্ত, শিক্ষা ও রুচি দেখতে হবে।

মাঝে পড়ে পুরুত ভটচাযি্য আরও খানিকটা ইন্ধন জুগিয়ে গেছেন। সমস্যাটা ক্রমেই তেতে উঠেছে। ভটচাযি্য বাড়ির সকলকে বুঝিয়ে গেছেন—নিতান্ত আধ্যাত্মিক এই বিয়ে জিনিষটা। কুলনারীর গুণ লক্ষণ মিলিয়ে পাত্রী নির্ব্বাচন করতে হবে—গৃহিনী সচিব সখি প্রিয়শিষ্যা, সবদিক যাচাই করে দেখতে হবে। সারা জীবনের ধর্ম্ম সাধনার অংশভাগিনী, এ ঠাট্টার ব্যাপার নয়। ধরে বেঁধে একটা নিয়ে এলেই হলো না। ওসব যাবনিক অনাচার চলবে না।

হাঁ তবে সুন্দরী হওয়া চাই-ই। কারণ সৌন্দর্য্য একটা দেবদুর্লভ গুণ।

এবার যতদূর সম্ভব সাবধানে, খুব ভেবে চিন্তে কৈলাস ডাক্তার এক পাত্রী দেখে এলেন। অনাদি সরকারের মেয়ে অনুপমা, সুশিক্ষিতা ও সুন্দরী।

অনুপমার বয়স একটু বেশী। রোগা বা অতিতন্বী দুইই বলা যায়। মুখশ্রী আছে কিনা না আছে তা বিতর্কের বিষয়। তবে চালচলনে সুরুচির আবেদন আছে নিশ্চয়। রূপে যেটুকু ঘাটতি তা পুষিয়ে গেছে সুশিক্ষার হ্লাদিনী গুণে।

প্রতিবাদ করল রাণু।—না, ম্যাচ হবে না। যা ঝিরকুট চেহারা মেয়ের।

ঋষি বালকের মত কাঁচা মন সুকুমারের। হাঁ না বলা তার ধাতে সম্ভব নয়। কিম্বা অতিরিক্ত লজ্জা, তাও হতে পারে। তবে তার আচরণেই বোঝা গেল, এ বিয়েতে সে রাজী নয়।

পিসিমা বললেন—ভালই হলো। জানি তো, যা কিপটে এই অনাদি চাখা। বিনা খরচে কাজ সারতে চায়। পাত্র যেন পথে গড়াচ্ছে।

দৈবজ্ঞী মশায় এসে পিসিমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন—পাত্রীর রাশি আর গণ, খুব ভাল করে মিলিয়ে দেখবেন পিসিমা। ওসব কোন তুচ্ছ করার জিনিষ নয়।

—সবই গ্রহের কৃপা। দৈবজ্ঞী সুকুমারের কোষ্ঠী বিচার করে বাড়ীর সকলকে বড় রকম একটা প্রেরণা দিয়ে চলে গেল।—যা দেখছি তা তো বড়ই ভাল মনে হচ্ছে। পতাকারিষ্টি আর নেই, এবার কেতুর দশা চলছে। এই বছরের মধ্যে ইষ্টলাভ—সুন্দরী বামা, রাজপদং ধনসুখং ইত্যাদি ইত্যাদি।

—এই ছুঁড়ি ওখানে কি করছিস? কৈলাসবাবু ধমকে উঠলেন। সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনের বারান্দায় ফুলগাছের টবের পাশে বসে আছে তুলসী। হাতে কলাইকরা থালাটা।

যদু কোত্থেকে এসে সঙ্গে সঙ্গে হুমকি দিল।—ওঠ্ এখান থেকে হারামজাদি! কেমন ঘুপটি মেরে বসে আছে চুরির ফিকিরে।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাক্, গালমন্দ করিসনে। খিড়কির দোরে গিয়ে বসতে বল্।

সামনে কানাইবাবুকে পেয়ে বললেন—কি কানাই? এবার আমাকে বিড়ম্বনা থেকে একটু রেহাই দেবে কি না? সুন্দরী পাত্রী জুটলো তোমাদের?

—আজ্ঞে না। চেষ্টার তো ত্রুটি করছি না।

—চেষ্টা করেও কিছু হবে না। তোমাদের সুন্দরের তো মাথামুণ্ডু কিছুই নেই।

—কি রকম?

—কি রকম আবার? চুল কালো হলে সুন্দর আর চামড়া কালো হলে কুৎসিত। এই কথাটা কি মহাব্যোমে লেখা আছে, শাশ্বত কালি দিয়ে?

একটু চুপ করে থেকে কৈলাস ডাক্তার বললেন—পদ্মপত্র যুগ্ম নেত্র পরশয়ে শ্রুতি। ধন্যি বাবা কাশীরাম। একবার ভাব তো কানাই, কোন ভদ্রলোকের যদি নাক থেকে কাণ পর্য্যন্ত ইয়া ইয়া দুটো চোখ ছড়িয়ে থাকে, কী চিজ হবে সেটা!

কানাইবাবু বললেন—যা বলেছেন। কত যে বাজে সংস্কারের সাতপাঁচ রয়েছে লোকের। তবে মানুষের রূপের একটা ষ্ট্যাণ্ডার্ড অবশ্য আছে, অ্যানথ্রপলজিষ্টরা যেমন বলেন…।

—অ্যানথ্রপলজিষ্ট না চামড়াওয়ালা? কৈলাসবাবু চড়া মেজাজে বললেন।—আসুক একবার আমার সঙ্গে ময়না ঘরে। দুটো লাসের ছাল ছাড়িয়ে দিচ্ছি। চিনে

বলুক দেখি, কে ওদের আলপাইন, নেগ্রিটো আর প্রোটো-অস্ট্রেলয়েড। দেখি ওদের বংশবিদ্বের মুরোদ! মেলা বকো না আমার কাছে।

কানাইবাবু সরে পড়ার পথ দেখলেন।

—জান কানাই, আমাকে আড়ালে সবাই কালোজিভ বলে ডাকে। বর্ব্বর আর গাছে ফলে? একটা বাজে টাবু ছাড়বার শক্তি নেই, সভ্যতার গর্ব্ব করে? আধুনিক হয়েছে? যত সব ফাজিলের দল!

কৈলাস ডাক্তার ক্ষুব্ধ লাল চোখ দুটিকে শান্ত করে চুরুট ধরালেন।

সত্যদাসের বাড়ী থেকে ভাল একটি পাত্রী দেখে খুসী মনে কৈলাস ডাক্তার ফিরলেন। ফটকে পা দিয়েই দেখেন, সুকুমারের পড়ার ঘরের সামনে বসে যদু আর নিতাই তুলসীর সঙ্গে মস্করা করছে।

—এই রাস্কেল সব! কি হচ্ছে ওখানে?

তুলসী ওর থালা হাতে দৌড়ে পালিয়ে গেল। যদু নিতাই আমতা আমতা করে কিছু একটা গুছিয়ে বল্‌তে বৃথা চেষ্টা করে চুপচাপ রইল। কৈলাসবাবু সুকুমারকে ডেকে বললেন—ঘরের দোর খোলা রাখ কেন? সেই ভিখিরি ছুঁড়িটা কদিন থেকে ঘুর ঘুর করছে এদিকে। খুব নজর রাখবে, কখন কি চুরি করে সরে পড়ে বলা যায় না।

সুকুমারের মাকে ডেকে কৈলাস জানালেন—সত্যদাসের মেয়ে মমতাকে দেখে এলাম। একরকম পাকা কথাই দিয়ে এসেছি। এবার সুকুমার আর তোমরা একবার দেখে এস। আমাকে আর নাকে দড়ি দিয়ে ঘুরিও না।

যথারীতি মমতাকে দেখে আসা হলো। মমতার রূপে অসাধারণত্ব আছে সন্দেহ নাই। ঘুটঘুটে অমাবস্যার মত ঘনকৃষ্ণ গায়ের রং। সমস্ত অবয়বে সুপেশল কাঠিন্য মণিবন্ধ ও কনুইয়ের মজবুত অস্থিসজ্জা আর হাতপায়ের রোমঘন পারুশ্য পুরুষকেও লজ্জা দেয়। চওড়া করোটির ওপর অতিকুঞ্চিত স্থূলতন্তু চুলের ভার, নীলগিরির চূড়ার ওপর স্নিগ্ধ মেঘস্তবকের মত। এক দৃপ্তা দ্রাবিড়া নায়িকার মূর্ত্তি। মমতার প্রখর দৃষ্টির সামনে সুকুমারই সঙ্কুচিত হলো। বরমালা-কাঙাল অবলার দৃষ্টি এ নয়; বরং এক অকুতোলজ্জা স্বয়ংবরার জিজ্ঞাসাই যেন জ্বল্‌জ্বল্ করছে।

সত্যবাবু মেয়ের গুণপনার পরিচয় দিলেন।—বড় পরিশ্রমী মেয়ে, কারণ স্বাস্থ্য খুব ভাল। ছাত্রীজীবনে প্রতি বছর স্পোর্টসে প্রাইজ পেয়ে এসেছে।

মেয়ে দেখে এসে সুকুমার মুখভার করে শুয়ে রইল। রাণু বললো—এ নিশ্চয়ই রাক্ষসগণ পিসিমা।

পিসিমা একটু বিমর্ষ হয়ে বললেন—হাঁ, সেই তো কথা। বড় হট্টা কট্টা চেহারা। নইলে ভাল বরপণ দিচ্ছিল, দানসামগ্রীও।

তবু কৈলাসডাক্তার তোড়জোড় করছেন। মমতার সঙ্গেই বিয়ের এক রকম ঠিক। এবার শক্ত হয়েছেন তিনি। দশজনের দশ কথার চক্রে আর ভূত সাজতে পারবেন না।

কিন্তু যা কখনও হয় নি তাই হলো। সুকুমারের প্রকাশ্য বিদ্রোহ। সুকুমার এবার মুখ খুলেছে। বাণুকে ডেকে নিয়ে জানিয়ে দিয়েছে—সত্য দাসের সঙ্গে বড গলাগলি দেখছি বাবার। ওখানে যদি বিয়ে ঠিক হয়, তবে একটু আগে ভাগে আমায় জানাবি। আমি যুদ্ধে সার্ভিস নিচ্ছি।

কথাটা শুনে পিসিমার গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো। সুকুমারের মা রান্না ছেড়ে বৈঠকখানায় গিয়ে কৈলাসবাবুব সঙ্গে একপ্রস্থ বাক্যুদ্ধ সেরে এলেন। কিন্তু ফল হলো না কিছুই। কৈলাসবাবু এবার অটল।

সুকুমারের মা কেঁদে ফেললেন—ঐ হদকুচ্ছিত মেয়ের সঙ্গে বিয়ে! তোমার ছেলে ঐ মেয়েব ছায়া মাডাবে ভেবেছ? এমন বিয়ে না দিয়ে ছেলের হাতে চিম্‌টে দিয়ে বিদেয় করে দাও না।

কৈলাসবাবুব অটলতার ব্যতিক্রম হলো না কিছুই। তিনি শুধু একটা দিন স্থির করার চেষ্টায় রইলেন।

সুকুমার মারমূর্ত্তি হয়ে রাণুকে বললো—সেই দৈবজ্ঞটা এবার এলে আমায় খবর দিবি তো।

—কোন দৈবজ্ঞ?

—ঐ যে-বেটা সুন্দরী রামাটামা বলে গিয়েছিল। জিভ উপড়ে ফেলবো ওর।

আড়ালে দাঁড়িয়ে কৈলাস ডাক্তার শুনলেন এ বাক্যালাপ। রাগে ব্রহ্মতালু জলে উঠলো তাঁর। সুকুমারের মাকে ডেকে প্রশ্ন করলেন—কি পেয়েছ?

শঙ্কিত চোখে কৈলাসবাবুর দিকে তাকিয়ে সুকুমারের মা বললেন—কি হয়েছে?

—ছেলের বিয়ে দিতে চাও?

—কেন দেব না?

—সৎপাত্রী চাও, না সুন্দরী পাত্রী চাও?

—সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললেন—সুন্দরী পাত্রী।

—বেশ, তবে লিখে দাও আমাকে সুন্দরী কাকে বলে। তন্বী শ্যামা পক্ক বিম্বাধর—আরও যা আছে লিখে দাও। আমি সেই ফর্দ্দ মিলিয়ে পাত্রী দেখবো।

এই বিদঘুটে প্রস্তাবে সুকুমাবেব মার মেজাজও ধৈর্য্য হারাবার উপক্রম করলো।

তবু মনের ঝাঁঝ চেপে নিয়ে বললেন—তার চেয়ে ভাল, তোমায় পাত্রী দেখতে হবে না। আমরা দেখছি।

—ধন্যবাদ। খুব ভাল কথা। এবার আমি দায়মুক্ত ?

—হাঁ।

কৈলাস ডাক্তার এখন অনেকটা সুস্থির হয়েছেন। হাসপাতালে যান আর আসেন। রুগী নিয়ে, ময়না ঘরের লাস নিয়ে দিন কেটে যায়। যেমন আগে কাটতো।

বাগানের দিকে একটা হট্টগোল। কৈলাস ডাক্তার এগিয়ে গিয়ে দেখেন, যদু ডোম আর নিতাই মিলে তুলসীকে ঘাড় ধরে হিড় হিড় করে টেনে বাগানের ফটক দিয়ে বার করে দিচ্ছে।

—কি ব্যাপাব নিতাই ?

—বড় পাজি এ ছুঁড়িটা হুজুব। পয়সা দেয়নি বলে দাদাবাবুর ঘরে ঢিল ছুঁড়ছিলো। আর, এই দেখুন আমার হাত কামড়ে দিয়েছে।

কৈলাস ডাক্তাব বললেন—বড বাড বেড়েছে ছুঁড়িব। ভিখারীর জাত দয়া করলেই কুকুরের মত মাথায় চড়ে। কেবলই দেখছি মাস তিন চার থেকে শুধু এদিকেই নজর। এবার এলে পুলিশে ধরিয়ে দিবি।

তুলসী ফটকের বাইরে গিয়েও মস্তা বাতুলীব মত আরও কটা ইট-পাটকেল ছুঁড়ে চলে গেল। কৈলাস ডাক্তাব বললেন—সব সময় ফটকে তালা বন্ধ করে রাখবে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলা। অনেক রাতে রুগী দেখে বাড়ী ফিরতেই কৈলাস ডাক্তার দেখলেন, ফটক খুলে অন্ধকারে চোরের মত পা টিপে টিপে সরে পড়ছে তুলসী। কৈলাসবাবুকে দেখে আবও জোরে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হাঁক দিতেই যদু ও নিতাই হাজির হলো লাঠি হাতে।

অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—এ কি ফটক খোলা, বারান্দায় আলো জ্বলছে, সুকুমারের ঘরে আলো, আমার বৈঠকখানা খোলা, তোমরা সব জেগেও রয়েছ, অথচ ছুঁড়িটা বেমালুম চুরি করে সরে পড়লো!

কৈলাস ডাক্তাব সমস্ত ঘর তন্ন তন্ন করে দেখলেন।—আমার ঘরটা সব তছনছ করেছে কে ? টেবিল থেকে নতুন বেলেডনার শিশিটাই বা গেল কোথায় ?

অনেকক্ষণ বকাবকি করে শান্ত হলেন কৈলাস ডাক্তার। কিছু চুরি হয়নি বলেই মনে হলো।

দিনটা আজ ভাল নয়। সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত আকাশে দুর্যোগ ঘনিয়ে আছে। কানাইবাবু এসে কৈলাস ডাক্তারকে জানালেন—সুন্দরী পাত্রী পাওয়া

গেছে। জগৎ ঘোষের মেয়ে। সুকুমারের এবং আর সবারও পছন্দ হয়েছে! বংশে, শিক্ষায় ও গুণে কোন ত্রুটি নেই।

কৈলাস ডাক্তার বললেন—বুঝলাম, তোমরা কল্পতরু সন্ধান পেয়েছ, সুখবর।

—আপনাকে আজ রাত্রে আশীর্ব্বাদ করতে যেতে হবে।

—তা, যাব।

যদু ডোম এসে তখুনি খবর দিল, তিনটে লাস এসেছে ময়না তদন্তের জন্য। কৈলাস ডাক্তার বললেন—চল্ রে যদু। এখনি সেরে রাখি। রাত্রে আমার নানা কাজ রয়েছে!

ময়না ঘরে এসে কৈলাস ডাক্তার বললেন—বড় মেঘলা করেছে রে। পেট্রোমাক্স বাতি দুটো জ্বাল।

যন্ত্রপাতিগুলো গামলায় সাজিয়ে আস্তিন গুটিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার বললেন—রাত হবে নাকি রে যদু?

—আজ্ঞে না। দুটো আগুনে পোড়া লাস, পচা পাঁক হয়ে গেছে। ও তো জানা কেস, আমিই চিরে ফেড়ে দেব। বাকী একটা শুধু…।

—নে কোনটা দিবি দে। কৈলাস ডাক্তার করাত হাতে টেবিলের পাশে দাঁড়ালেন।

লাসের ঢাকাটা খুলে ফেলতেই কৈলাস ডাক্তার চমকে বললেন—অ্যাঁ, এ কে রে যদু?

যদু ততক্ষণে আলগোছে সরে পড়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কৈলাস ডাক্তারের প্রশ্নে ফিরে এসে বললো—হাঁ হুজুর তুলসীই, সেই ভিখিরি মেয়েটা।

কৈলাস ডাক্তার বোকার মতো যদুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। যদু সেই অবসরে তুলসীর পরিহিত নোংরা সাড়ীটা গায়ের ছেঁড়া কোটটা খুলে মেঝের ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিল। আবার বাইরে যাবার উদ্যোগ করতেই কৈলাস ডাক্তার বললেন—যাচ্ছিস্ কোথায়? স্পিরিট দিয়ে লাসটা মোছ ভাল করে। ইউকালিপটাসের তেলের বোতলটা দে। কিছু কর্পূর পুড়তে দে, আর একটা বাতি জ্বাল।

—One more unfortunate!

কথাটার মধ্যে যেন একটু বেদনার আভাস ছিল। তুলসীর লাসে হাত দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

করাতের দু'পোঁচে খুলিটা দুভাগ করা হলো। কৈলাস ডাক্তারের হাতের ছুরি ফোঁস ফোঁস করে সনিশ্বাসে নেচে কেটে চললো লাসের ওপর। গলাটা চিরে দেওয়া হলো

লম্বালম্বি ভাবে। বুকের মাঝখানে ও দুপাশে বড় বড় পোঁচ দিয়ে ধড়টা খুলে ফেলা হলো। সাঁড়াশী দিয়ে পট্ পট্ করে পাঁজরগুলো উল্টে দিলেন কৈলাস ডাক্তার।

যেন ঘুমে ঢলে রয়েছে তুলসীর চোখের পাতা। চিমটে দিয়ে ফাঁক করে কৈলাস ডাক্তার দেখলেন—নিশ্চল দুটি কণীনিকা যেন নিদারুণ অভিমানে নিষ্প্রভ হয়ে আছে। শুকিয়ে কুঁচিয়ে গেছে চোখের শ্বেত পটল। সুজলা অশ্রুশীলা নাড়ীগুলো অতিস্রাবে বিবর।

—ইস, মরার সময় মেয়েটা কেঁদেছে খুব। কৈলাস ডাক্তার বললেন।

যদু বললো—হাঁ হুজুর কাঁদবেই তো। সুইসাইড কিনা। করে ফেলে তো ঝোঁকের মাথায়। তারপর খাবি খায়, কাঁদে আর মরে।

—গলা টিপে মারে নি তো কেউ? কৈলাস ডাক্তার খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করলেন। কৈ কোন আঘাতের চিহ্ন তো নেই। গুচ্ছ গুচ্ছ অম্লান স্বররজ্জু, শ্বাসবহা নালিটাও তেমনি প্রফুল্ল। অজস্র লালায় পিচ্ছিল সুপুষ্ট গ্রসনিকা!

—এত লালা! মরার আগে মেয়েটা খেয়েছে খুব পেট ভরে।

—হাঁ হুজুর, ভিখিরি তো খেয়েই মরে।

দেহতত্ত্বের পাকা জহুরী কৈলাস ডাক্তার। তাঁকে অবাক করেছে আজ কুৎসিতা এই তুলসী। কত রূপসী কুলবধূ, কত রূপাজীবা নটীর লাস পার হয়েছে তাঁর হাত দিয়ে। তিনি দেখেছেন তাদের অন্তরঙ্গ রূপ—ফিকে ফ্যাকাশে ঘেয়ো। তুলসী হার মানিয়েছে সকলকে। অদ্ভুত।

বাতিটা কাছে এগিয়ে নিয়ে কৈলাস ডাক্তার তাকিয়ে রইলেন—প্রবাল পুষ্পের মালঞ্চের মত বরাঙ্গের এই প্রকট রূপ, অছদ্ম মানুষের রূপ। এই নবনীতপিণ্ড মস্তিষ্ক, জোড়া শতদলের মত উৎফুল্ল হৃৎকোষের অলিন্দ আর নিলয়। রেশমী ঝালরের মত শত শত মোলায়েম ঝিল্লী। আনাচে কানাচে যেন রহস্যে ডুব দিয়ে আছে সূক্ষ্ম কৈশিক জাল।

কৈলাস ডাক্তার বিমুগ্ধ হয়েই দেখলেন—থরে বিথরে সাজানো সারি সারি যত রক্তিম পর্শুকা। বরফের কুচির মত অল্প অল্প মেদের ছিটে। মজ্জাস্থি ঘিরে নেমে গেছে প্রাণদা নীলার প্রবাহিকা।

কৈলাস ডাক্তার বাতিটাকে আরও কাছে এগিয়ে নিলেন—খণ্ডস্ফটিকের মত পীতাভ ছোট বড় কত গ্রন্থির বীথিকা। প্রশান্ত মুকুট ধমনী। সন্ধিতে সন্ধিতে সুপ্রচুর লসিকার বুদ্বুদ। গ্রন্থিক্ষীরে নিষিক্ত অতি অভিরাম এই অংসপেশীর স্তবক আর তরুণাস্থির সজ্জা। ঝাঁপি খোলা রত্নমালার মত আলোয় ঝলমল করে উঠলো।

আবিষ্ট হয়ে গেছেন কৈলাস ডাক্তার। কুৎসিতা তুলসীর ঐ রূপের পরিচয় কে রাখে! তবুও, এ তিমিরদৃষ্টি হয়তো ঘুচে যাবে একদিন। আগামী কালের কোন প্রেমিক বুঝবে এ রূপের মর্য্যাদা। নতুন তাজমহল হয়তো গড়ে উঠবে সেদিন! যাক…।

কৈলাস ডাক্তার আবার হাতের কাজে মন দিলেন। যদু বললো—এ সবে কোন জখম নেই হুজুর। পেটটা দেখুন।

ছুরির ফলার এক আঘাতে দু'ভাগ করা হল পাকস্থলী। এইবার কৈলাস ডাক্তার দেখলেন কোথায় মৃত্যুর কামড়। শ্লেমরসে মাখা একটি অজীর্ণ পিণ্ড। সন্দেশ পাউরুটি—বেলেডোনা।

—মার্ডার!

হাতের ছুরি খসে পড়ল মেঝের ওপর। সে শব্দে দু'পা পিছিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন কৈলাস ডাক্তার।

উত্তেজনায় বুড়ো কৈলাস ডাক্তারের ঘাড়ের রগ ফুলে উঠলো দপ দপ করে। পোখরাজের দানার মত বড় বড় ঘামের ফোঁটা কপাল থেকে ঝরে পড়লো মেঝের ওপর।

হঠাৎ ছটফট করে টেবিলের কাছে আবার এগিয়ে এলেন কৈলাস ডাক্তার। ছোঁ মেরে কাঁচিটা তুলে নিয়ে তুলসীর তলপেটের দুটো বন্ধনী ছেদ করলেন। নিকেলের চিমটের সুচিক্কন বাহুপুটে চেপে নিয়ে, স্নেহাক্ত আগ্রহে ধীরে ধীরে টেনে তুলে ধরলেন—পরিশঙ্কে ঢাকা সুডোল সুকোমল একটি পেটিকা। মাতৃত্বের রসে উর্ব্বর মানব জাতির মাংসল ধরিত্রী। সর্পিল নাড়ীর আলিঙ্গনে ক্লিষ্ট কুঞ্চিত, বিষিয়ে নীল হয়ে আছে শিশু এসিয়া।

আবেগে কৈলাস ডাক্তারের ঠোঁটটা কাঁপছিল থর থর করে। যদু এসে ডাকলো—হুজুর।

ডেকে সাড়া না পেয়ে যদু বাইরে গিয়ে নিতাই সহিসের পাশে বসলো।

নিতাই বললো—এত দেরী কেন রে যদু?

—শালা বুড়ো নাতির মুখ দেখছে।

গোত্রান্তর

মকতপুর। কাঁচা সড়কের ওপর এই তো একটা জরাজীর্ণ বাড়ী! খোলার চালের পুরানো বাঁশের ঠাট থেকে ঘুণের ধুলো ঝ'রে পড়ে। তিন বছর পালেস্তারা পড়েনি। ঘরে একপাল মানুষ—বাচ্চা কাচ্চা, ছেড়া কাঁথা আর নোংরা লেপ তোষকের জঞ্জাল। এই তো সঞ্জয়ের স্থইট হোম!

একা বড়দার গোনাগুনতি মাসোহারার জোরে ভাতকাপড়ের ক্ষুধা আর বাগিয়ে রাখা যায় না। সবদিকে ব্যয়বাহুল্য নির্ম্মম ভাবে ছেঁটে ফেলা হয়েছে। এখন কোপ পড়ছে পেটের ওপর। ঘি চিনি চা—সংসারের বুভুক্ষু জিভটার এক একটা অংশ বড়দা প্রতিমাসে ছুরির পোঁচ দিয়ে কাটছেন। এ ছাড়া উপায় নেই। কে জানতো, সঞ্জয় এত লেখা পড়া শিখেও রোজগারের বেলায় এমন ঠুঁটো হয়ে বসে থাকবে এক আধ দিন নয়, আজ চার বছর ধরে।

বিকেল বেলার হালকা ঝড়ে বাড়ীর স্থমুখে শিরিষ গাছে শুকনো সুঁটিগুলো ঝুম ঝুম করে বাজে, মোটা ঘুঙুরের বোলের মত। এই সময়টা বেশ লাগে। সারাদিনের সঞ্চিত আলস্য অবসাদে মিষ্টি হয়ে ওঠে।

বারান্দায় বসে এক গেলাস গুড়ের তৈরী চা হাতে নিয়ে সঞ্জয় চুমুকে চুমুকে তার নিত্যদিনের ভাবনাগুলির আস্বাদ ঝালিয়ে নিচ্ছল।

—যে যার পথ দেখ। বড়দা সময়ে অসময়ে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছেন। কিন্তু বছর চারেক আগেকার কথা। পরীক্ষার দিন এই বড়দা নিজের হাতে টিফিন কেরিয়ারে খাবার নিয়ে কলেজ হলের গেটে দাঁড়িয়ে থাকতেন। সেও একদিন গেছে। বড়দার মনের সুপ্ত সাধ আকাঙ্ক্ষাগুলি সেদিন ছিল দুঃখ অভাবের কালিতে মাখা—বিনম্র কামনার মালার মত। এই অভাবের গ্লানি একদিন ধুয়ে মুছে যাবে। সঞ্জয়ের একটা চাকরী হবে—রূপোর কাঠির স্পর্শে মকতপুরের দত্ত-বাড়ী স্বাচ্ছন্দ্যে ঝকঝক করে উঠবে। এই ছিল অবধারিত সত্য।

এম-এ ডিগ্রী, সচ্চরিত্রতা, স্বাস্থ্য আর খেলাধূলার দশটা সার্টিফিকেট, বিলিতি পত্রিকায় ছাপা তার নিজের লেখা তিনটে অর্থনীতির প্রবন্ধ, গান আর অভিনয়ের মেডেল, ভূমিকম্পে সুকঠোর সেবাব্রতের প্রশংসাপত্র—সঞ্জয়ের বহু ও বিচিত্র প্রতিভা একটা মোটা বাণ্ডিলে বাঁধা হয়ে বাক্সে পড়ে আছে। চার বছর দরখাস্তবাজি করে

একটা চাকরী জোটে নি। বড়দা হতাশ হয়ে পড়েছেন। মায়ের মুখেও গঞ্জনাবাক্য উথলে ওঠে।

অপ্রতিভ হয়ে গেছে সঞ্জয়। কিন্তু এই ধিক্কৃত চারটি বছরের প্রতি মুহূর্ত্তের ভাবনায় তার অনেক মোহ ভেঙে দিয়েছে। আগে এমনি অবস্থায় পড়লে লোকে বিবাগী হয়ে যেত। কিন্তু সঞ্জয় মনে করে, সে অন্য ধাতুতে তৈরী। কারণ, বিংশ শতাব্দীর বিপ্লবী ধনবিজ্ঞানের সমস্ত সূত্রগুলি সে মুখস্থ করে ফেলেছে।

সঞ্জয় বুঝেছে, এখানে প্রত্যেকটি স্নেহ পণ্য মাত্র। প্রত্যেকটি আশীর্ব্বাদ এক একটি পাওনার নোটিশ। চার বছর বয়স—এই ভাই-ঝি পুতুল, মাথা ধরলে চুলে হাত বুলিয়ে দেয় ঠিকই। কিন্তু সঞ্জয় জানে, একরত্তি মেয়ের এই স্বচ্ছতার মধ্যে লূতাতন্তুর মত কী সূক্ষ্ম কারবারী বুদ্ধি লুকিয়ে আছে। কাজ শেষ হলেই সোজা দাবী জানাবে—সিল্কের ফিতে চাই আমার।

ওপর থেকে দেখতে কী সুন্দর! মা বাপ ভাই বোন, আপন জন, আত্মীয়তার নীড়। কত গালভরা প্রবচন! একটু আঁচড় দিলেই চামড়া ভেদ করে দেখা দেয় নির্লজ্জ মহাজনের মাংস। সঞ্জয় এক এক সময় হেসে ফেলে। তবে এ তত্ত্ব নতুন কিছু নয়। ইতিহাসের শিরায় শিরায় এই রীতি গড়িয়ে আসছে বহু হাজার বছর ধরে। সেই গুহা-মানবের গৃহধর্ম্ম থেকে সুরু করে মকতপুরের দত্তবাড়ীর সংসারকলা। প্রেম প্রণয় আত্মীয়তা—লঙ্কা গুড় আদা মরিচ। যে ক্রেতা সেই আপন জন!

সুমিত্রাও অনেকদিন এদিকে আর আসে না। প্রেমের হাওয়া হয়তো ঘুরে গেছে। আশ্চর্য্য কিছু নয়। সুমিত্রার বাবা অভয়বাবুরও মতিগতি কিছুদিন থেকে উল্টো রকমের দেখাচ্ছে। বাড়ী মর্টগেজ দিয়েছেন। কেন? সুমিত্রারও কি পাত্র জুটে গেল?

গেল বিজয়া দশমীর দিনও সে প্রণাম করতে এসেছিল। চাঁপা রঙের সাড়ীতে অমন কালো মেয়েটাকেও দেখাচ্ছিল কত সুন্দর!

…চন্দনের টিপপরা সুমিত্রার কপালটা অলস হয়ে পড়ে রয়েছে দুমিনিট ধরে, সঞ্জয়ের পায়ের ওপর। বয়স্থা কুমারী মেয়ের যৌবন অভিমানে যেন মাথা খুঁড়ছে। সুমিত্রা ভালবেসে ফেলেছে।

পুরানো দিনের এসব কাহিনী ভাবতে ভালই লাগছিল। কিন্তু বৌদি এসে সামনে দাঁড়ালেন। —অভয়বাবুদের খবর শুনেছ ঠাকুরপো?

—না।

—সাবরেজিষ্টার নবীনবাবুর সঙ্গে সুমিত্রার………।

—বিয়ে, এই তো!

বৌদি হেসে চলে গেলেন! হাসিটা তিরস্কারের মতই। যাক, সবচেয়ে বড় ভুলটাও ভেঙে গেল। এই একটা লাভ। ঐ চোখের জল, প্রণাম, লজ্জানত মুখ,—কী ক্ষুরধার পবিত্র কোকেট্রি! সে চিনেও চেনে নি। এটা তারই অপরাধ।

সময় থাকতে সরে পড়া চাই। নইলে এই নিলামী মহলে তার সমস্ত বিপ্লবী মনুষ্যত্ব অতি সস্তায় বিকিয়ে যাবে। এই ভণ্ডহাস, ভদ্র সংসারের ছলনাকে পেছনে রেখে চলে যেতে হবে। পশুর মত নিছক একটা গোত্রমোহের তাড়নায় সমস্ত জীবনের ইষ্ট এখানে সে বাঁধা রাখতে পারবে না। সঞ্জয় বুঝেছে, তার সব চেয়ে বড় প্রয়োজন গোত্রান্তর। এই গৃহকূটের রহস্য সে ধরে ফেলেছে।

সঞ্জয় চলে যাচ্ছে দূরদেশে। রতনলাল সুগার মিলে ত্রিশ টাকা মাইনের চাকরী। মাইনে কম বেশীর প্রশ্ন কিছু নেই। এই ত্রিশ টাকার চাকরীর মধ্যে সে দেখেছে অজস্র মুক্তির প্রসাদ।

বিদায়ের দিন মকতপুরের এই জরাজীর্ণ বাড়ীটা যেন আর একবার সমস্ত যাদুবল নিয়ে সঞ্জয়কে দমিয়ে দেবার মতলব করলো। ভাই বোনেরা বাক্স বিছানা বেঁধে দিল। পুতুল সকাল থেকে আঁচিলের মত গায়ে লেগে আছে—যেতে নাহি দিব গোছের ইচ্ছেটা। বাবার কথাগুলোর কটু ঝাঁজ উপে গেছে, সুস্থ ভাবে তামাক টানতে পারছেন না। মা রান্নাঘর থেকে এখনও বাইরে আসেন নি। উনুনের সামনে বসে যেন তাঁর বিগত অদাক্ষিণ্যের প্রায়শ্চিত্ত করছেন। মাছের তরকারীই রাঁধলেন তিন রকমের।

বড়দা বিচলিত হয়েছেন সবচেয়ে বেশী। বললেন—ভাল মনে যাও, আর মনে রেখ, উদ্যোগী পুরুষসিংহ লক্ষ্মীলাভ করেই। তুমিই একদিন ঐ মিলের মালিক হয়ে ব'সতে পার। স্তর রাজেন কি ছিলেন? সব সময় প্রসপেক্টের দিকে লক্ষ্য রাখবে।

মোটর বাসে উঠে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লো সঞ্জয়।

একদিকে নির্জলা ফল্গু, আর তিনদিকে জঙ্গল। মাঝে চুরাশী পরগণা। জঙ্গলের ভেতর গ্রাণ্ডকর্ড লাইন নাড়ীর মত ধুকপুক করে। একটা রামখড়ির টিলার রেঞ্জ চলে গেছে কোডারমা পর্য্যন্ত।

মিল এলাকার নাম রতনগঞ্জ—একটা বাজার আর দূরে ও কাছে কুলী ও কর্মচারী-দের বাসা। চুরাশী পরগণার দিগন্ত জুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে আলবাঁধা ঠাসা শাকসব্জী ও আখের ক্ষেত। ঠুঁটো ঠুঁটো কাকতাড়ুয়া মূর্ত্তি, শুয়োর খেদাবার চালা, আঁকা বাঁকা নালা আর মাঝে মাঝে জল সেচবার বড় বড় কাঠের লাঠা, দূর জাহাজের মাস্তুলের মত ভেসে আসে সবুজ সাগরে।

আখের ফসল পেকে ওঠে। দেড় মানুষের সমান লম্বা লম্বা ঋজু দাঁড়া; এক এক হাতের পাব্। সবুজ রেশমি ফালির মত মাথাভরা পাতার নিশান। ভুরী ছত্রি আর আহীরদের বস্তি—যাদের হাড়ের সারে রত্নসম্ভাবা হয়েছে চুরাশী পরগণার মাটি।

মিলের মালিক রায় বাহাদুর রতনলাল অতি সজ্জন লোক। একটা নগণ্য প্যানম্যানকে আপনি বলে সম্বোধন করেন। প্রাতঃস্নানের আগে বাগানের যত পিঁপড়ের গর্ত্তে মুঠো মুঠো চিনি ছড়িয়ে আসেন।

ক্যাসমুন্সী সঞ্জয়। রায়বাহাদুর সঞ্জয়কে আশ্বাস দিলেন। —এই মিল তোমার। এর উন্নতি হলে তোমারও উন্নতি হবে। কাজ দেখাও, এখানে প্রসপেক্ট আছে।

কিন্তু মাসের পর মাস, চালান রসিদ রেজিষ্টার আর লেজার ঘষে, টাকা নোট আর রেজকি ঘেঁটে আঙুলের ডগা বিষিয়ে যায়। ক্রাশিং মেশিনের শব্দ, ছোবড়ার পাহাড় আর রাবগুড়ের গন্ধে প্রসপেক্টের টিকি খুঁজে পাওয়া যায় না। সঞ্জয়ের মনেও ওরকম কোন ভুয়ো আশার প্রগলভতা নেই। এই সব পয়োমুখ ধনকুম্ভদের রীতিনীতি তার ভালরকমই জানা আছে।

প্রসপেক্ট নয়, আরও বড় ও কঠোর এক সাধনার ভার নিয়ে সঞ্জয় এসেছে এখানে। নিঃশেষে লোপ করতে হবে তার পুরাতন সত্তাকে, ফেরারী আসামীর মত।

অদ্ভুত চরিত্রের একটা লোক সঞ্জয়কে ভাবিয়ে তুলেছে খুব। ওর নাম নেমিয়ার। লোকটা কর্তৃপক্ষের চোখের বিষ। আজ পাঁচ বছর ধরে এখানে লোডিং মুহুরীর চাকরী করছে। ত্রিশ টাকায় আরম্ভ করে এখন এসে ঠেকেছে পনর টাকায়। লোকটার ছায়ার মধ্যে দুর্ভাগ্যের ছোঁয়াচ।

একে কুৎসিত, তার ওপর প্লুরিসি। সপ্তাহে তিন দিন টেবিলে পাঁজর চেপে অসাড় হয়ে পড়ে থাকে। দেখে মনে হয় লোকটা মেরুদণ্ডহীন, নইলে কেন্নোর মত অমন গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে থাকা যায় না।

তা ছাড়া আছে রুক্মিণী—নেমিয়ারের বোন। রতনলাল মিলের প্রবীন অর্ব্বাচীন সবাই সঞ্জয়কে সাবধান করে দিয়েছে—ঐ ভাইবোনের খপ্পর থেকে সামলে থেক বাঙালী বাবু।

নেমিয়ার গায়ে পড়ে ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করছে। হঠাৎ এসে একদিন বলে গেল—এক নম্বরের কুঁয়োর জল ছাড়া অন্য জল খেয়োনা বাবুজী। ম্যালেরিয়া হবে।

আর একদিন কয়েক শিশি আইডিন, ক্যাষ্টর অয়েল আর কুইনিনের বড়ি দিয়ে গেল। —তোমার জন্যে নিয়ে এলাম কোডারমা হাসপাতাল থেকে।

সঞ্জয় শুধু অপেক্ষায় আছে, দেখা যাক্ এই নিষ্কাম প্রীতির পরিণাম কোথায় গিয়ে ঠেকে। তিন সপ্তাহের মধ্যে নেমিয়ারের ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেল। অফিসে খাতা লিখছিল সঞ্জয়। মুখ তুলে তাকাতেই দেখলো নেমিয়ার দাঁড়িয়ে, ছোট ছোট চোখ দুটো মিট মিট করে জলছে।

নেমিয়ার বললো—এইবার একটা বন্দুকের লাইসেন্স নিয়ে ফেল বাবুজী। দুজনে একসঙ্গে শিকার করা যাবে। রোজ খরগোসের রোষ্ট, দোয়াস্তা মহুয়ার সঙ্গে জম্‌বে ভাল।

সঞ্জয়কে নিরুৎসাহ দেখে একবার কি ভেবে নিয়ে হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললো—পাঁচটা টাকা লোন দাও তো বাবুজী। আসছে মাসে তাহলে তুমি পাবে ছটাকা আট আনা।

সঞ্জয় স্পষ্ট বলে দিল—হবে না, মাপ কর।

নেমিয়ার চলে গেল। সঞ্জয় হাসলো মনে মনে। মানুষের হৃদয়বৃত্তির চরম পরিচয় সে জেনেছে। অত সহজে ভবী আর ভোলে না। নেমিয়ার কোন্ ছার।

কিন্তু নেমিয়ারকে চিনতে বোধ হয় এখনো অনেক বাকী ছিল।

রাত্রিবেলা জোর বৃষ্টির শব্দের মধ্যে দরজার বাইরে কড়া নাড়ছে কেউ। সঞ্জয় দরজা খুলতেই ঘরে ঢুকলো রুক্মিণী, হাতে খাবারের থালা।

—আজ নেমিয়ারের জন্মদিন। নেমিয়ার বলেছে আপনিই তার একমাত্র বন্ধু। তাই এই সামান্য কিছু খাবার নিয়ে এলাম আপনার জন্য।

কথা শেষ করে রুক্মিণী থালাটা নামিয়ে রেখে তক্তপোষের একপাশে বসে পড়ে হেসে ফেললো।

সঞ্জয় এই প্রথম ভাল করে দেখলো রুক্মিণীকে। মেয়েটা কালো আর রোগা। বেশ বুদ্ধিভরা সেয়ানা দৃষ্টি। চোখের কোল দুটোতে রাত-জাগা ক্লান্তির কালিমা। তবু দেখে বোঝা যায়, শুধু ভাল করে খেতে পেলে এই চেহারারই কী চমক খুলবে। বেশ দামী একটা শাড়ী প'রে এসেছে, বিলিতি সুগন্ধ মাখা! সবচেয়ে সুন্দর ওর দাঁতগুলো। কথা বলার সময় দেখায় দু'পাটি সারিবাঁধা ছোট ছোট শুক্লমণির মত। হেসে ফেলে যখন, মুক্তদল কুঁড়ির স্তবকের মত হঠাৎ কেঁপে ওঠে।

সঞ্জয়ের তন্ময়তা দেখে রুক্মিণী অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে বললো—আপনি খেয়ে নিন। ততক্ষণ আমি বসছি।

খাওয়া শেষ হতেই রুক্মিণী উঠে ত্বরিৎ হস্তে এঁটো বাসনগুলি তুলে নিয়ে দাঁড়ালো—এবার চলি বাবুজী অনেক রাত হয়েছে।

সঞ্জয় একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললো—একা যাবে কি করে?

—তা যেতে পারবো। এক ঝলক হাসি হেসে রুক্মিণী বাইরে পা বাড়াতেই সঞ্জয় এঁটো হাতে খপ করে রুক্মিণীর কব্জি চেপে ধরলো।

রুক্মিণী বললো—আঃ বাসনগুলো পড়ে যাবে! আগে নামিয়ে রাখতে দাও।

কদিন পরে নেমিয়ার অফিসে সঞ্জয়ের টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালো। মেরুদণ্ডহীন প্রাণীর চোখ দুটো আবার মিট মিট করে জ্বলছে। গলার স্বর নামিয়ে বললো—তুমি রুক্মিণীকে ভালবাস? প্রশ্নের আঘাতে সঞ্জয় চমকে উঠতেই নেমিয়ার বললো—সে তো সুখের কথা। লজ্জা পাবার কি আছে? আচ্ছা, আমি চলি এবার। দাও।

সঞ্জয়—কি?

—সেই যে পাঁচটা টাকা চেয়েছিলাম!

থ্যাঙ্ক ইউ! নোটটা পকেটে গুঁজে নেমিয়ার আবার বললো—যখন যা দরকার হবে আমায় বলো।

সত্যিকারের গোত্রান্তর হয়ে গেল সঞ্জয়ের। পাখী শুধু তার ডাকার আবেগে যেমন করে সঙ্গিনী লাভ করে, রুক্মিণী তেমনি ভাবে এসেছে তার কাছে। তার লাঞ্ছিত পৌরুষকে এই পথের মেয়েটাই সসম্মানে লুফে নিয়েছে। জ'লো দাম্পত্যের চেয়ে এ ঢের ভালো। তার বিদ্রোহের প্রথম পরিচ্ছেদ পূর্ণ হয়েছে।

বাড়ীর চিঠি আসে। খাঁটি বাঙালী বাড়ীর চিঠি—কেমন আছ? উন্নতির কতদূর হলো? সংসারে বড় টানাটানি। কিছু পাঠাতে পারলে ভাল হয়।

চিঠি আসে কিন্তু উত্তর যায় না। মধ্যে অনেক দূর ব্যবধান—বালুচর আর চোরাবালি। চিঠিগুলি খবরের কাগজের টুকরোর মত মনে হয়। ও দুঃখ তো আর একা মকতপুরের দত্তবাড়ীর নয়। এই নেমিয়ারের বৌ তিনটি ছেলে কোলে ক'রে কুঁয়োয় ঝাঁপিয়ে আত্মহত্যা করেছে। সেই খবরের কাটিং আছে নেমিয়ারের বুকপকেটে। পৃথিবীর দুঃখ মিটলে দত্তবাড়ীরও দুঃখ মিটবে।

রাত্রে হাঁড়িয়া খেয়ে এক একদিন কড়া নেশায় মাথায় জ্বালা ধরে। সঞ্জয়ের চোখ দিয়ে জল গড়াতে থাকে। রুক্মিণী পরে জিজ্ঞাসা করে—তুমি কাঁদ কেন?

চিঠিগুলি কুচি কুচি করে ছিঁড়ে পুড়িয়ে দেয় সঞ্জয়, ক্ষ্যাপা বামুন যেভাবে তার উপবীত ভস্ম করে।

চুরাশী পরগণা থেকে সহস্র যোজন দূরে, লবণ পারাবারের অপর প্রান্তে ওলন্দাজের দেশে মুদ্রালক্ষ্মী যেন বিধবা হয়েছে। স্বর্ণমান বাতিল হয়ে বাট্টা আর বিনিময়ের

হার পাল্টে গেছে রাতারাতি। গিলডারের দাম এক দফায় নেমে গেছে সস্তা হয়ে।

সেই ক্ষুব্ধ বাণিজ্যবায়ু হুহু করে আকাশে পাড়ি দিয়ে এসে ঠেকেছে কলকাতার বন্দরে। টন টন জাভা চিনি নামছে অতি মন্দা দরে। ইণ্ডিয়ান চেম্বারে বিষাদ। মতিপুর চম্পারণ আর কানপুর স্পেশাল বস্তাবন্দী হয়ে কাঁদছে আড়তে আড়তে।

ওলন্দাজের বাজারের অভিশাপ এসে লাগলো রতনলাল মিলে আর চুরাশী পরগণার আখের ক্ষেতে। মিলের ঘরে ঘরে মুনিবজী নোটিশ পড়ে গেলেন—মাইনে ও মজুরী শতকরা চল্লিশ কাট্।

কিষাণেরা ফটকে ভিড় করছে। চোঙ মুখে দিয়ে মুনিবজী আখের দর ঘোষণা করে দিলেন—এগার পয়সা মণ। যে যে বেচতে রাজী আছ, কাল থেকে ফসল পৌঁছাও।

সন্ধ্যে পর্যন্ত মিল ফটকে কর্মচারী ও কিষাণদের জনতা নিঝুম হয়ে বসে রইল। রায়বাহাদুরের ছেলে সূর্যাবাবু চলে গেলেন সদরে, ট্রাঙ্ক টেলিফোনে কলকাতার বাজারের অবস্থা জানতে।

ভীড় সবাকে রায়বাহাদুর স্বয়ং হাতজোড করে এসে দাঁড়ালেন।—বাবালোগ বৃথা ঝামেলা কেন? এ সব নসিবের মার। ভগবানের কাছে জানাও, যেন সুদিন ফিরে আসে।

কিষাণদের মধ্যে মুনিরাম একটু জবরদস্ত। সাফ জবাব দেবার মত জিভ ওরই আছে। মুনিরাম বললো—সরকারী রেট তো পৌনে পাঁচ আনা বাঁধা আছে হুজুর!

রায়বাহাদুর স্মিতহাস্যে বললেন—ওসব সুখস্বপ্ন ছাড়ো ভাইয়া। সে রামরাজ নেই। জাভা মাল এসে ডাকাতি করছে। তমাম আগুন লেগে গেছে। মিল বন্ধ না করে দিতে হয়।

মুনিরামও ছাড়বার পাত্র নয়।—কাল সকালে ঘরের ছেলেমেয়ে সব পাঠিয়ে দেব। মেহেরবানি করে গুলি চালিয়ে ওদের শেষ করে দেবেন। সেই বরং ভাল।

সস্নেহে ভর্ৎসনা করে রায়বাহাদুর বল্লেন—বেকুব ঘোড়া কাঁহাকা। যা যা ঘরে গিয়ে মাথা ঠাণ্ডা কর্। এ শঙ্কর পালোয়ান, ফটক বন্ধ করো।

পরাজিত পল্টনের মত জনতা ফটক থেকে সরে এ । কর্মচারী আর মজুরেরা যে যার ঘরের পথ ধরলো। শুধু সঞ্জয় চললো অন্যদিকে। সঙ্গে নেমিয়ার মুনিরাম সুখলাল ছেদি, আরও কজন কৃষাণ। বুড়ো বটের তলায় পুরানো শিবালয়ের সিঁড়িতে ওরা নিঃশব্দেই এসে বসলো।

সঞ্জয় বললো-এর প্রতিশোধ নিতে হবে।

মুনিরামের অন্তরাত্মা যেন এই বরাভয়বাণীর জন্য ওৎ পেতে বসেছিল। লাফিয়ে উঠে বলল—দোহাই বাঙালী বাবু। একটা উপায় বলে দাও।

কয়েকটা গবেট গোছের কিষাণ কি জানি কিসের প্রেরণায় ডাক ছাড়লো—হর হর মহাদেও!

নেমিয়ার দাঁত মুখ খিঁচিয়ে খিস্তি করে ধমক দিল—এই খবরদার! কোন আওয়াজ নয়।

এই অবস্থায় কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর সঞ্জয় প্রস্তাব করলো—কেউ ফসল বেচবে না।

সবাই বললো—ঠিক কথা।

—তোমরা দর নামিও না। ওরা শেষে কিনতে বাধ্য হবে। নতুন মেশিন এসেছে, কাজ ওদের চালু করতেই হবে।

সুখলাল বললো—যদি না কেনে!

মীমাংসা হয়েই যাচ্ছিল, সুখলালের প্রশ্নে আবার বিতণ্ডা সুরু হলো।

সঞ্জয় উঠে দাঁড়িয়ে বললো—কিনতে বাধ্য হবে। লড়াই শুরু করে দাও। বট পাতা ছুঁয়ে সকলে কসম খাও।

সঞ্জয়ের কথার মধ্যে অদ্ভুত এক আশ্বাসের উদ্দীপনা ছিল। যেটুকু সংশয়ের মেঘ ছিল, সকলের প্রতিজ্ঞা আর উৎসাহের ঝড়ে তাও কেটে গেল। পুণ্য বাতাসে শিবালয়ের ঐ নিরেট বধির বিগ্রহটা সত্যিই যেন জেগে উঠলো এতদিনে!

বৈঠক শেষ হলো।

রুক্মিণীর ঘরের কাছাকাছি এসে সঞ্জয় বললো—নেমিয়ার, তুমি এইবার যাও। আজ থেকেই লেগে যাও। খুব ভাল করে অর্গানাইজ কর।

—বহুৎ আচ্ছা বাবুজী।

নেমিয়ার চলে গেলে সঞ্জয় অন্ধকারে অনেকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। এম এ পাশ সঞ্জয় ক্যাশ মুন্সী হয়ে গেছে। তার অপমানিত প্রতিভা যেন ব্যর্থ রোষে ফণা নামিয়ে দিন গুণছিল। এইবার ফিরে ছোবল দিতে হবে, যতখানি বিষ ঢালতে পারা যায়।

অন্ধকারে চুপ করে দাঁড়িয়ে তার সমস্ত ভাবনাকে সংগ্রামের সাজে সাজিয়ে তৈরী হলো সঞ্জয়। রতনলাল মিলের চিমনিটা অস্পষ্ট দেখা যায়। ডাইনোসরের মত ঘাড় উঁচিয়ে তাকিয়ে আছে চুরাশী পরগণার বিস্তীর্ণ আখের ক্ষেতের দিকে। ঐ দানবীয়

চর্বির স্তূপের ভেতর কোথায় হৃদপিণ্ড লুকিয়ে আছে তা সঞ্জয়ের অজানা নয়, ঠিক সেখানেই লক্ষ্য করে আঘাত দিতে হবে।

মন ভরা উল্লাস নিয়ে সঞ্জয় রুক্মিণীর ঘরে ঢুকলো।

আদরের বাড়াবাড়ি দেখে রুক্মিণী প্রশ্ন করে বললো—বড় সস্তার সওদা পেয়েছ না? তবুও একদিন তো ছেড়েই দেবে।

—সস্তা? আমার আর কি দেবার বাকি আছে? আর ছেড়েই বা দেব কেন?

রুক্মিণী যেন একটু অনুতপ্ত হয়েই হাত দিয়ে সঞ্জয়ের মুখ চেপে ধরে বললো—আচ্ছা! আচ্ছা মাপ করো। আর বলবো না। তবে তুমি নিজেই সেদিন নেশার ঘোরে বলছিলে, আমি নাকি সরবতের গেলাস, সরবত নই।

সঞ্জয়ের প্রত্যুত্তরের অপেক্ষা না করেই রুক্মিণী বললো আমার কিছু থোক টাকা চাই। একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখ তো আমার দিকে।

রুক্মিণী গায়ের আঁচলটা নামিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো- বুঝেছ? আমার চলবে কি করে?

হাঁ বুঝেছি। সঞ্জয় গম্ভীর হয়ে গেল।

রতনলাল মিলের সমস্ত মেশিন বন্ধ। অতিকষ্টে দু'চার গাড়ি মাল যোগাড় হয়েছে। কলকাতার মার্কেটের অর্ডার মেটাবার শেষ দিন এগিয়ে আসছে। রায়বাহাদুর পাগল হয়ে সদরে এস ডি ওর বাংলোতে দৌড়াদৌড়ি করছেন।

চুরাশী পরগণার ফসল শুকোচ্ছে মাঠে মাঠে। এজেন্টরা গাড়ি আর টাকার তোড়া নিয়ে বস্তি বস্তি ঘুরে বেড়াচ্ছে।—মাল ছাড়বে তো ছাড়। পাতা লাল হয়েছে কি এক আনাও দর দেব না। কিষাণরা হেসে চুপ করে থাকে।

নেমিযার একেবারে উধাও হয়েছে। বাড়ীতেও থাকে না, অফিসেও আসে না। দাঁড়কাকের মত সে দিনরাত চুরাশী পরগণার মাঠে ঘাটে বস্তিতে উড়ে বেড়ায়।—খবরদার, এজেন্টদের কথায় কেও ঘাবড়িয়ো না। রতনলাল মিল ঠাণ্ডা হয়ে আসছে।

চুরাশী পরগণার ওপর শকুন উড়ছে কদিন থেকে। গো-মড়ক লেগেছে। মুনিরামের একটা ছেলেও মারা গেছে বসন্তে।

সাহুরা খেরোবাঁধা খাতা আর তমসুকের নথি নিয়ে দরজার দরজায় হানা দিচ্ছে তাগাদায়। একজন রিক্রুটার ত্রিশ জন তুরীকে গেঁথে নিয়ে সরে পড়েছে মালয় রবার বাগানের জন্য। কদম সাগরের রাস্তায় গরুর গাড়ী লুট হয়েছে। মিলিটারী পুলিশ রুট মার্চ করে গেছে।

পঙ্গপালের মত কোভারমার গয়লারা এসেছে দলে দলে। মোষ কিনছে পাঁচ টাকায়, দুধেল গরু আট টাকায়, বাছুর বার আনা। সাহুরা চড়া সুদে রূপোর গহনা বন্ধক নিচ্ছে, পেতল কাঁসার বাসন বিলিয়ে যাচ্ছে মাটির দরে।

চুরাশী পরগণার ঘরে ঘরে সেদ্ধ হচ্ছে কোনার গাছের পাতা। ঘরে ঘরে দানা আনাজ নিঃশেষ।

এক মাস হতে চললো। রায় বাহাদুর এজেন্টদের গালাগালি দিয়েছেন।—যেমন করে পার মাল নিয়ে এস। মার্কেটে আর ইজ্জৎ থাকে না। মেশিনে মরচে পড়ে গেল।

এস-ডি-ও এসে মিল দেখে গেছেন। পেয়াদা দিয়ে চুরাশী পরগণায় ঢোল পিটিয়ে দিয়েছেন।—সব কোই হুঁসিয়ার হো যাও। ফসল ছাড়, একদিন মাত্র সময় দেওয়া গেল, নইলে কাল থেকেই লয়াবাদ পরগণা থেকে ফসল আনা হবে।

মুনিরাম আর সুখলাল এলো সন্ধ্যেবেলা। ঘেয়া কুকুরের মত চেহারা। তবু এখনও ভরসা জ্বল জ্বল করছে ওদের চোখে, হাত পেতে হুকুম চাইছে।—বাবুজী, এইবার কি করতে হবে হুকুম দাও।

সঞ্জয় বললো—আর কটা দিন সবুর কর!

মুনিরাম আর সুখলাল চুপ করে অনেকক্ষণ বসে থেকে চলে গেল। তাদের কিছু একটা বলবার হয় তো ছিল। বলা আর হলো না।

ঘটনাগুলি কেমন ঘোরাল হয়ে আসছে। রায়বাহাদুর এখনও তাকে ডাকলো না, এই সঙ্কটে একটা পরামর্শের জন্য। আভাসে সঞ্জয় একদিন জানিয়েও ছিল—যদি বলেন তো কিষাণদের আমি শান্ত করি।

এদিকে রুক্মিণী আবার এক কাঁটা গিলে বসে আছে। দুদিকেই একটা ব্যবস্থা এবার করা উচিত। কিন্তু নেমিয়ার ছাড়া কি করে কাজ হয়। কাজের বেলা লোকটি সত্যিই বড় সহায়।

নেমিয়ার এসে সামনে দাঁড়ালো।

কেরোসিনের বাতির ময়লা আলো। নোংরা খাকি প্যান্ট, ছেঁড়া কামিজ, পাখীর বাসার মত রুক্ষ চুলে ভরা মাথাটা। কেমো নেমিয়ার দাঁড়িয়েছে—লোহার মূর্তির মত ঋজু ও কঠিন। গোত্রহীন মানুষের স্বরূপ দেখে আজ সঞ্জয় আৎকে উঠেছে, ব'সে আছে মাথা নীচু করে।

নেমিয়ার চাইতে এসেছে মিলের ক্যাশঘরের চাবি।—গিরগিটির মত চেটে নিয়ে আসবো যা কিছু ক্যাশ আছে। ঘরে আগুন লাগিয়ে দেবো। ফাইল রেজিষ্টার ছাই হয়ে যাবে! তোমাকে দায়ী করবে কি দিয়ে? কে বলবে কত ব্যালান্স ছিল? দাও চাবি দাও।

সঞ্জয় ঘাড়টা একবার তুলে তাকালো বাইরের অন্ধকারের দিকে। আলোটা একটু উজ্জ্বল থাকলে দেখা যেত, দমকা শিহরে তার হাঁটু দুটো থর থর করে উঠলো।

নেমিয়ার যেন ভয়ঙ্কর অর্থহীন এক ব্যালাড গাইছে।—চুরাশী পরগণার রসদ চাই। তারপর দেখবো, নয়াবাদের সড়ক দিয়ে কোন্ মরদকা বাচ্চা বাইরের মাল আনতে পারে? কেউ বেচবে না ফসল, ক্ষেতে ক্ষেতে শুকিয়ে যাবে, পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হবে। কিষানেরা সব কসম খেয়েছে। আজ রাত্রে লাঠি মাজা হচ্ছে ঘরে ঘরে। সব তো গেছে, কিন্তু রতনলাল মিলকে দেখে নেবে তারা। মাথা দেবে, মাথা নেবে।

বসন্তে ক্ষতাক্ত মুখ, গোল গোল চোখ, বেঁটে রোগা ঘুঁটে রঙের চেহারা নেমিয়ার, যাকে চড়ুই পাখিও ভয় পায় না—সেই এসে দাঁড়িয়েছে সঞ্জয়ের সুমুখে অতি আসন্ন এক ধ্বংসের ফরমান হাতে নিয়ে।

নেতিয়ে পড়ছে সঞ্জয়। নেমিয়ার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বললো—অত ভাবনা কিসের কমরেড দাদা! তোমার কিষাণ ফৌজকে খেতে হবে তো। দাও আর দেরী করো না।

সঞ্জয়ের হাত থেকে ক্যাশঘরের চাবির তোড়া ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে নেমিয়ার অন্ধকারে পিছলে সরে পড়লো।

উদ্‌ভ্রান্তের মত অনেকক্ষণ পায়চারি করে সঞ্জয় এসে দাড়ালো ঘরের বাইরে, একটু ঠাণ্ডা হাওয়া পেতে। একটা সামান্য দলাদলির এ রুদ্র পরিণাম সে কল্পনা করতে পারে নি। সার্কাস দেখাবার জন্য যে সিংহকে খাঁচার বাইরে আনা হয়েছে, একটু সামান্য খোঁচা দিলেই সেটা এমন বুনো হাঁক ছেড়ে অবাধ্য হয়ে উঠবে কে এতটা ভেবেছিল?

—নেমিয়ার। অন্ধকারে সঞ্জয়ের ভাঙা গলা কেঁপে উঠলো।

দৌড় দিল সঞ্জয়।

রুক্মিণীর ঘরের জানালার ফাঁক দিয়ে মৃদু আলোর সঙ্গে তারযন্ত্রের বিলাপের মত একটা স্বর ঠিকরে এসে পড়েছে। সঞ্জয় জানালার ফাঁকে চোখ লাগিয়ে তাকিয়ে রইল।

মেঝের ওপর লুটোচ্ছে রুক্মিণী। সাড়ীর ভার খসে গিয়ে কোমরে শুধু গোরোটা লেগে আছে। খোঁপাটা মাটিতে ঘসা খেয়ে নোংরা হয়ে গেছে। কাঁচের চুড়িগুলো ভেঙে ছড়িয়ে রয়েছে এদিক ওদিক। আহত সর্পিনীর মত রুক্মিণী যেন কোমর ভেঙে অবশ ভাবে পড়ে আছে। মাথাটা শুধু এপাশে ওপাশে আছাড় খেয়ে পড়ছে।

রুক্মিণীর প্রাণবায়ু যেন করাল ঝঞ্ঝার মত সমস্ত শরীরে একবার গুমরে উঠলো। এমন অবস্থায় অনেকে তো মারা যায়। রুক্মিণীর কপালেও কি তাই আছে?

অনাবৃত মসৃণ হাঁটুর ওপর অতি পরিচিত সেই নীল শিরার আঁকা বাঁকা রেখাগুলি, জোঁকের মত ফুলে উঠেছে। ঠোঁটের ওপর দাঁতের পাটি চেপে বসে গেছে। চোখের কোণ থেকে তোড়ে তোড়ে জল গড়িয়ে পড়ছে কান ভাসিয়ে। চাপা আর্ত্তস্বর পর্দায় পর্দায় তীক্ষ্ণ হয়ে উঠেছে। ফুসফুসটা ফেটে যায় বুঝি। এই কি মৃত্যু?

কি নিষ্ঠুর বিভ্রম! সমস্ত যন্ত্রণা ধ্বস্ত ক'রে কপট মৃত্যুর আড়ালে এক নবজীবনের রক্তবীজ পৃথিবীর মাটিতে হাত বাড়িয়েছে। সঞ্জয় এক লাফে পিছিয়ে এসে গাছের নীচে দাঁড়ালো।

নেমিয়াব কোথায়? সঞ্জয় এগিয়ে নেমিয়াবের ঘরের দরজার ফাঁকে উঁকি দিল।

কালো প্যান্ট পরে, কোমরে একটা চওড়া বেল্ট ক'সে নেমিয়াব বসে বসে চিবোচ্ছে বাসি রুটি। হাঁড়ি থেকে ঢেলে পচাই খাচ্চে এক এক চুমুক। একটা ধারালো ভোজালী সামনে রাখা। মুখে অদ্ভুত এক প্রসন্নতা, শুকনো ঠোঁট দুটো নেকড়ের মত হাসছে।

এ-ঘরে ভাই, ও-ঘরে বোন। পুরাকল্পের বর্ব্বর পৃথিবীর দুজন কুপিত ডাইন ও ডাইনা যেন তুক্ করে সর্ব্বনাশের আহ্বান করছে।

নদীতে বান ডাকে, ভয়াল জলের তোড় আসে গর্জ্জন করে। জেলে তার যথাসর্ব্বস্ব ঘাড়ে তুলে দৌড় দেয়। সঞ্জয় দৌড় দিল।

সড়ক না ধরে, মাঠের ঢালু খাডাই খাদ গর্ত্ত ডিঙিয়ে সঞ্জয় দৌড়ে চলেছে। মিল ফটকের আলোটা ঘোলাটে আলেয়ার মত কুয়াসায় দপ দপ করছে। আর বেশী দূর নয়।

মকতপুরই বা কতদূর। আজ শেষ রাত্রে ট্রেন ধরলে কাল বিকালেই পৌঁছে যাবে। শিরিষ গাছে হয়তো সুঁটি পেকেছে। সোনালী বৈকালে হাল্কা বাতাসে মোটা ঘুঙরের বোলের মত বাজে। বড়দা বারান্দায় বসে গুড়ের তৈরী চা খান। মা উঠানে বসে লক্ষ্মীর পিঁড়ি ধুতে থাকেন। পুতুল আকাশে আঙুল তুলে শঙ্খচিলের ঝাঁক গোণে—এক দুই তিন। আর সুমিত্রা? হয়তো তার বিয়ে হয়নি। তার শবরী দৃষ্টি ঘুরে বেড়ায় মকতপুরের বাড়ীর জানালায়—পথে—ধাবমান মোটর বাসের দিকে।

রায়বাহাদুর রতনলাল, সূর্যবাবু, মুনিবজী। সামনে টুলের ওপর বসে আছে সঞ্জয় বিশীর্ণ রোগীর মত। ভাঙা কাঁসরের মত গলার আওয়াজ। এক গেলাস গরম দুধ খেতে দেওয়া হয়েছে সঞ্জয়কে।

রায়বাহাদুর ডাকলেন—শঙ্কর পালোয়ান, ক্যাশঘরে পাহারা বসাও। নেমিন্নার বাবুজীকে ছুরি দেখিয়ে চাবি নিয়ে গেছে। আজ রাতেই চুরি করতে আসবে। চোট্টা শালাকে ধরে কাঁচা খেয়ে ফেলতে হবে।

মুনিবজীকে হুকুম দিলেন—বাবুজী ষ্টেশনে যাবেন। এখনি একটা ভাল ঘোড়ায় গদি চড়িয়ে দাও। আর আমার সিন্দুক খোল, বকশিস দিতে হবে। বড় ইমানদার ছেলে।

আদাব জানিয়ে সঞ্জয় উঠলো। রায়বাহাদুর বললেন—কটা দিন বাড়ী গিয়ে বিশ্রাম কর। তারপর এস আমার গোরখপুর মিলে—শও রূপেয়া তনখা।

রামখড়ির সারি সারি টিলার গায়ে গায়ে সরু জংলী পথে ঘোড়া ছুটিয়ে চলেছে সঞ্জয়। আকাশের বুকটা লাল হয়ে গেছে। কিষাণেরা আগুন জালিয়ে দিয়েছে নিজের নিজের ক্ষেতে। পুড়ে পুড়ে শুদ্ধ হচ্ছে চুরাশী পরগণা।

সামনের মাঠটা পার হলেই ষ্টেশন, ডিষ্টাণ্ট সিগনালের আলোটা নীল তারার মত ভেসে রয়েছে। ছপ্ করে একটা শব্দ। ঘোড়াটা একটা স্রোতে পা দিয়েছে।

সঞ্জয় ঘোড়া থেকে নেমে স্রোতের ধারে বসে আঁজলা ভরে জল খেল। গেরস্থের মুর্গী চুরি করে খেয়ে একটা শেয়াল ভেজা বালির ওপর বসে গোঁপের রক্ত চাটছিল। সেও এসে জল খাবার জন্য স্রোতে মুখ নামালো।

১

পরশুরামের কুঠার

চারিদিকের কোলিয়ারিগুলির সুদিন পড়েছে। বাজার বস্তি বাড়ছে। নিত্য নতুন কুলী কারিগর কেরানী ও দোকানীর ভীড়ে নবাবাদ যেন গেঁজে উঠেছে। নয়াবাদকে তাই আর শুধু বাজার বলা যায় না। শুধু একটা থানা দিয়ে আর সামলে রাখা সম্ভব নয়। একজন সাবডিভিসনাল অফিসারকে আদালত নিয়ে বসতে হলো নয়াবাদে। সেই থেকে নয়াবাদ মহকুমা।

কিছু ভদ্রলোকের আমদানী হলো। প্রথম যারা এলেন তাঁরা শুধু কয়েকজন উকীল, ডাক্তার আর একজন ওভার্সিয়ার। প্রাইমারী বাংলা স্কুল হলো একটা। মিউনিসিপ্যালিটিও চালু হলো।

তার অনেক আগেই নবাবাদের লালমাটির ডাঙা ফুঁড়ে গজিয়ে উঠেছে ক্যাথলিক মিশনের সুন্দর একটা গির্জা। দেশী খৃষ্টান মেয়েদের কনভেন্ট, একটা অনাথালয় আর একটা জেনানা হাসপাতাল। ঝাউ বনের ফাঁকে সাদা নতুন ইমারতগুলি উঁকি দিয়ে ছবির মত স্থির হয়ে থাকে।

তারপর সুরু হলো নয়াবাদের একটানা অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তন। রাতের রেলগাড়ীর মত নয়াবাদকে টেনে নিয়ে গেলে বছরের পথ ধরে, হু হু করে, পরিণামান্তরে। কিন্তু সবচেয়ে বদলে গেল যে, নামধাম চেহারা পযন্ত—তার নাম ধনিয়া।

বাঙালীটোলা থেকে সামান্য একটু দূরে দুর্গাবাড়ীর পেছনে এক আমড়াতলায় ধনিয়ার ছোট একটা মেটে ঘর। খাপরার ছাউনি। সকাল থেকে সন্ধ্যে পযন্ত ঘরের সুমুখে একটা ছাগল বাঁধা থাকে। বাংলা স্কুলের ছেলেরা তাই নাম দিয়েছে—ছাগল লজ।

তিলকের মা ধনিয়া। তিলককে আজ পর্যন্ত কেউ দেখে নি। তিলকের বাবা কে, তাও কেউ জানে না। কিন্তু দু'তিন বছর পর পর নিয়মিতক্রমে তিলকের অনুজ ও অনুজারা ভূমিষ্ঠ হয়। শোণিতস্নাত এক একটি আনন্দের কণিকা যেন চুপে চুপে সকলের অলক্ষ্যে মায়ের হাত ধরে জীবনের পথে দেখা দেয়। তারপরেই হঠাৎ হাতছাড়া হয়ে মেলার ভীড়ে হারিয়ে যায়। আর তাদের কেউ দেখতে পায় না

থাকে থাকে, ধনিয়া একদিন উধাও হয়ে যায়। মাস দুয়েক তার আর দেখা

পাওয়া যায় না। তখন তাকে পাওয়া যাবে মিশন জেনানা হাসপাতালের একটি স্ত্রী বেডে। ক্ষুদ্র বিবর্ণ একটি মানুষের শাবক কুঁকড়ে পড়ে আছে ধনিয়ার বুকের কাছে। কটা দিন যেন উষ্ণ নরম ডানার তলায় পরিপুষ্ট হতে থাকে শ্লথ শরীরটা একটু ভরাট হতে থাকে, চামড়ার ভাঁজ আর রেখাগুলি ধীরে মিলিয়ে যায়। মিটমিট করে তাকায়—হাত পা ছোঁড়ে। একটু স্পর্শ পেলেই চারাগাছের পাতার মত লোলুপ ঠোঁট দুটো নড়ে ওঠে।

তারপর আর নয়। পাখি উড়ে যায়। ধনিয়া একা ফিরে আসে তার ছাগল লজে। তিলকের ভাইটিও যথানিয়মে মিশন অনাথালয়ে চালান হয়।

ধনিয়া অদ্ভুত মানুষ। হাসপাতালের নার্সেরা আশ্চর্য না হয়ে পারে না। লেডি ডাক্তারও হতবুদ্ধি হয়ে বলেন "জীসস্। আমি সত্যি ঘাবড়ে গেছি। এই মেয়েটা আমার বাইবেল ও বিজ্ঞান উল্টে দিয়েছে। জানতাম পাখির বাচ্চাই বড় হয়ে পালিয়ে যায়। কিন্তু এই প্রথম দেখলাম পাখিই পালিয়ে যাচ্ছে বাচ্চা ফেলে দিয়ে।"

ভদ্রলোকের পাড়া ঘেঁসে থাকে ধনিয়া। আত্মীয় বলে ওর কেউ নেই। ওর সমাজ নেই। কিন্তু এ শুধু সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত। সন্ধ্যের পর আর সে নিয়ম চলে না।

প্রতিরাত্রে সড়কের ওপর দাঁড়িয়ে দেখা যায়, শুধু কানাকানির ওপর দিয়ে আমড়াতলায় এক অদ্ভুত পৃথিবীর লীলাখেলা চলেছে। আবছা আলো, চাপা হাসি। শব্দ এখানে শুধু ফিসফিস, গান এখানে শুধু গুঞ্জন। সবই অস্পষ্ট। এখানে কাউকে আসতে দেখা যায় না, কেউ কখনও চলেও যায় না। রাউণ্ডের পুলিশ ছাড়া সেসব অদৃশ্য ছায়া-জীবের পরিচয় আর কেউ জানে না। কিন্তু তা নিয়ে সোরগোল হয় না কখনও। রাত্রে যতবার ধনিয়ার দরজা খোলে, রাউণ্ডের পুলিশেরও ততবার আয়ের পথ খুলে যায়।

এইভাবেই চলছিল। কিন্তু ভদ্রসমাজে ধনিয়ার সম্বন্ধে আলোচনা হয় কেন? ধনিয়ার কথা ভুলতে পারে না অনেকেই।

বাংলা স্কুলের ছুটি হলে বাড়ী ফেরার পথে ছেলেদের মনে পড়ে ধনিয়াকে, ছাগল লজের আমড়া গাছ। ধনিয়ার ধমক খেয়েও দু'একটা পাকা আমড়া না চিবিয়ে আসলে ওদের সমস্ত জাগ্রত দিনের পরিতৃপ্তি যেন অপূর্ণ থাকে।

সন্ধ্যেয় ক্লাবঘরে উকীল ও ডাক্তারবাবুদের মধ্যে ধনিয়ার প্রসঙ্গ ওঠে। তাঁরা বলেন—মেয়েটার কেউ নেই, অথচ চলে যায় বেশ। রহস্য বটে!

রাত্রি দশটার পর রাউণ্ডের কনষ্টেবলেরা পোষ্টে যাবার আগে এক টিপ খৈনি মুখে দিতেই ওদের চোখমুখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সমস্ত রাত্রি টহলের একঘেয়েমি। তারই মাঝে আমড়াতলার সামনে মিষ্টি অন্ধকারে কিছুক্ষণ থমকে থাকা। ধনিয়ার ঘরের দরজার ফাঁকে প্রদীপের একটু ক্ষীণাভা—প্রাপ্তি ও পুরস্কারের দিব্যজ্যোতি। চাঁদনা রাতের আকাশের দিকে ওরা এত আগ্রহ করে মুখ তুলে কখনও তাকায় না।

এখানেই শেষ নয়। ধনিয়ার ব্যক্তিত্বের ছায়া আরও অনেকদূর ছড়িয়ে পড়েছে, বাঙালী ভদ্রঘরের শুদ্ধান্তঃপুরে পর্য্যন্ত। এটা অবশ্য নিছক প্রয়োজনের তাড়নায়। ঘটনা এমনি দাঁড়ালো যে সন্তানবতী বধূসমাজও এহেন ধনিয়ার সাহায্যের ওপর নির্ভর না করে আর পারলো না। তাদের মাতৃত্বের প্রতিষ্ঠাটুকু নইলে বুঝি মাঠে মারা যায়।

ভদ্রবাড়ির প্রসূতিদের একটা না একটা আধি ব্যাধি লেগেই আছে। কেউ সূতিকায় জর্জর, কেউ রক্তহীনতায় সিটিয়ে যায়, কারও'র বা বুকের অপত্যনির্ঝর অকালে স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মিশন হাসপাতালের লেডি ডাক্তার মোটা ফী নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রসূতিদের পরীক্ষা করে অভিমত দিলেন।—প্রসূতিদের চিকিৎসা চ'লতে পারে, কিন্তু শিশুদের জন্য কোন ট্রিটমেণ্টই সফল হবে না। ওদের দরকার ভাইটালিটি, ওষুধ নয়।

"—তবে উপায়?"

"—উপায় একজন সুস্থ সবল আয়া, শিশুদের বুকের দুধ খাওয়াবার জন্য।'

ঘরে ঘরে আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় সকলের মুখের হাসি মিলিয়ে গেল। এই বংশরক্ষার সঙ্কটে গরজের বালাই ডেকে আনলো ধনিয়াকে। আমড়াতলা থেকে একেবারে ভদ্রবাড়ীর আঁতুড় ও অন্তঃপুরে।

ধনিয়ার ডাক পড়ে বাড়ি বাড়ি। বুকের দুধ খাইয়ে যাবার ঠিকে। দু'বেলার রেট মাসিক ছ'টাকা, দৈনিক একপো চালের সিধে আর ঠিকে শেষ হ'লে বিদায় নেবার দিন একটা নতুন শাড়ী। এই বরাদ্দে ধনিয়া বাড়ি বাড়ি খেটে যায়।

প্রত্যহ সকাল বা সন্ধ্যের আগে ধনিয়া ঠিক খাটতে বার হয়। হাতে একটা ভাঁজ করা পরিষ্কার তোয়ালে। সব সময় মুখ হাসি হাসি। সুগন্ধ নেবু তেলে চুবিয়ে চুল বাঁধা। লাল সায়ার ওপর একটা পাতলা ধোলাই শাড়ী। চলবার সময় পায়ের আঙুলে রূপোর চুটকিগুলো খই ফোটার শব্দের মত বাজতে থাকে। নাকে একটা সোনার চিড়িতনের নাকছাবি—ঠোঁটের মিটিমিটি হাসির সঙ্গে মানিয়ে যায় বেশ। প্রসাধন তেমন কিছু নয়, পরিচ্ছন্নতাই বেশি। কিন্তু সুশ্রী চেহারা, হঠাৎ দেখে মনে হয়—বড় বেশি ঠাট।

ঘোষাল বাবুদের বাড়ির অন্দরে ধনিয়া ঢুকলো। এখানে একবেলা ঠিকে খাটতে হয়। মাত্র তিন মাসের একটা ছেলে।

ধনিয়াকে দেখেই ঝি প্রথমে মুখ কুঁচকে ঘরের ভেতর চলে যায়। একটা মোড়ার ওপর বসে আছেন জীর্ণ শীর্ণ ঘোষালবাবুর স্ত্রী। সামনে একটা দোলনায় ঘুমন্ত নতুন খোকাটা।

ঝি গিয়ে জানালো—ঐ এসেছেন। কী ঠাট রে বাবা! গা ঘিন ঘিন করে।

ঘোষালবাবুর স্ত্রী বিদ্রোহিণী ঝিকে শান্ত করলেন।·· যাক্, মুখের ওপর কিছু বলিস্ নি ঝি। দায়ে পড়েছি কাজ নিতে হবে। ভেতরে যে যেমন লোক হোক্ না, আমাদের কি?

ধনিয়া এগিয়ে এসে দোলনা থেকে শিশুটিকে কোলে তুলে নিয়ে বসে। দু'একটা অবান্তর প্রশ্ন করে।—"আজ কেমন আছ দিদি?" উত্তরের কার্পণ্য দেখে আর বেশি কিছু বলে না। কাজ শেষ হবার পর একটুখানি দাঁড়ায়। গামছায় সিধে বেঁধে নিয়ে চলে যায়।

বিকেলে নরেন বাবুর বাড়ি মেয়েদের একটা জটলা বসে। হাজির হয় ধনিয়া। একটা ধাড়ি ছেলেকে দুধ খাওয়াতে হয়। তিন বছর বয়সের রোগাপটকা ছেলে, পেটে এখনও গরুর দুধ হজম হয় না। বুড়োটে চেহারা আর উগ্র স্বভাব নিয়ে সারা বাড়ির লোককে জ্বালাতন করে। যতক্ষণ জেগে থাকে ততক্ষণই কাঁদে আর মাটিতে গড়ায়। কোন প্রবোধ সান্ত্বনা মানে না।

বারান্দায় উঠে ধনিয়া হাততালি দিল।—আওয়া মেরা লাল।

চীৎকাররত ছেলেটা মন্ত্রমুগ্ধ সাপের মত ভূতলশয্যা থেকে একবার ফণা তুলে তাকালো, তারপর এক দৌড়ে এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল ধনিয়ার কোলে। খানিকক্ষণ ধনিয়ার হাতের বাজু নিয়ে টানাটানি উপদ্রব করলো। তারপর চুপ করে ধীর স্থির হয়ে গুটিয়ে শুয়ে পড়ল ধনিয়ার কোলে।

কিছুক্ষণ পরে ধনিয়া ডাকল—ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে। কোথায় শোয়াই?

অকস্মাৎ ঘরের ভেতর মেয়েদের মধ্যে যেন একটা বড় রকমের রসিকতার ঝড়ের দোলায় সকলে চঞ্চল হয়ে উঠলো। জব্দ করার জন্য সকলে মিলে চেপে ধরলো নরেন-বাবুর স্ত্রীকে।—কই, উত্তর দাও শীগগির। ছেলের নতুন মা কি তো বলছেন।

লজ্জায় ও বিরক্তিতে অপ্রস্তুত নরেনবাবুর স্ত্রী ছটফটিয়ে উঠলেন।—আমি ওর সঙ্গে কথা টথা বলতে পারবো না বাবা। পুঁটি তুই গিয়ে খোকাকে নিয়ে আয়।

আগত্যা ওভ্যার্সিয়ার বাবুর মেয়ে পুঁটি, আটবছর বয়সের একটা বোকা বোকা খুকী, সেই এগিয়ে গেল।

ধনিয়া সিধের জন্য দাঁড়িয়ে আছে। ততক্ষণ সকলেই উকি ঝুঁকি দিয়ে দেখতে থাকে। এতখানি পথ হেঁটে এসেছে মেয়েটা, তবু পা দুটো পরিষ্কার। ধুলো ময়লা যেন পিছলে ঝরে গেছে।

কেউবা বেফাঁস বলে ফেলেন।···মাগির হাত দুটো কী নিটোল। আর তাগাটা যেন গায়ের মাংসের ওপর রূপোদিয়ে একেবারে আঁকা!

খিড়কির দোর দিয়ে ধনিয়া অদৃশ্য হতেই পেছনের কৌতুহলী দৃষ্টিগুলি যেন শান্ত হলো। মাষ্টারের বউ নাকিয়ে নাকিয়ে দু'তিন বার শিউরে উঠলেন।—আমি আর লাল সায়া পরছি না বাবা। এ জন্মে নয়। আজ থেকে ইতি।

দুপুরে দেখা যেত, ঘরের বাইরে একটা মোড়ার ওপর বসে ধনিয়া তামাক টানে। অদূরে ঘাসের ওপর চরন্ত ছাগলটার সঙ্গে স্নেহাপ্লুত স্বরে ডাকাডাকি, উত্তর প্রত্যুত্তরের পালা চলতে থাকে।

কিন্তু কদিন থেকে ধনিয়াকে আবার দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। আমড়া তলার মেটে ঘরের দরজায় কুলুপ লাগানো। ধনিয়ার ছাগল বাঁধা রয়েছে নালার ধারে আর একটি কুঁড়ের সামনে, বুড়ো প্রসাদী ডোমের ঘর।

আশি বছরের মত বয়স হয়েছে প্রসাদীর। আঠার বছর বয়সে কালাপানি হয়েছিল একবার ডাকাতির দায়ে। তারপর ছাড়া পেয়ে আরও পাঁচবার জেল খেটেছে চুরির জন্য। মোট বিয়াল্লিশ বছর জেলের ভাত খেয়েই জীবন কেটেছে তার। বাইরে এসে রোজকার ক'রে ভাত খাবার রীতিনীতিই সে ভুলে গিয়েছিল। কিন্তু শেষে একেবারে বসিয়ে দিল তাকে। ঝড়ে গাছ চাপা পড়ে কোমরটা ভেঙে গেল, আর সোজা হলো না।

তার ওপর এল শরীর ছাপিয়ে বয়সের জরা। প্রসাদী শুধু টিকে রইলো মরবার জন্য। এখন ওকে দেখলে মনে হয় মূর্তিমান একটা ক্ষুধা হাঁ করে রয়েছে। ছাগলটা ছাড়া প্রসাদীই হলো ধনিয়ার একমাত্র পোষ্য। দিনের রান্না শেষ করে ধনিয়া রোজ একথালা ভাত প্রাসাদীর ঘরে পৌছে দিয়ে আসে। এই জন্যই বোধ হয় ওর মরতে যা কিছু দেরী হচ্ছে।

প্রসাদীর ঘরের সামনে ধনিয়ার ছাগল। এদিকে জেনানা হাসপাতালে সন্ধ্যার আলো জ্বলছে। ধনিয়ার বেড ঘিরে নার্সদের ভীড়। সকলের মুখে একই অনুনয়।—অন্ততঃ এই বাচ্চাটাকে সঙ্গে রাখ ধনিয়া।

—না মিস্ বহিন, পারবো না।

লেডি ডাক্তার।—তোমার বদনামের কথা কে না জানে? চাপা দিতে তো আর পারবে না। তবে নিজের বাচ্চাকে নিজে রাখ না কেন?

—না ডাক্তারনীজী, আমি খাওয়াতে পরাতে পারবো না। ছেলে কষ্ট পাবে আর বড় হয়ে আমার দুসমন হবে। ছেলেকে মানুষ করার মত পয়সা আমার নেই।

—কী বলছিস পাগলের মত। ভিখিরি মেয়েগুলোও ছেলে ছেড়ে দেয় না। ওদের বুঝি পয়সা খুব বেশী।

—ওরা ছেলেকে মানুষ করে না বহিন, ওরা ছেলেকে ভিখিরি করে। আমি তা পারবো না।

—আচ্ছা, আমরা সকলে কিছু কিছু চাঁদা দেব। ছেলে নিয়ে যা সঙ্গে।

—তা হলে আপনারাই কেউ ছেলেটাকে ঘরে নিয়ে যান না। আমি তো আপনাদের আয়া হয়েই থকেবো।

লেডি ডাক্তার আর নার্সেরা বেশী বিতর্কে মন দেয় না। ধনিয়ার চোখের দিকে তাকাতে ওদেরও কেমন গা ছম্ ছম্ করে। সেবা মমতাকে তারাও ভাড়া খাটায়, কিন্তু ধনিয়ার এই প্রশান্ত নিস্পৃহা বড় নির্মম ও বিসদৃশ মনে হয়।

—আদাব। আমি চলি এবার।

ধনিয়া উঠে দাঁড়ায়। একজন নার্স ধনিয়ার বেবিকে বেড থেকে ফ্লানেলের টুকরোয় জড়িয়ে কোলে তুলে নেয়—নার্সারীতে চালান করা হবে। ধনিয়ার সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, কাঁসার থালা আর ঘটিটা একটা তোয়ালেতে বেঁধে, হ্যারিকেন লণ্ঠনটা হাতে নিযে সে উঠে দাঁড়ায়।

আর একজন নার্স রেজিস্টার নিয়ে আসে। লেডি ডাক্তার জিজ্ঞেস করেন।—বাচ্চাকা বাপকা নাম?

ধনিয়া। —তা জানি না।

লেডি ডাক্তার রেগে উঠলেন।—বারবার তোমার ঐ এক কথা। যার সঙ্গে আজকাল থাক, তারই নাম বলো না কেন?

—অনেকের সঙ্গেই থাকি, তার মধ্যে অনেকের নামও জানি না। কসুর মাপ করবেন ডাক্তারনীজী, যে কোন একটা নাম লিখে নিন।

—তোমার ভবিষ্যৎ খারাপ। খুব খারাপ।

লেডি ডাক্তার রাগ করে উঠে চলে যান।

মেলট্রেন নয়াবাদ ষ্টেশন ছেড়ে তখন সিটি বাজিয়ে জোরে স্পীড নিচ্ছে। হাসপাতালের ইমারতটা কাঁপছে দুরদুর করে। লাল কম্বলটা গায়ে জড়িয়ে ধনিয়া নেমে যাচ্ছে সিঁড়ি ধরে। কী রকম একটা দুর্বলতায় নার্সদের চোখের দৃষ্টিও ঝাপসা হয়ে আসে।

ফটক পার হতেই দারোয়ান ঘণ্টা দিল। রাত নটা।

বছরের পর বছর ঘুরে গেছে। ধনিয়ার আমড়াতলার জীবনে কোন ছেদ পড়ে নি। বছর তিন আগে শুধু শেষবার জেনানা হাসপাতালে যেতে হয়েছিল।

নয়াবাদ মিউনিসিপ্যালিটি জাঁকিয়ে উঠেছে। নতুন টাউন বাড়ানো হয়েছে প্লান করে। উকিলবাবু যে গাড়ি কিনলেন তারই নম্বর পড়লো সাতশো একচল্লিশ।

পাঁচ সাত দশ বার ষোল আঠারো—বছরের পর বছর ভেসে গেছে। ধনিয়া প্রায় চল্লিশের কোঠায় পা দিল। মাঝে মাঝে সড়কের ধারে খোলা উনুন জেলে বসে—তেলেভাজা বেচে। সন্ধ্যের দিকে ঘরে ফেরার পথে কুলিরা কিছু কিছু কেনে। এক আধ ঝুড়ি ঘুঁটেও তৈরী করে কখনো, সব বিক্রী হয়ে যায়। চেহারায় হয়তো জলুসের অভাব, তার চেয়ে পয়সার অভাব বেশী। আমড়াতলায় ক্বচিৎ কোন রাত্রে লোকের গলার স্বর শোনা যায়। কিন্তু শরীর আছে, স্বাস্থ্য আছে। ধনিয়া তাই ভয় পায় না। সে জানে তাকে ভিক্ষে করতে হবে না।

ভদ্রসমাজে ধনিয়ার আনাগোনা ঘুচে গেছে অনেকদিন। সন্তানবতীদের স্বাস্থ্য হয়েছে ভাল। বুকের দুধ খাওয়াবার ঠিকে নেই। তা ছাড়া সাগর পার থেকে ধনিয়ার বহু নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী এসেছে—হবেক রকমের বিলিতি ফুড। এঁড়েলাগা নবজাতকদের ধুকপুকে আয়ু ভিজিয়ে রাখতে ধনিয়ার আর ডাক পড়ে না। তাকে বোধ হয় সকলে ভুলেই গেছে।

বড়দিনের ছুটি। পাটনার স্কুলকলেজগুলি বন্ধ। ছেলেরা ঘরে ফিরেছে। শিকার পিকনিক কার্ণিভাল আর প্রদর্শনীর মরসুম। নয়াবাদের ধমনী বিচিত্র উৎসাহে চঞ্চল। সেদিন ধনিয়ার ঘরে উনুনে আগুন পড়লো না। একটিও পয়সা নেই হাতে। অনেকদিন আগের ঘটনাগুলি, নানা রঙে রঙীন একটা মায়াময় আলেখ্য তার চোখের সামনে ফুটে উঠলো।

ধনিয়া উঠলো।—বাবুদের বাড়ী বাড়ী একবার দেখা করে আসি। একদিন তো চাকরি করেছি।. পরবীর দাবী করা যেতে পারে। যদি খুসী মনে দেয়—দশটা টাকাও যদি ওঠে।

নরেনবাবুর বাড়ীর অন্দরে ঢুকতে পেল না ধনিয়া। ঘোষালবাবু চার আনা দিলেন। ধনিয়া দেখলো—বাড়ীময় ছেলেপিলে। ছেলেগুলো বেশ ঢ্যাঙা হয়ে গিয়েছে।

আর একটা বাড়ী। একটা নিষেধের কঠোরতা এখানে নেই। কিছু সিদে দিয়ে গিন্নিমা বললেন।—যা পাবার পেলে বাছা, এবার ওঠ শীগগির!

ধীরেনবাবুর বাড়ির দেউড়িতে এক ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকার পর ঝি এসে একটা টাকা হাতে দিল।—মা দিয়েছেন, এই নিয়ে বিদেয় হও।

ধনিয়া বলে—এ ঝি দিদি, তোমাদের বড় ছেলে কই ?

ঝি কিছুক্ষণ সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে থেকে বললো।—ঐ যে তাস ফেলছে। তা, এত খোঁজে দরকার কি তোমার ?

—উঃ, কত বড় হয়ে গেছে। দাঁত ওঠার পরও মাই ছাড়তে পারে নি। একবার কামড়ে দিয়ে আমাকে কী নাকাল করেছিল, মনে আছে তো ঝি ?

—আদিখ্যেতা ভাল লাগে না বাপু। তুমি যাও। এদিকে ঘেঁসতে আর এস না।

আরও অনেক বাড়ী বাকি আছে। কিন্তু একটা ঘটনা ধনিয়াকে ভাবিয়ে তুললো। এটা তো ঠিক পরবী পাওয়া হচ্ছে না। একেই বোধ হয় ভিক্ষে বলে।

ভিক্ষে ? সন্ধ্যে হতে দেরী আছে। ধনিয়া তবু জোরে পা চালিয়ে ঘরের দিকে ফিরে গেল।

কিন্তু জের সহজে মিটলো না। ঘরে ঘরে ঝি আর গিন্নিদের আপত্তির কলরব শোনা গেল।—ও রাহু, আবার এতদিন পরে উদয় হলো কোথা থেকে ? পাড়াভরা সব আইবুড়ো ছেলে। মাগী যে কখন কার সর্বনাশ করে বসে কে জানে।

কর্ত্তারা শুনলেন। একেবারে বাজে আশঙ্কা নয়। পাড়া ঘেঁসে এসব জীব থাকা উচিত নয়। ওরা থাকলেই যত গুণ্ডা বদমাসের উপদ্রব ডেকে আনে।

ক্লাবের সান্ধ্যবৈঠকেও বিষয়টা আলোচিত হলো। প্রস্তাবটা সকলেই অনুমোদন করলেন : দুর্গাবাড়ীর কাছাকাছিই আমড়াতলার ও নোংরামি এবার সরিয়ে দেওয়াই উচিত।

ব্যাণ্ডের শব্দ। ধনিয়া হাতের হুঁকোটা নামিয়ে রেখে দাঁড়ালো। মিশন অনাথালয়ের ছেলেরা মার্চ্চ করে বনভোজনের উৎসবে যোগ দিতে চলেছে ? নীল ব্লেজারের হাফ প্যান্ট আর সাদা ফ্লানেলের সার্ট। পায়ে লাল মোজা আর বুট। পাঁচ থেকে ষোল বছর বয়স, অন্নপুষ্ট কিশোর মানুষের একটা পল্টন। শোভাযাত্রার আগে আগে ওদেরই ব্যাণ্ড পার্টি। এদের পোষাক একটু ভিন্ন ধরণের। মাথায় ভেলভেটের টুপি, তাতে সাদা পাখির পালক আর কচি ঝাউপাতা পিন দিয়ে আঁটা ! নধর অধরে ছোট ছোট ব্যাগপাইপের রীড। ছোট ছোট ড্রাম ষ্ট্রাপ দিয়ে বুকের ওপর ঝোলানো।

বড়দিনের প্রভাত সূর্য্যের আভা সবে মাত্র কুয়াসা ঠেলে পথে মাঠে লুটিয়ে পড়েছে। শোভাযাত্রা এসে মোড়ের কাছে একবার থামলো। ব্যাগপাইপ আর ড্রামগুলি তিনবার শব্দের ঝনৎকার তুলে শুদ্ধ হলো। আশ পাশ থেকে পিল পিল করে ছেলে মেয়ে বুড়ো—কৌতূহলী একটা জনতা এসে ওদের চারদিকে ঘিরে দাঁড়ালো।

ধবধবে সাদা আলখাল্লা আর প্যান্টালুন পরা এক পাদরী সাহেব ডেভিডের একটা গাথা হিন্দীতে সুর করে পড়লেন।

—আমেন!

ছেলেদের গলার স্বর। বনান্ত বাতাসের শব্দ, ঝর্ণার শব্দ—ভোরবেলায় পাখির গলার কাকলির মত শব্দ। ধনিয়ার যেন একটু চমক লাগলো। এগিয়ে গিয়ে শোভাযাত্রার কাছাকাছি দাঁড়ালো, একটা গাছে ঠেস দিয়ে।

লম্বা দাড়িওয়ালা পাদরীগুলোকে দেখতে কেমন একটু ভয় ভয় করে। একজন পাদরী বক্তৃতা করলেন. বুকের ওপর ক্রুশটা চিক্ চিক্ করছে।—আজ থেকে উনিশশো চল্লিশ বছর আগে বেটেলহামের আকাশে এমনি এক সকাল বেলায় লাল সূর্য উঠেছিল। এক দরিদ্র ছুতোর নারীর কোলে মানবপুত্র আবির্ভূত হলেন।

পাদরীর বক্তৃতার মাথামুণ্ডু কিছু বোঝা যায় না। ধনিয়া একটু সরে দাঁড়ালো, যাতে ছেলেদের মুখগুলি স্পষ্ট দেখা যায়।

—সেই মানবপুত্র একদিন কাঁটার মুকুট পরে চলেছেন জেরুসালেমের পথে, নিজেকে বলিদানের জন্য, তোমার আমার পরিত্রাণের জন্য…।

ধনিয়ার চোখের দৃষ্টি তখন অদৃশ্য চুম্বনের মত প্রত্যেকটি ছেলের মুখের ওপর ছোঁ মেরে ফিরছে। এর মধ্যে অন্ততঃ ছটি তারই উপহার। কিন্তু কে তারা চেনবার উপায় নেই। ঐ ড্রামবাজিয়ে দশ বছর বয়সের ছেলেটি সার্টের আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে। হয়তো সেই একজন। কিম্বা পাশেরটিও হতে পারে। কিন্তু কে নয়? মনে হচ্ছে সবাই।

কিসের ভাবে যেন দাঁড়িয়েছিল ধনিয়া। জনতা কখন সরে গেছে। দূরে বনের মাথায় কুয়াসা গেছে গলে। মাঠের মাঝ দিয়ে চলেছে শোভাযাত্রা। ধুলো উড়ছে। সকল পার্থিবং রজঃ মধুময় হয়ে উঠেছে।

গাছের ঠেস ছেড়ে দিয়ে অতি অবসন্নভাবে ধীরে ধীরে ধনিয়া ঘরের দিকে ফিরলো। অগাধ এক ক্লান্তি ও পুলকের বন্যা যেন সমস্ত শরীর ছাপিয়ে বয়ে চলে গেছে—প্রিয়সঙ্গসুখের চরম ক্ষণে উৎসারিত সজলাসারের মত। বুকের ওপর আঁচলটা ভাল করে টেনে নামিয়ে দিল ধনিয়া। কাঁচুলি ভিজে গেছে।

মিউনিসিপাল কমিশনারদের বৈঠক। কোতোয়ালী অফিসারের কাছে জরুরী নোট পাঠানো হলো।—সহরের নানা ভদ্রপল্লীতে কতগুলি নষ্টচরিত্র ছোট জাতের মেয়ে প্রচ্ছন্নভাবে কুৎসিত ব্যবসায়ে লিপ্ত রয়েছে। তাদের যেন সেগ্রিগেট করে বাজারের লাইনে বসিয়ে দেওয়া হয়।

কড়া সরকারী নির্দ্দেশ। টাউন থানার পুলিশের ওপর ভার পড়লো। এই ধরনের দুষ্টা মেয়েদের নামের লিষ্ট দাখিল করতে—খাতায় নাম চড়িয়ে সকলকে বাজারের লাইনে বসিয়ে দিতে।

ধনিয়ার আমড়াতলার সংসারেও এ নির্দ্দেশের আঘাত এসে পৌছতে দেরী হলো না।—আর এভাবে চলবে না। হয় সরে পড়, নয় পথে এস—কিম্বা সুপথে থাক।

ধনিয়া সাধ্যসাধনার ত্রুটি করলো না। ঘটিবাটি বেচে টাউন পুলিশকে নগদ ত্রিশ টাকা পান খাবার খরচ দিতে রাজী হলো। তাকে রেহাই দেওয়া হোক্। কনেষ্টবলেরা মানলো না কেউ—এবার আর ফাঁকি নেই। আমাদেরও চাকরির ভয় আছে। নাম তোমাকে লেখাতেই হবে।

হেড কনেষ্টবল ধমক দিলো,—ওসব ফন্দী ফিকির ছাড এবার। নাও, টিপ সই দাও।

রাত্রি হয়েছে। প্রসাদী দোপাদ্ধ হাঁটুতে মুখ গুঁজে আগুনের ধুনীর সামনে বসেছিল ধুনীর আগুন ঠাণ্ডা হয়ে এসেছে। কানের কাছে ঘেউ ঘেউ করছে কুকুরটা। প্রসাদী কানে শুনতে পাচ্ছে না কিছু। বাঁ পায়ের কড়ে আঙুলটা একটা জলন্ত অঙ্গারে লেগে ঝলসে গেছে। তবু কোন জালা নেই। সকাল থেকে শরীরটা শুধু সির্ সির্ করে কেঁপেছে। এখন সে স্পন্দনও নেই। আজ দুদিন ধরে ধনিয়া আসছে না। পেটে এক দানাও ভাত পড়েনি।

—প্রসাদী চাচা। ধনিয়া এসে ফুঁপিয়ে কেঁদে পড়লো। প্রসাদী তবু সাড়া দিল না। ধনিয়া বুড়োকে একবার জোরে ঝাকানি দিয়ে থুতনিটা টেনে ওঠালো। বুড়ো চোখ মেলে তাকাতেই আবার ডাকলো।—প্রসাদী চাচা।

ধনিয়া কাঁদছে। এ কান্নার বেদনা বিদ্যুতের ছোঁয়াচের মত প্রসাদীকে যেন আঘাত করলো। ধড়ফড়িয়ে উঠলো শরীরটা।—এ কি? তুই ধনিয়া?

—হঁা চাচা। আমার জাত নেই, আমি নাকি রাণ্ডী!

—ছি ছি, এ কি বলছিস?

—হা চাচা, আমাকে নাম লেখাতে হয়েছে। কাল থেকে বাজারে থাকতে হবে।

—আরে না, তুই তো লছ্মী।

—না চাচা, আমার স্বামী নেই।

গাইগরুরও স্বামী নেই, তারা কি লছ্মী নয়?

—তা বললে চলে না, আমি তো গাই নই। আমি মানুষ।

ধনিয়া হঠাৎ উঠে দাঁড়ালো —এবার চলি চাচা, আর দেখা হবে কিনা জানি না।

অপোগণ্ড ছেলের মত প্রসাদী একবার তার ক্ষুধার্ত্ত দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলো,

থনিয়ার হাতে সেই পরিচিত গামছাবাঁধা ভাতের থালাটা নেই, তার নিত্যদিনের প্রাণের পসরা। প্রসাদী হয়তো কিছু বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু বাক্‌স্ফূর্তি হলো না। মূক অভিমানে যেন হাঁটুর ভেতর আবার মাথাটা গুঁজে দিল। আর একবার নতুন করে কানের কাছে বেজে উঠলো কুলহারা কালাপানির উতরোল।

দাঁড়িয়েছিল ধনিয়া। আনমনে মাথার কাপড়টা ফেলে দিয়ে এলো চুলে গুছিয়ে শক্ত করে একটা খোঁপা এঁটে দিল। আঁচল দিয়ে তেলা মুখটা মুছে নিল একবার। তারপর সেই চিবকেলে মিটিমিটি হাসি আবার সারা মুখে চিক চিক করে উঠলো।

—তুমি রাগ করেছ চাচা! ধনিয়া আস্তে আস্তে এগিয়ে এসে অসহায় অসাড় প্রসাদীর জরাজর্জ্জর শরীরটাকে বেডালেব ছানাব মত কোলের ওপর তুলে নিল। কাঁচুলি খসিয়ে প্রসাদীর মাথাটা চেপে ধরলো বুকের কাছে। আঙুল দিয়ে বুড়োর মাথার পাকা চুলের জট-গুলি ছাড়িয়ে দিতে লাগলো আস্তে আস্তে।

একটি ঘণ্টা পর। পরিতৃপ্তির আরামে ঘুমিয়ে পড়েছে প্রসাদী। ক্লান্ত সিক্ত চোয়াল দুটো এলিয়ে পড়েছে। প্রসাদীকে ধুনীর কাছে মাটিতে শুইয়ে দিল ধনিয়া।

চকবাজারের দক্ষিণে একটা চওড়া গলি, দুদিকে দোতলা বাড়ীর সারি। গলির ঠিক মাঝামাঝি পথের দুদিকে মুখোমুখি একটা দেশী আর একটা বিলাতী মদের দোকান। নীচেব তলার সব ঘরগুলিই দোকান—পানবিড়ি, সরবত, আতর, চাট আর চামেলী তেল। একটা দোকানে ভাঙা তবলা পাখোয়াজ মেরামত হয়। পথের মাঝে একটা গাছতলায় শানবাঁধানো চাতালের ওপর হিজড়েরা হাততালি দিয়ে নাচে। ওপরতলার জানালাগুলি সন্ধ্যের পর থেকেই এক এক টুকরো বায়স্কোপের পর্দ্দার মত আলোয় ঝলমল করে। রূপের বেসাতিনীদের লাইন।

নতুন বছরে দোতলার লাইনে একটা নতুন ঘরের জানালা খুলে গেল।

চল্লিশ বছরের আগুনে শুদ্ধ করা জীবন যৌবন, তার সব খাদ পুড়ে শেষ হয়ে গেছে। ধনিয়া মনের মতো করে সাজলো।

ঘরের ভেতর ঝাড়ের আলোটা জ্বালিয়ে দিয়ে, চুড়ো করে খোঁপা বাঁধলো। একটা সোনালী চুম্‌কিদার রুমাল জড়িয়ে দিল তার ওপর। ঝুটা মোতির মালা দিল গলায়। একটা পাতলা নীল রেশমী সাড়ীকে সারা ছাড়াই কোমরে এক পাক জড়িয়ে দিল মুঠো মুঠো পাউডার ছিটিয়ে দিল গায়ে। কড়া জরদা দিয়ে একগাল পান চিবিয়ে ঠোঁট মুখ রক্তাক্ত করে নিল। এক পেয়ালা নির্জ্জলা দেশী মদ ঢক ঢক করে খেয়ে গরম করে নিল গলাটা। সবুজ মখমলের কাঁচুলি বাঁধলো আঁটসাট করে। হাফগরাদ জানলাটার ওপর কনুই রেখে সামনে ঝুঁকে স্থির হয়ে দাঁড়ালো ধনিয়া।

ময়রার দোকান থেকে ধোঁযা আর ভাজা পাঁপরের গন্ধে শীত-রাত্রির বাতাস ভারি হয়ে গেছে। নীচের সড়কে গ্যাসপোষ্টের কাছে ক্ষুদ্র একটা জনতা, হাঁ করে জানালার দিকে তাকিয়ে।

হোক রাত্রি, হোক নেশা আর গ্যাসলাইটের পোড়া জ্যোৎস্না। ওদের ঠিক চিনতে পারা যায়। লম্বা চেহারা ঘোষালবাবুর বড় ছেলেটা ঘনঘন সিগারেটের ধোঁয়া ছাড়ছে। চোখে চোরা চাউনি খাজাঞ্চীবাবুর ছেলেটা, রুমাল নেড়ে কিছু একটা ইসারা করার চেষ্টা করছে। টলতে টলতে একটা মাতালও এসে দাঁড়ালো ওদের মধ্যে। হাতের মুঠো দুটো একটা চোখের ওপর দূরবীণের মত লাগিয়ে কিছুক্ষণ তাক্ করে ঠায় দাঁড়িয়ে রইল মাতালটা।

এক ঢোক পানের পিক গিলে নিল ধনিয়া। কানদুটো তেতে ঘেমে উঠেছে। আঁচলটা গা থেকে পেছনে ঠেলে নামিয়ে দিল। দুহাত তুলে মাথার ওপর জানালার খিলানটা ধরে বুকটা সামনের গরাদের ফাঁকে জোরে চেপে ধরলো ধনিয়া।

জনতার চোখে ধাঁ ধাঁ। অসম্বৃতা এক রঙীন মরীচিকার মূর্ত্তি জ্বলছে জানালার ওপর। নীচে পাতলা রেশমী সাড়ীর আড়ালে আঁকা দুটি সুপুষ্ট জঙ্ঘার ছায়াময় লোভানি। ওপরে একজোড়া দুরন্ত সবুজ গ্রহ, কাঁচুলির বন্ধনে চিরকালের মত গতিহারা।

সর্ব্বাঙ্গ ছাপিয়ে এক বিদঘুটে আনন্দের জ্বালায় অস্থির হয়ে উঠলো ধনিয়া। তবু প্রতীক্ষায় শান্ত হয়ে থাকে। সে আজ দাঁড়িয়ে থাকবে মাঝরাত্রি পর্যন্ত, শেষরাত্রি পর্যন্ত—যতক্ষণ না তার নতুন জীবনের প্রথম বাবু দোরে এসে কড়া নাড়বে, তার নতুন নাম ধরে ডাকবে।

ন তস্থৌ

অদ্ভুত সমন্বয়। যেমন উপাধ্যায, তেমনি তাঁর জমিদারী আর খামার, বিষ্ণু-মন্দিরটাও তেমনি। সবই জরাজীর্ণ।

ষাটের ওপর বয়স হয়েছে উপাধ্যায়ের। গায়ের শিরাগুলি যজ্ঞসূত্রের জালের মত কাঁধ বুক পিঠ ও পেটের ওপর ছড়িয়ে থাকে। এককালের সুগৌর লম্বা শরীর এখন বেঁকে কুঁজো হয়ে গেছে। একটা চোখে ছানি। গলার চামড়াগুলি গলকম্বলের মত ঝোলে। গবদের ধুতি শক্ত গেরো দিযে কোমরে বাঁধা, উঠতে-বসতে তাল থাকে না, কাছা কোঁচা খুলে যায়। লাঠি ভর দিযে দাঁড়িযে থাকে, দেখে মনে হয়, একটা নেড়া শ্বেতচন্দনের গাছ কাৎ হয়ে রযেছে। একটু নড়ে উঠলেই ভুর ভুর করে সুগন্ধ ছড়ায়।

জমিদারী তথৈবচ। ছাব্বিশটা গ্রাম নিয়ে এত বড কল্যাণঘাট মৌজা। এক-একদিন সূর্য ডোবে আর মুহুরী কালাচাঁদ খবর নিযে আসে, অমুক নম্বরের লাট নিলামে বিকিয়ে গেল বকেযা খাজনার জন্য। তারপর আর একদিন আব এক নম্বরের।

খামারও তাই। মবাইয়ে এককণা দানা নেই। গোলাঘরেব মটকীগুলো চামচিকে আর ইঁদুরের বিষ্ঠায ভরা। বাঁশেব বিরাট চাঙারিগুলোতে মরা আরশুলা।

খেতের দশা আর বলা যায না। এঁটেল মাটি, বছবে সাত মাস জল খায় না। লাঙালের ভোড ফেরে না, মই দিলে ঢেলা ভাঙে না। পিলেপেটা বাউরী চাষী, হাই তুললে প্রাণবায়ু কাঁপে। জিরজিরে হাতে লাঙলের মুঠি ধরে, মুখ থুবড়ে পড়ে। নিড়েনে বসলে কোমর টাটায়।

বাথানে গোবর নেই। গরুগুলোর হাড মোটা, পাছা সরু, সোজা শিং, পালন ছোট। খোল খড জাউ পায় না। ক্ষিদের পেটে ওলের মুখী চিবোয়, শুয়ে শুয়ে ধোঁকে আর জাবর কাটে। বাছুরের গা চাটে না, গুঁতিয়ে সরিয়ে দেয। বাঁটে দুধ নেই; জোরে টানলে শিরা ফাটে, রক্ত ফোটে।

জরাজীর্ণ শ্রীহীন কল্যাণঘাট মৌজা। মাঝে মাঝে নর তালগাছের বন, ফল হয় না, জটা ধরে। চাষীরা মাঠান ফসলের বীজ ছড়ায়, অর্ধেক বীজ ফুলায় না। শিরকাঠি ভেঙে পড়ে। মাটিতে জো নেই, ভাদুই ফলে তো রবি ফলে না, আউশ হলে আমন নয়। ফলের গাছে গাছে ছাতা ধরে, গাছের পুষ্টি শোষে ছাগলনাদির দল।

জলাগুলিতে জল নেই, খোঁড়া মোষেরা কাদা মাখে। বিলভরা শুধু কচ্ছপ, শোল থুকচেলী—রাজকাঁকড়া, ল্যাঠা আর চাপাবেলে। মাছগুলির মাথা বড়, ধড় ছোট, বেঁড়ে বামন চেহারা।

লঙ্কা ক্ষেতে মড়ক লাগে। লাল সূর্যমণিরা ঝাঁকে ঝাঁকে ঝরে পড়ে মরা ফড়িংয়ের মত। শ্রাবণের জলে গাছ ষাঁড়িয়ে যায়, জ্যৈষ্ঠের খরানিতে নেতিয়ে পড়ে—অঙ্কুর চোখ কল পোয়া রোগ, সবই পুড়তে থাকে। কল্যাণঘাটের মাটিতেও ঘুণ ধরে গেছে।

সপ্তাবরণ বিষ্ণুমন্দিরের বিস্তীর্ণ ভগ্নস্তূপ। প্রাচীরগুলো ভেঙে চুরে গড়িয়ে গেছে প্রান্তরের ঢালু ধরে নদীর খাত পর্যন্ত। ভাঙা ইট-পাথরের স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে দেখা যায় বেনমতীর জলে রোদ আর কুয়াশার খেলা। সব ভেঙেছে, আছে শুধু বিমান গৃহটি। তবে নামমাত্র থাকা, ফাটল ধরেছে অনেকদিন।

বিমান ঘর ছেড়ে এগিয়ে গেলেই মনে হবে যেন শশ্মানে নামা হ'ল। ভগ্ন বিগলিত ও বিলুণ্ঠিত সব পাথরের মূর্তি। কেউ প্রোথিত পীঠচ্যুত, কেউ ধুলোয় ঢাকা। মাঝে মাঝে সেঁয়াকুল আর কামরাঙার বন। এক বিরাট দেবভূমির যত বিমানপাল, হবিরক্ষক আর কিন্নরমিথুনের জীর্ণ অস্থিমালা, পঞ্জর আর করোটি পিণ্ডীকৃত হয়ে রয়েছে। সে নিত্যাগ্নিকুণ্ডে এখন খুঁজলে একটুকরো অঙ্গারও আর পাওয়া যায় না। হোমস্থানে হবিচিহ্ন নেই, আছে বিছুটির ঝাড়। কত শত বৎসর ধরে কল্যাণঘাটের এই শ্মশান-প্রান্তরে পরিবার দেবতারা ঘুমোচ্ছে। এক অমোঘ পরিণামের ঝঞ্ঝাবাত দেবসংসারকে ছিঁড়ে দিয়ে চলে গেছে। ক্ষয়ে গেছে ক্ষয়ে যাচ্ছে। রাত্রিতে শুধু বিমানঘরে একটি বাতি জ্বলে। প্রথম যাজকের বংশধর বুড়ো উপাধ্যায় জেগে আছেন বিনিদ্র শ্মশানপালের মত।

কোন্ অভিশাপের রোষে জতুগৃহের মত ছাই হয়ে গেল এই শিলাময় শিল্পবিভূতি ? প্রদক্ষিণ পথের ওপর শুধু ঠেসে জমে আছে কাদার পিণ্ড। দেবতাদের মাথার নাগছত্র আর দেবীদের প্রভামণ্ডল যুগ যুগ ধরে ভিজে শুকিয়ে ধুলো হয়ে উড়ে যাচ্ছে। রাকা, অনুমতি, জয়া, অম্বা, ক্ষমা, জয়ন্তী আত্মগোপন করেছে বুনো ফুলের ঝোঁপঝাঁপের আড়ালে— অভিমানিনীর মত মুখ লুকিয়ে, এ অবহেলা আর সইতে পারে না। খঞ্জ, কবন্ধ ও ছিন্নবাহু আয়ুধপুরুষেরা প্রান্তরের কাঁটাবন আর কাঁকরের শয্যায় লুটিয়ে রয়েছে। কামিনী আর ব্যজনীদের সে অভঙ্গ ঠাম এখনও নষ্ট হয় নি, কিন্তু হাতের চামর ছিঁড়ে গেছে নিশ্চিহ্ন হয়ে। প্রধান দ্বারী প্রচণ্ডের মূর্তিটা অনেককাল হলো গড়িয়ে উধাও হয়ে গেছে বেনমতীর স্রোতে। সঙ্গীহারা চণ্ড শুধু একা পড়ে আছে কাৎ হয়ে, ফাটল ধরে চৌচির হয়ে গেছে তার সমস্ত শরীর।

কোথায় সেই সুউচ্চ শুকনাসা শিখর আর বলয়িত আমলক ? শুধু ভগ্নস্তূপ, উচ্ছন্ন

এক দেবতার উপনিবেশ। বিচূর্ণিত স্তম্ভ, কলস, হর্মিকা, শৃঙ্গ। ভগ্ন ও স্খলিত শঙ্খ, চক্র, গদা, খড়্গ; পরশু, অঙ্কুশ, বজ্র! এক শ্লদ্ধ নাগর দেবায়তনেব চূর্ণাস্থি, শুধু মাঠ জুড়ে নুড়ির সমারোহ।

বিমান ঘরে বাতি জ্বলে। কৃষ্ণশিলায় গড়া উত্তমদশতাল ধ্রুবের মূর্তি। বিক্রম-খচিত আয়তস্র বেদীর ওপর ভোগশয়ান চতুর্ভুজ বিষ্ণু। ডানহাতে পদ্ম, বামহাতে কটকমুদ্রা। নীলোৎপল হাতে ভূমিদেবী বসে আছেন বাঁ পায়ের কাছে। একটু দূরে আদিশেষ নাগের বিষাক্ত নিশ্বাসে জর্জর মধু ও কৈটভ, হিংস্র ভ্রূকুটিকুটিল চোখের দৃষ্টি। দক্ষিণশীর্ষ জয়দ বিষ্ণু—গলায় বিলম্বিত বৈজয়ন্তী শোভা, বুকে শ্রীবৎস ও কৌস্তভ ব্যালোল কেয়ূরে, মকরকুণ্ডলে ও করণ্ডমুকুটে শোভিত সৃষ্টিধর। এক বিরাট পাষাণের মহাকাব্য! মন্দির গাত্রের চিত্রার্ধগুলি এখনও অক্ষত—এক-একটি ছন্দোবদ্ধ মহিম্ন স্তব যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে কিছুক্ষণের জন্য।

আরও মানুষ আছে কল্যাণঘাটে। তারা কে যে কোন যুগের লোক বলা দুরূহ। তবু তারা বেঁচে আছে, আর বাঁচতেও চায়।

তারক মিশ্র কন্যাদায়ে পড়েছে। মিশ্রের বউ পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের কাছে দুঃখ করে, নিজেদের মন্দভাগ্যের কথা রটিয়ে বেড়ায়।—গরীবের ঘরে এমন অতি-বাড়ন্ত মেয়ে। দেখতে দেখতে ফেঁপে ফুলে একটা মাগী হয়ে পড়লো। কোন সম্বন্ধই ঘেঁসছে না, কি যে উপায় করি!

বনেদী দু' তিনটি পাত্র ছিল। মিশ্র ঘটক লাগিয়ে অনেক সাধ্যসাধনা করেছে, কিন্তু ফল হয়নি কিছু।

আচার্যিদের কালীপদ, কাব্যতীর্থ পেয়েছে, টোল করে। ফর্সা রোগা রক্তশূন্য চেহারা, শূলব্যাথায় কাতরায়। মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব শুনে মুখ ঘুরিয়ে নেয়। সে চায় এক, নীবারশূকবৎ তন্বী—নীবার ধান্যের শীষের মত তন্বী, তার কবিমন আচ্ছন্ন করে আছে এই রকম একটি মূর্তি। এমন মূর্তি সে কখনও চোখে দেখে নি। তবু আশা ধরে আছে, একদিন হয়তো এ-ধ্যান সফল হবে।

ত্রিবেদীদের ছেলে জগদীশ। কালো বেঁটে চেহারা। জ্যোতিষ পড়েছে, ঠিকুজী লেখে। কাঞ্চনের সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব এক কথায় ফিরিয়ে দিয়েছে। কালীপদর সঙ্গে তর্ক করে জগদীশ তার পছন্দের নমুনা শোনায়। নীলতোয়দমধ্যস্থা বিদ্যুল্লেখেব ভাস্বরা—নীলমেঘের মধ্যে বিদ্যুল্লেখার মত উজ্জ্বল। এই ধরনের কোন মেয়ে পেলে সে বিয়ে করতে পারে। কাঞ্চন—নাম মুখে আনতেই সে হেসে ফেলে। বিষ্ণুমন্দিরের কালো পাথরের অতিকায় দ্বারপালটার পাশেই ওকে মানাবে ভাল।

চক্রবর্তীদের নরহরি। ব্রাহ্মণ হয়েও কবরেজী করে। তবে সেটা তার বৃত্তি নয়;

কারণ চিকিৎসার জন্য সে পয়সা নেয় না। শুধু দান নেয়—আতপচাল ঘি তাম্রখণ্ড রৌপ্যখণ্ড। কাঞ্চনের চেহারাটা মনে পড়তেই মুখ কুঁচকে ওঠে।—ও কি মেয়েমানুষের চেহারা? মেয়েমানুষ হবে সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব।

সময় পেলেই নরহরি বনবাদার চুঁড়ে বেড়ায়। মন্তর আউড়ে খুঁজতে থাকে আসল হস্তিকর্ণপলাশের গন্ধারুয়ার দুটি পাতা মধুসহ সেবন করলেই শত বৎসর পরমায়ু মৃগেন্দ্র-বিক্রম আর পদ্মরাগকান্তি। তারপর—অনাহতযৌবন এক লাস্যাধারা প্রমদা মূর্তি ওর চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আশ্চর্য্য, এরাও কল্যাণঘাটেরই মানুষ। এদের অতীত গেছে, ভবিষ্যৎ নেই, বর্তমানও অলীক। কৃষ্টিভ্রষ্ট দুর্ভাগারা—না ঘাটের না ঘরের। তবু টিঁকে আছে। বিদ্‌ঘুটে বিশ্বাস আর কল্পনাকেলিতে বেশ মনের আরামে মজে আছে সব। জীবন সরে গেছে বহু দূরে, তার জন্যে কোন দুঃখ নেই।

সব আশা ছেড়ে দিয়ে উপাধ্যায়ও যেন কালস্রোতে নিজেকে ভাসিয়ে দিয়ে বসে-ছিলেন। এ ভাঙন আর থামবে না।

চোখে পড়লো মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন চলেছে কাঁখের ওপর ভরা জলের কলসী চড়িয়ে। জীর্ণ শীর্ণ কল্যাণঘাটের বুকে যৌবনের চলৎ মূর্তি। এই কালো গেঁয়ো মেয়ে, গায়ে জামা নেই, খাট শাড়াতে শরীর জড়ানো, টান করে খোঁপা বাঁধে। যেন প্রতিমা-লক্ষণ মিলিয়ে কেটে কুঁদে গড়া হয়েছে এই নিটোল উৎফুল্ল মূর্তি। কৃশমধ্যা সুগ্রীবা বিপুল-শ্রোণী চারুপীনপয়োধরা—হুবহু মিলে যায়। উপাধ্যায় আশ্চর্য হলেন। এই মেয়ের বিয়ের জন্য মিশ্রের এত দুশ্চিন্তা!

সকাল থেকে উপাধ্যায় আজ নিজের মধ্যে অদ্ভুত রকমের এক চঞ্চলতা অনুভব করছেন। উঠে দাঁড়াতে হবে। রক্ষা করতে হবে এই জমিদারী ক্ষেত খামার মন্দির। বসে বসে এ ভাঙন আর দেখলে চলবে না।

হাতের লাঠি ঘরের কোণে রেখে দিলেন উপাধ্যায়। স্নানের পর শুধু চন্দনচর্চা নয়, মালতী কুঁড়ির একটা মালাও গলায় পড়লেন। গরদের ধুতি আর উড়ুনি একটু গুছিয়ে সাজ করে প'রে নিয়ে, সোজা টান হয়ে দাঁড়ালেন উপাধ্যায়।

মন্দির মণ্ডপের থাম ধরে দাঁড়িয়ে উপাধ্যায় তার দৃষ্টি মেলে দিলেন—মধ্যাহ্নে উজ্জ্বল কল্যাণঘাটের প্রান্তর জনপদ ছাড়িয়ে, বেনমতীর বালুতট পার হয়ে দিগ্বলয় পর্যন্ত। উপাধ্যায়ের উষ্ণ নিশ্বাস প্রশ্বাসে ভাবনার প্রবাহ উঠছে নামছে। সৃষ্টির পথে যেন মূর্তিরা সব ভীড় করে আছে। সুযৌবনা সুরম্যাঙ্গী পীনোবী পীনগণ্ডা। উপাধ্যায়ের আরক্ত কর্ণমূলে বিকেলের রোদ এসে লাগলো। ক্রমে সন্ধ্যা, ছায়া নামলো ধ্বংসস্তূপের ওপর পাখীর কূজন এল থেমে। আকাশে তারা, বেনমতীর জলরোল, ঝাউবনের

উচ্ছ্বাস, অক্লান্ত ঝিল্লীরব—সেই অদ্ভুত শব্দমায়ারৃত জীর্ণ পৃথিবীর বুকে দাঁড়িয়ে উপাধ্যায় শুনলেন সৃষ্টির গুঞ্জরণ। জরা সরে গেছে, তাঁর মূর্তিময় ধ্যানলোকের এক স্বপ্ললনা নেমে এসেছে মাটিতে—মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন!

সকালবেলা শয্যাশায়ী উপাধ্যায়ের পিঠে ও কোমরে কবরেজী তেল মালিশ করতে করতে চাকর রামু অনুযোগ করে বললো—এ বয়সে অনিয়ম কল্লে কি আর সহ্য হয় কর্তাঠাকুর? কাল কি লাফালাফিটাই করলেন! শরীরের গাঁটে গাঁটে চোট লেগেছে খুব।

উপাধ্যায় আস্তে আস্তে বললেন,—আমায় একটু তুলে ধরে বসিয়ে দে তো রামু।

উঁচু বালিসে হেলান দিয়ে বসলেন উপাধ্যায়। চোখের কোলে চামড়ার ওপর লালচে রঙের ঘায়ের মত দাগ পড়েছে। সমস্ত রাত না কঁাদলে এরকম কখনও হতে পারে না। কিন্তু সহজে হঠবেন না উপাধ্যায়। তাঁর প্রতিজ্ঞা শিথিল হয়নি এতটুকুও।

—রামু, কালাচাঁদ মুহুরীকে এখুনি ডাকঘরে যেতে বল একবার। সোমনাথকে জরুরী তার করে দিক—বাবা অসুস্থ, কাজ আছে, অবিলম্বে চলে এস।

একমাত্র ছেলে সোমনাথ থাকে কলকাতায়। পড়ে আর চাকরীর চেষ্টা করে। উপাধ্যায় ভূভারতে একটি মাত্র ঘৃণ্য স্থানের পরিচয় জানেন—কলকাতা। কথায় কথায় বলেন—কলকাতা নয়, ওটা কালসূত্র নরক। জীবনে মাত্র একবার কলকাতায় গিয়েছিলেন। সাতদিনের বেশী টিকতে পারেন নি। ধুলো গোলমাল ভীড়, গাড়ী ঘোড়া—কোনটাই তার কারণ নয়। সে অন্য ব্যাপার।

কলকাতায় এসে প্রথম দিনেই উপাধ্যায়ের চোখে পড়লো শাড়ি পরিহিতা এক মেমসাহেব। দৃশ্যটা বিভীষিকার মত উপাধ্যায়ের মনে ও মস্তিষ্কে চেপে রইলো তিন দিন ধরে। তবুও সহ্য করেছিলেন, কিন্তু ক'দিন পরেই আবার দেখলেন গাউন-পরা এক বাঙালী মেয়ে। সেদিনই কলকাতা ছেড়ে কল্যাণঘাটে ফিরে গেলেন উপাধ্যায়। আর কখনও এমুখো হন নি।

এ হেন কলিকাতায় সোমনাথকে লেখাপড়া শিখতে পাঠাবার সময় বুক কেঁপে উঠেছিল উপাধ্যায়ের। কল্যাণঘন বিষ্ণুর অভয়-মুদ্রার আশ্বাস স্মরণ করে সে দুঃসাহসিক কাজটাও করলেন। এতদিন পরে নিজেই ছেলেকে নিজের কাছে ফিরিয়ে নিলেন। সোমনাথ তার পেয়ে চলে এল কল্যাণঘাটে।

—আমার তো হয়ে এল সোমনাথ। এইবার তোকে দাঁড়াতে হবে। এই জমিদারী ক্ষেত খামার মন্দির, এক কথায় তোর ভবিষ্যৎ। আর তো নষ্ট হতে দেওয়া চলে না।

প্রতিবাদ করলো সোমনাথ।—আমার পড়া আর চাকরীর ভরসাটুকু নষ্ট করে, কলকাতা থেকে ডেকে আনিয়ে শেষে এইখানে আমার ভবিষ্যৎ দেখলেন আপনি? ঘটি ডোবে না, এই সব তালপুকুর নিয়ে আমার হবে কি?

—পুরুষের মত কথা বলতে শেখ। উপাধ্যায়ের মেজাজ গরম হয়ে উঠলো।—কলকাতায় গিয়ে আর কিছু না হোক, মেরুদণ্ডটা হারিয়েছ। ঘটি ডোবে না, ওসব ফাজিল কথা মুখে এন না কখনো।

প্রথম দিনেই বাপছেলের বার্তালাপে একটা মনোমালিন্যের বীজ বোনা হয়ে গেল। দুজনের মাঝখানে আরও বড সংশয়ের কুজ্ঝটিকা দুজনকে আড়াল করে রাখলো। সোমনাথ একটু সতর্ক হয়ে গেল। সেই আশঙ্কাটাই হয়তো সত্য। উপাধ্যায়ও উৎকণ্ঠ হয়ে রইলেন। কলকাতায় গিয়ে সোমনাথের মতিগতি কিছু গোলমাল হয়ে যায় নি তো!

কিন্তু এরকম ভাবে বেশীদিন চলে না। সোমনাথ একদিন দু কান দিয়েই স্পষ্ট শুনলো। উপাধ্যায় বললেন—এইবার তোকে সংসারী হতে হবে। একবার বলবাছুর মত তুই এই ভাঙা সংসারে দাঁড়া বাবা সোমনাথ। সবই তো রয়েছে, কিছুই যায় নি। শুধু দুহাত দিয়ে ঠেকিয়ে রাখতে হবে, যেন আর ভেঙে না পড়ে।

গলাটা একবার কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে উপাধ্যায় একটু বিশদ করেই বলেন—তারক মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন। দেবীর মত সর্বসুলক্ষণা মূর্তি, তোর ঠিকুজি মিলিয়ে দেখছি। তারপর সুবিধে মত একটা দিন স্থির করবো।

সোমনাথ প্রতিবাদ করে না, উত্তর দেয় না। শান্তভাবে সব শুনে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে বসে। সোমনাথের নির্লিপ্ততা উপাধ্যায়কে আঘাত দেয় সবচেয়ে বেশী। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ে কলকাতার ওপর। —ঐ কলকাতা তোমাদের মাথা খেয়েছে, জাত খেয়েছে। যেদেশে ফিরিঙ্গীতে সংস্কৃত পড়ায় আর ভটচার্যি শেখায় ইংরেজী, সেদেশে থাকলে মতিগতি উল্টে যাবে তাতে আর আশ্চর্য্য কি। কিন্তু ওসব চলবে না।

সোমনাথ বাপকে শ্রদ্ধা করতে আর পারছে না। উপাধ্যায়ের এই পিতৃত্বের স্পর্ধাটা একটা প্রেতের হুমকির মত মনে হয়। পাথরের মূর্তিগুলোর মতই নির্বোধ-হৃদয়। ওর স্নেহটাও যেন একটা ব্যাধির আবদার।

রহিল তোমার কোদালী, বনে চলিল বনমালী। সোমনাথের মনে এই রকম একটা বিদ্রোহের ভাব মাঝে মাঝে চাড়া দিয়ে উঠে। কিন্তু নিজেকে শান্ত করে আনে। উপাধ্যায়ের উপদ্রব সহ্য করে যাওয়াটাই শ্রেয়, বুড়ো হাতীর নষ্টামি লোকে যেমন সহ্য করে। শুধু বাকী কটাদিন কোন মতে পার করিয়ে দেওয়া—মরে গিয়েও

কিছু হাড় দাঁত দিয়ে যাবে, যার দাম নেহাৎ নগণ্য নয়। সোমনাথের বাইরের সুবাধ্যতার পেছনে এই রকম কোন মনস্তত্ব হয়তো আছে।

চূড়ান্ত আশঙ্কাটা যতদিন সত্যে পরিণত না হয়, ততদিন চুপ থাকাই ভাল। ভূতে ভর করেছে ক্ষতি নেই, শুধু ঘাড় মটকাবার আগে সরে পড়লেই তো হলো।

উপাধ্যায়ের ঘরের বারান্দায় দুজন সাহেব আর একজন বাঙালী ভদ্রলোক এসে উঠলেন। সোমনাথ এগিয়ে এল। উপাধ্যায় ঘরের ভেতর থেকে সন্দিগ্ধ চোখে উঁকি দিয়ে এক একবার দেখতে লাগলেন।

সোমনাথ এসে জানালো—দুজন ফরাসী আর একজন বাঙালী অধ্যাপক এসেছেন। মন্দিরের ভগ্নস্তূপ একটু ঘুরে ফিরে দেখবেন।

উপাধ্যায় অপ্রসন্নভাবেই বললেন—তা দেখুন, আমার আপত্তি নেই। তবে জুতো খুলে রাখতে বল। আর ফটো তুলতে পারবে না।

সোমনাথ একটু আপত্তি করলো—এই কাঁটা আর কাঁকর ঠেলে ঘুরতে হবে, জুতো থাকলে দোষ কি?

—না, থাকবে না। উপাধ্যায় চাপা গলায় ধমক দিয়ে উঠলেন।

ফরাসী সাহেব দুজন স্তূপ দেখতে বেরিয়ে গেলেন সোমনাথের সঙ্গে। বাঙালী ভদ্রলোক একা বসে রইলেন। উপাধ্যায় আর একবার সন্দিগ্ধ চোখে ভদ্রলোককে দেখে নিয়ে লাঠির ঠেলা দিয়ে দরজাটা ভেজিয়ে দিলেন। সোমনাথ আর সাহেবরা ফিরে এলে প্রশ্ন করলেন,—ও ভদ্রলোক এখানে ঠায় বসে রইল কেন রে?

—উনি হলেন—! সোমনাথ বলতে গিয়ে থেমে গেল।

—উনি কি?

—উনি অপৌত্তলিক।

—তার মানে?

—উনি মূর্ত্তি-পূজো করেন না, ওসব পছন্দও করেন না।

হুঁ। উপাধ্যায় হুঙ্কার চাপতে গিয়ে গলা দিয়ে ঘড় ঘড় আওয়াজ করলেন।

সকালের ট্রেনে এসে বিকেলের ট্রেনে ফিরতে হবে। অতিথিরা নিশ্চয় ক্ষুধার্ত্ত হয়েছিলেন খুব। সোমনাথ তিনথালা খাবার সাজালো।

উপাধ্যায় একটা থালা লাঠির খোঁচা দিয়ে উল্টে দিলেন। বাকী দুটো থালা সাহেব দুজনকে পরিবেশন করে নিজে তাদের সামনে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। সোমনাথ রাগে ও লজ্জায় নিজের ঘরে গিয়ে খিল দিল।

—সর্বস্ব যে লুটে নিল! সোমনাথ ও সোমনাথ! উপাধ্যায়ের বুকফাটা

চীৎকারে সোমনাথ ব্যস্ত হয়ে ছুটে এল। কালাচাঁদ মুহুরী খবর এনেছে, পশ্চিমের মাঠে একটা পাটল রঙের স্তম্ভ দুভাগ হয়ে পড়েছিল। আজ দেখা গেল, তার একটা খণ্ড গোবর্ধনের খিড়কির পুকুরে, কাঁচা ঘাটে পাতা রয়েছে। বাউরী মেয়েরা তার ওপর বসে বাসন মাজছে।

—ফৌজদারী করতে হবে সোমনাথ। আমার পাথর নিয়ে গেছে, আমি ওর মাথা নেব। উপাধ্যায় পাগলের মত চেঁচাতে লাগলেন।

সোমনাথ মনের বিরক্তি চেপে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে।—হুঁ, ফৌজদারী করবে গোর্বধনের সঙ্গে। ঢোঁড়ার তেজ দেখ। গোর্বধন ইচ্ছে করলে যে তোমার মন্দিরের বিগ্রহটা কিনে নিতে পারে টাকার ওজনে।

উপাধ্যায়ের রাগ পড়লো গিয়ে সোমনাথের ওপর। কিছুক্ষণ কলকাতাকে গালাগালি দিয়ে তবে ক্ষান্ত হলেন।

মাঝে মাঝে পিতাপুত্রে অন্য প্রসঙ্গ আলোচনা চলে। তখন মনে হয় মালিন্য যেন দূর হয়ে গেছে অনেকখানি। মিলনও অসম্ভব নয়।

উপাধ্যায় বলেন,—শুনেছি সরকার থেকে একটা ব্যবস্থা করা হয়েছে, এইসব পুরাকীর্তি রক্ষার জন্য। তুই কিছু জানিস নাকি রে সোমনাথ।

—হাঁ আমিও শুনেছি।

—তবে একটু চেষ্টা কর না বাবা। ওরা যদি একটু যত্ন নেয়, সাহায্য করে, তবে মন্দিরটা বাঁচে। মূর্তিগুলোর এ অবহেলা বড় বুকে বাজে, আর সহ্য হয় না। বড় অভিশাপ কুড়োচ্ছি সোমনাথ।

উপাধ্যায়ের গলার স্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে যায়। সোমনাথের মনের ভেতর যত উদ্ধত অশ্রদ্ধাপুঞ্জ মুহূর্তের জন্য একটা বেদনার স্পর্শে মমতায় অবনত হয়ে আসে।

গভীর বিশ্বাসে ভারি হয়ে আসে বুড়ো উপাধ্যায়ের কণ্ঠস্বর। —দেবভূমি কখনো নিশ্চিহ্ন হতে পারে না সোমনাথ। ইতিহাস তার সাক্ষী। তাকলা মাকানের বালুর ঝড় স্তূপ বিহার চৈত্যগৃহকে উড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে নি। শোণগঙ্গার প্লাবনে ভাসিয়ে নিতে পারে নি বুদ্ধগয়ার মন্দির। যে অক্ষয় শিলাশিল্পে দেবতা আশ্রয় নিয়েছেন, তার বিনাশ নেই।

নিরুত্তর সোমনাথের দিকে তাকিয়ে উপাধ্যায় আবার মেজাজ হারাতে থাকেন। সোমনাথ যদি দু'চার কথায় আপত্তি প্রতিবাদও জানায় তবে বুড়ো মনে মনে তবু খুসী হন ; হাত দিয়ে যেন একটা অবলম্বন, ভবিষ্যতের একটা স্পর্শ অনুভব করেন। নইলে সবই শূন্য, অসহনীয় হয়ে ওঠে। আর, সেই আশঙ্কাটাই সত্য বলে মনে হয়।

উপাধ্যায় বুঝিয়ে বলেন,—কলকাতাকে এতটুকুও বিশ্বাস করিস না সোমনাথ। ওখানে সব ফাঁকি। কী দুর্ভাগ্য মানুষগুলোর। কলের জল খায়।

সবচেয়ে অপরাধ—কলকাতায় নাকি ভারতীয় শিল্পের চর্চা হয়। স্কুল ক'রে ছেলেদের ছবি আঁকা আর মূর্তি গড়া শেখানো হয়।—আমি সে সব ছবি দেখেছি। মেয়ের কপালে টিপ এঁকে, কেয়ুর আর কুণ্ডল পরিয়ে দিয়ে যত খৃষ্টান পাদরীদের ঘুষখোর চর শিল্পাচার্য সেজেছে। কী ভয়ানক ব্যাভিচার!

সোমনাথ মৃদু প্রতিবাদ জানায়।—আপনি যতটা সন্দেহ করছেন ততটা নয়। ভারতের শিল্পকে তাঁরাও বোঝেন, শ্রদ্ধা করেন। তাঁরাই বরং এতদিন পরে আমাদের লুপ্ত শিল্পকলাকে উদ্ধারের কাজে লেগেছেন।

উপাধ্যায় উত্তেজিত হয়ে ঠক্ ঠক্ করে লাঠি ফেলে দ্রুত পায়ে ঘরের ভেতর গিয়ে নিয়ে আসেন একটা পত্রিকা।—এই দেখ কলকাতার ভাস্কর গড়েছেন এই রুদ্রমূর্তি। কি বস্তু এটা?

—কেন, রুদ্রই তো। খারাপ কি হয়েছে!

—রুদ্র? একবার চোখ মেলে তাকিয়ে বল। একটা বেহেড মাতাল সাহেব দাঁত মুখ খিঁচিয়ে চুল উসকো খুসকো করে দাঁড়িয়ে আছে। এই হলো রুদ্র? তোমার কলকেতে ভাস্করের হাত দুটো কেটে ফেলতাম কাছে পেলে।

অবসন্ন হয়ে উপাধ্যায় কিছুক্ষণ চুপ করে বসেন। শুধু চিক চিক করে চোখ দুটো অসহ অন্তর্দাহের দুটো শিখা। আর একটু শান্ত হয়ে বলেন—মিছেই রাগ করি না সোমনাথ। সেদিন কাগজে পড়লাম, আধুনিক এক বর্মী ভাস্কর ভগবান বুদ্ধের মূর্তি গড়েছে। মূর্তির হাতে হাতঘড়ি আর চোখে চশমা পরিয়ে দিয়েছে। বলতো, কী সব অনাচার হয়েছে।

সোমনাথ—এসব সত্যিই অন্যায়।

—এসব পাপ, এর প্রায়শ্চিত্ত নেই। আরও শুনলাম, কথাটা সত্য কিনা জানি না। কলকাতায় নাকি এক বিলেত ফেরত ভদ্রলোক দেবতার মুখোশ পরে অশ্লীল লম্ফঝম্প করে আর ভারতীয় নৃত্য নাম দিয়ে টাকা কামায়।

সোমনাথ যেন উপাধ্যায়ের মনের গহনে ক্ষতটাকে দেখতে পায়। তাই অভিমতগুলি বড় রূঢ় হলেও সোজা অস্বীকার করার মত যুক্তি হাতড়ে পায় না। তবু-একটা প্রতিবাদ দাঁড় করায়।—শুধু প্রাচীন ভারত নিয়েই তো চলে না। আধুনিক ভারতের, আধুনিক যুগের রীতি মানিয়ে চলতে হবে তো।

আধুনিক। কথাটা শুনেই উপাধ্যায় আবার ধৈর্য্য হারিয়ে ফেলেন। বিকৃত স্বরে বলেন—তোমার কলকেতে শিল্পীরা ভারতীয়ও নয়, আধুনিকও নয়। ভারতীয় হবার

মত নিষ্ঠা নেই, আধুনিক হবার মত প্রতিভা নেই। ওরা কিছুই নয়। যেন সাহেবরা বুঝতে পারে, এই ওদের লক্ষ্য। ছবি মূর্তি নাচ গান—সব। ভারতীয় হলে সাহেবরা বুঝতে পারবে না, এই ওদের ভয়।

নিশির ডাকে নয়, ঘুম এল না তাই। সোমনাথ ঘরের কপাট খুলে বেরিয়ে গেল। রাত্রির শেষ যাম, চাঁদ ডুবছে বেনমতীর ওপর। জল আর বালিয়াড়ির গায়ে লেগেছে তামাটে জ্যোৎস্নার আভা। কোন উদ্দেশ্য নেই, সোমনাথ ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগলো মন্দিরের ভগ্নস্তূপের চারদিকে।

একটা ঢিপি থেকে নিচে নামতেই চোখে পড়লো, কেউ যেন কাপড় ঢাকা দিয়ে শুয়ে রয়েছে। কিন্তু চোখের ধাঁধাঁ মাত্র। বৃষ্টির কাদাজল লেগে ঢাকা পড়েছে শায়িত মূর্তিটা। হাত দিয়ে ধুলো সরিয়ে দিতেই হেসে উঠলো একটি মুখ। ললিতাসনা এক সৌম্যা দক্ষিণামূর্তি—বরদা মুদ্রা। কী স্পষ্ট হাসি, আয়ত চোখে কী গাঢ় উজ্জ্বল দৃষ্টি। সোমনাথের সমস্ত শরীর একবার শিউরে উঠলো। ভয় ভয় করছে। তার সমস্ত ঔদ্ধত্য আর অবজ্ঞাকে যদি মূর্তিটা প্রশ্ন করে বসে। সোমনাথ অন্য পথে সরে পড়লো।

ক্লান্ত হয়ে সোমনাথ ঠেস দিয়ে দাঁড়ালো একটা অবলুণ্ঠিত ভাঙা তোরণের গায়ে। অদ্ভুত এক অনুভবের মোহ তার বিচার বুদ্ধিকে ঘিরে ধরেছে যেন। সময়ের ব্যবধান ভেঙে যাচ্ছে—এক সমুন্নত বিগত যুগের কোলে এসে পৌঁছে গেছে সোমনাথ। টিপ টিপ করছে পাথরের মূর্তির বুকগুলি। তারা বেঁচে আছে।

পাশে দাঁড়িয়ে কে? এক স্মেরমুখী নগ্না মূর্তি। সোমনাথ আচমকা দু'পা পিছিয়ে সরে গিয়ে দাঁড়ালো। এ কে?

রভসে আকুল এক দিব্যাঙ্গনা অতিভঙ্গ ঠামে দাঁড়িয়ে। গুরুনিতম্বে রত্নসূত্র, কঠিন কুচকলিকা আবেগে কোমল হয়ে রয়েছে। সুপুষ্ট বর্তুল দুটি হাতে তুলে ধরে আছে পদ্মবীজের মালা, যেন গায়ে ছুঁড়ে মারবে। তার বুকের উত্তাপ লাগছে সোমনাথের গায়ে। চোখে মুখে উষ্ণনিশ্বাসের ভাপ। অজস্র স্বেদবিন্দু কপালে চক চক করে ফুটে উঠলো। সরে গিয়ে তোরণের অপরদিকে হিমে ভেজা একটা কুশের ঝাড়ের ওপর বসে পড়লো সোমনাথ।

এই মূর্তিলোকের রূপ ও হৃদয় সে আজ যেন বুকের কাছে অনুভব করছে। এই বিরাট স্বরমন্দিরের প্রাঙ্গণে যেন স্তব্ধ হয়ে রয়েছে এক উদ্দাম জয়জয়ন্তী রাগ। মূর্চ্ছাহত হয়ে রয়েছে এক প্রাচীন বৈভব। এই ন্যাগ্রোধ আর নাগরঙ্গবনে উৎসবের প্রদীপ যদি আর একবার ঝলসে উঠে, দেখা দেবে শত শত জীবন্ত নরনারীর রূপ! তার মধ্যে

দাঁড়িয়ে আছে মিশ্রের মেয়ে কাঞ্চন, কপালে কাশ্মীরপত্রের লিখা—সুন্দর। ওর কুন্তল স্খলিত একটি ফুল কুড়িয়ে নিতে মন আকুল হয়ে ছুটবে।

কিন্তু এ নিশির ডাকের ঘোর আর কতক্ষণ। চাঁদ ডুবে গেল। দিনের আলোতে মাটি হয়ে দেখা দেবে এই রূপময় অতীত। কাঞ্চন বাতিল হয়ে গেছে চিরদিনের জন্য।

উপাধ্যায় উঠে পড়ে লেগেছেন। প্রতিদিনের কাজের একটা ছক বেঁধে নিয়েছেন। সকালে উঠেই কালাচাঁদ মুহুরীকে একবার তাড়া দেন। প্রজাবাড়ি পাঠিয়ে দেন খাজনা উসুলের জন্য। দুপুরে বসে সোমনাথকে দিয়ে দরখাস্ত লেখান গভর্ণমেণ্টের দরবারে। বার শত বছরের পুরাতন কল্যাণঘাটের এই বিষ্ণুমন্দির। হিন্দু সংস্কৃতির এই কীর্তিকে ভাঙনের হাত থেকে রক্ষার জন্য সনির্বন্ধ আবেদন। এই অনাদৃত দেবভূমিকে আবার ঘসে মেজে লুপ্ত গৌরব ফিরিয়ে আনতে হবে।

তারপর বিকেলের দিকে আসেন তারক মিশ্র। কাঞ্চন আর সোমনাথের ঠিকুজি সুমুখে মেলে নিয়ে বসেন। বিয়ের কথা, দিনক্ষণের বিচার চলে। সোমনাথ বাইরে বেড়াতে চলে যায়।

মিশ্র চলে যায়। উপাধ্যায় আবার ফাঁপরে পড়েন। একটা শূন্যতা যেন তাঁকে গিয়ে খাবার জন্য আড়ালে আত্মগোপন করে আছে। চেঁচিয়ে ডাকতে থাকেন—সোমনাথ, সোমনাথ।

সোমনাথ নেই। উপাধ্যায় আস্তে আস্তে ওঠেন। যে আশঙ্কা তাঁর মনে অনেকদিন থেকেই পুষ্ট হচ্ছিল, সেটা সত্য হয়েছে। উপাধ্যায় কদিন আগে এ সত্য আবিষ্কার করেছেন।

উপাধ্যায় সোমনাথের ঘরে এসে ঢুকলেন। সেই বাক্সের ডালাটা খুলে একটা মোটা ইংরেজী বইয়ের ভেতর থেকে বার করলেন ফটোটা। এক অনাম্নী তরুণীর ছবি।

উপাধ্যায় বিভোর হয়ে দেখেন, মুগ্ধ হন, শঙ্কিত হয়ে ওঠেন। ঘর ভাঙানিয়া এ মূর্তির চোখে অদ্ভুত হাসি। সপ্তাবরণ এই দেবায়তনের কোন দেবিকার চোখে এমন হাসি নেই। চোখে হাসি, মহাকালের এও এক নতুন সৃষ্টি। কি নিষ্ঠুরভাবে বদলে যাচ্ছে পৃথিবী! হাসিও ঠোঁট থেকে সরে যায়, চোখে আশ্রয় নেয়! উপাধ্যায় নিষ্পলক চোখে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে থাকেন।

কিন্তু সন্ধ্যারতির ঘণ্টা বেজে ওঠে। কর্পূর প্রদীপের আলো নাচতে থাকে বিগ্রহের সম্মুখে। বাইরের মণ্ডপে স্তম্ভে চত্বরে আলোছায়ার চামর দুলতে থাকে। সে

আলোড়নে জেগে ওঠে সারি সারি স্থানক আসীন ও শয়ান দেবতার দল। উপাধ্যায় যেন নষ্ট সম্বিৎ ফিরে পান। দ্রুত ফিরে এসে বিমান ঘরের একটা স্তম্ভে ঠেস দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন। অর্চনা শেষে পুরোহিত চলে যান। গন্ধ ধূমে আচ্ছন্ন বাতাস নিশ্বাসে গিয়ে আবেশ সৃষ্টি করে, সমস্ত চিন্তাজাল এলোমেলো হয়ে যায়। উপাধ্যায় ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়েন। ক্ষুদ্রাঙ্ক নাটকের মত এক একটা দিন উপাধ্যায় এইভাবে পার করে দিচ্ছেন।

এমনিভাবে একদিন তীব্র এক অনুশোচনায় উপাধ্যায় অস্থির হয়ে উঠলেন। নিজেকে ধিক্কার দিলেন নিজেরই দুর্বলতার জন্য। সন্ধ্যারতির ঘণ্টা ধ্বনি আর কানে পৌঁছয়নি সেদিন। উপাধ্যায় দু' চোখের পিপাসা ঢেলে দেখছিলেন ফটো। এ কেমন মেয়ে—বেণী নেই, ফাঁপানো চুলের ভার কোমর পর্যন্ত নেমেছে। এই লোল রুক্ষ অলক ডাকিনীদের মাথাতেই শোভা পায়। কিন্তু তবু কি সুন্দর! গায়ে জামা, একটা শাড়ী লতার মত রোগা মেয়েটাকে জড়িয়ে ধরেছে। হাতে দুগাছি সরু চুড়ি কানে হালকা ধরনের মাকড়ির মত অলঙ্কার! পায়ে মঞ্জীর নেই, চামড়ার জুতো। কচি কচি মুখ, অনেকটা গৌরী কুমারিকারূপা। কিংবা তার চেয়েও ঢলঢল। চোখে সেই হাসি।

আরতির শেষে শঙ্খের ফুৎকার উপাধ্যায়ের কানে এসে আচমকা বাজলো। কোন মতে বিগ্রহের সম্মুখে একটা প্রণাম সেরে উপাধ্যায় নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। সমস্ত রাত ছটফট করলেন একটা অশুচি জ্বালায়।

উপাধ্যায় ঘরের বারান্দায় মসৃণ মেজের ওপর একটা থামে ঠেস দিয়ে বসলেন। সামনে একটা পঞ্জিকা।

—সোমনাথ।

সোমনাথ এসে সামনে দাঁড়ালো। উপাধ্যায়ের গলার স্বর দৃপ্ত আদেশের মত। —দিন স্থির করে ফেলেছি, আসছে মঙ্গলবার। শুভ কাজে আর বেশী দেরী করা উচিত নয়। মিশ্রকে ডাকতে লোক পাঠিয়েছি।

সোমনাথ ঠায় দাঁড়িয়ে রইল সামনে, বুড়ো উপাধ্যায়ের দিকে তাকিয়ে। দু চোখের দৃষ্টিতে হিংস্র স্ফুলিঙ্গ ঝরে পড়তে লাগলো।

—ওকি সোমনাথ। অমন করে তাকাচ্ছিস কেন? কি হয়েছে তোর? উপাধ্যায়ের গলার স্বর সন্ত্রাসে থর থর করে উঠলো। সংহার জ্বালায় আকুল ত্রিপুরান্তক শিবমূর্তির চোখে এই দৃষ্টি উপাধ্যায় দেখেছেন!

—এই সংসারকে দাঁড় করাতে হবে। লক্ষ্মী প্রতিষ্ঠা করতে হবে। ভাঙতে দিলে চলবে না। এই পবিত্র কর্তব্যের দায় তুই ছাড়া আর নেবার কে আছে?

লাঠিতে ভর দিয়ে উপাধ্যায় উঠলেন। বোধ হয় সোমনাথের হাত দুটো সাদুরোধে ধরতে যাচ্ছিলেন। একটা গরুর গাড়ী ক্যাঁচ ক্যাঁচ করে এসে থামলো সামনের পথে। ফাইল বগলে এক ভদ্রলোক গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল।

আরও অনেক জিনিস নামলো। দশ বস্তা সিমেণ্ট, আলকাতরা পাঁচ টিন, লোহার ছড় দু' বোঝা, দু' বস্তা জমাট পিচের টুকরো। খুরপি হাতে এক ছোকরা ওস্তাগরও নেমে এল।

সোমনাথ নিজের ঘরের ভেতর গিয়ে ঢুকলো। হতভম্ব উপাধ্যায় আগন্তুক ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলেন—এ কি ব্যাপার?

কালাচাঁদ মুহুরী বুঝিয়ে দিল।—সরকারের লোক, ভাঙা মন্দির মূর্তি সব মেরামত করে দিতে এসেছেন। আপনি যে দরখাস্ত করেছিলেন, তা গ্রাহ্য হয়েছে।

সোমনাথ! সোমনাথ! ছোট ছেলের মত ভয়ার্ত চীৎকার করে উঠলেন উপাধ্যায়। ছানি পড়া চোখ ফেটে ঝর ঝর করে জল ঝরে পড়লো।—সোমনাথ কি সব এসেছে দেখ। কি চায় এরা?

একটা পচা পাঁক আর পুরীষের গাদা যেন সামনে রাখা হয়েছে, দেবতাদের গায়ে ছুঁড়ে মারবার জন্য। সপ্তাবরণ দেবনিকেতনের সংস্কার করবে এরা? এই সব মালমসলা? স্থবির উপাধ্যায়ের কাতর চীৎকার আবার বেজে উঠলো—সোমনাথ শীগ্‌গির আয়।

সোমনাথ এল কিন্তু সামনে এসে আর থামলো না। হাতে একটা সুটকেস। বারান্দা থেকে নেমে পড়লো পথে। তারপর আর দেখা গেল না।

আগন্তুক ভদ্রলোক ভ্যাবাচাকা খেয়ে বোকার মত দাঁড়িয়ে রইলেন। সবাই চুপচাপ। কল্যাণঘাটের এক বিকলাঙ্গ বিগ্রহের মত থামের গায়ে কাৎ হয়ে বসে রইলেন উপাধ্যায়। নির্বোধের মত ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলেন ষ্টেশনের পথের দিকে।

মুহুরী কালাচাঁদ ধিক্কার দিয়ে উঠলো।—ছি ছি, যাবার সময় বাপকে একটা প্রণাম করে গেল না।

উপাধ্যায় আর গলা খুলে বলতে পারলেন না।—না, ও প্রণাম করতে পারে না।

কল্যাণঘাট যেন ধীরে ঝাপসা হয়ে আসছে। শ্বেত কৃষ্ণ ধূম্র পাটল বহ্নিবর্ণসন্নিভ কঠিন প্রস্তরের শত শত মূর্তি কীর্তি ও বিগ্রহ গলে মিলিয়ে যাচ্ছে অন্তর্ধানের স্রোতে। মজ্জমান উপাধ্যায় যেন শেষ দৃষ্টি মেলে দেখছেন—তীর সরে গেছে বহুদূরে। শুধু দিকপ্রান্তে জেগে রয়েছে অনাম্নী সুতনুকা এক মূর্তির ছলনা। চোখে অদ্ভুত হাসি।

গরল অমিয় ভেল

মেহেদি গাছের বেড়ার ওপারে চন্দ্রবাবুর বাড়ির একটি জানালা। প্রায় সব সময় একটি মেয়েকে সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। মেয়েটির নাম মালা বিশ্বাস। চন্দ্রবাবুর মেয়ে। শহরের সকলেই একে চেনে।

জানালায় দাঁড়িয়ে থাকা, মেয়ে হয়ে দুর্নাম কেনাব পক্ষে এইটুকুই যথেষ্ট। মালা বিশ্বাসের চাল চলনে যেন মাত্রা নেই। দুর্নামও তাই এককালে মাত্রা ছাড়িয়ে পড়েছিল। এখন লোকনিন্দার সেই অশান্ত গুঞ্জন কিছুটা থিতিয়ে গেছে। চন্দ্রবাবুর বাড়ির মেহেদি গাছের বেড়া, ফটকের ল্যাম্পপোস্ট, আর পথের কাছে মাকাল গাছটা —এসবের মতই জানালার কাছে মালার দাঁড়িয়ে থাকাটাও এখন একটা নিছক নিসর্গ শোভা মাত্র।

মালা তাকিয়ে দেখে সবাইকে। ফেরিওয়ালারা যায়, পুলিশ লাইনের সেপাইরা যায়। কেউ তাকালে চোখ ফিরিয়ে নেয় না। বেলা সাড়ে দশটায় পথ ভর্তি করে স্কুলেব ছাত্র আর কাছারীর বাবুরা যায়। হাটেব দিনে পথে ভীড় হয় আবো বেশী। দুপুরের রোদে পথের ধুলো ক্ষেপে আঁধি ওঠে, কখনও বৃষ্টি নামে। মালা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে জানালার ধারে। কখনও বা রাস্তার ওপর দাঁড়িয়ে ছেলের দল জটলা করে। মালা তবু সরে যায় না। এ এক সমস্যার কথা—একি শুধু দেখার নেশা? অথবা দেখা দেওয়ার নেশা?

ঘরের বাইরেও মালা বিশ্বাসকে দেখা যায়। কখনও বেডাতে বার হয়, কখনও বা অকারণেই ঘুরে আসে। তাই সে প্রায় সকলেরই চেনা। সকলেই চেনে মালা বিশ্বাসের মুখের বসন্তের দাগগুলি, কালো মোটা চেহারা, চোখে অদ্ভুত রকমের চশমা, হাতে ছাতা, সঙ্গে চাকর রামজীবন। তার শাড়ি, রঙেব বৈচিত্র্যে আর পরবার কায়দায় হাঁ করে তাকিয়ে দেখার মত। পথে যেতে হঠাৎ মালা একবার থামে গ্রামোফোনের দোকানের সামনে। রামজীবন গিয়ে কয়েকটা রেকর্ডের দাম জিজ্ঞাসা করে আসে। কখনও থামে গুরুদাসেব ঘড়ির দোকানের কাছে—রামজীবন অনুসন্ধান করে হাতঘড়ির ভাল ব্যাণ্ড আছে কিনা।

আড়ালে থাকতে মালা বোধ হয় হাঁপিয়ে ওঠে। শুধু ভীড় খোঁজে যদিও ভীড়ের মধ্যে ঠিক মিশতে পারে না। বারোয়ারী তলায় যাত্রাগানের আসরে বর্ষীয়সী

মহিলারা বসেন চিকের আড়ালে। ছোট মেয়েরা বসে চিকের বাইরে দু' সারি বেঞ্চে। মাল বসে চিকের বাইরেই, ভিন্ন একটা চেয়ারে, একটু এগিয়ে—সবা হতে দূরে।

মেয়ে স্কুলের বার্ষিক উৎসবে মালা বিশ্বাসও এসেছিল। সকলে বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে দেখছিল, তার গলার প্রকাণ্ড সাঁওতালী হাঁস্লীটা। আশ পাশ থেকে নানারকম ঠাট্টা ভরা টিপ্পনি টিক্ টিক্ করে উঠলো। কিন্তু ওসব মন্তব্য মালার কানেই আসে না।

ভাদ্রের ঠিক মাঝামাঝি এসে আকাশ ভরা বর্ষার ঘটা একেবারে থেমে গেল। রাণী ঝিলের মাঠের ঘাসে, কালো পাথরের টিলাতে, টেলিগ্রাফের তারে, দূরের নিমবনের চূড়ায় প্রথম শরতের আলো চিক্ চিক্ করে উঠলো ছোট ছেলের হাসির মত।

ঝাপ্সা হয়েছিল সারা শহরের প্রাণ, আড়াই মাস ধরে। আজ আবার আলোয় চমকে উঠেছে রঙীন আয়নার মত। শিকল দেওয়া প্রাণগুলি ছাড়া পেল ঘরে ঘরে। নিঝুম শহরটা সাড়া দিল আবার।

রাণী ঝিলের মাঠে বেড়িয়ে ফেরার মরসুম এল। একটা দেওদারের নীচে দেখা যায় হরিজন স্কুলের ছেলেরা ড্রিল করছে। আয়ার দল ঘুরছে পেরাম্বুলেটার টেনে। শরৎবাবু ও কান্তিবাবু, বিহার জুডিসিয়ারির দু'টি রিটায়ার্ড মানুষ, লাঠি হাতে একসঙ্গে পা ফেলে চলেছেন বাঁধের লাল কাঁকরের সড়ক ধরে।

রাণী ঝিলের নতুন বাতাস আজ ডাক দিয়েছে সবাইকে। হাসপাতাল রোড ধরে সপরিবারে লালবাগের ভদ্রলোকেরা বেড়াতে আসছেন।

গল্ফের লাঠি হাতে মুখে পাইপ কামড়ে আসছে সামুয়েল সাহেব। মালা বিশ্বাস বেড়াতে এসেছে, খোঁপায় জড়ানো প্রকাণ্ড একটা রঙীন রুমাল উড়ছে বাতাসে। প্রচারক চৌধুরী মশায় ঝিলের জলের ধারে একটা খবরের কাগজ পেতেছেন, উপাসনায় বসবার জন্য।

সকলে একবার থমকে দাঁড়াচ্ছিল সেখানে, ছোট একটা কালো পাথরের টিলা, তার গা ঘেঁসে একটা করবী গাছ। এই পাথরটা ক্রস রোডের মোড়ে দাঁড়িয়ে আছে আজ পঞ্চাশ বছর ধরে। কোন দিন এর দিকে তাকিয়ে দেখার মত কিছু ছিল না। গরু চরাতে এসে রাখালেরা কোন দুপুরে মাঝে মাঝে এখানে ভাত খেতে বসে।

সকলেই একবার দাঁড়াচ্ছিল সেখানে। জায়গাটা পার হতে অন্তত দু'তিন মিনিট সময় লাগছিল সবারই। পাথরটার ওপর বড় বড় হরপে সাদা খড়ি দিয়ে গদ্যে পদ্যে মিশিয়ে নানা ছন্দে কিসব লেখা। পথচারী সকলেই, কেউ একা কেউ সদলে

চোখ ভরা দুরন্ত আগ্রহ নিয়ে পড়ছিল লেখাগুলি। প্রথম শরতের সকাল বেলা এই পথে-পড়ে থাকা পাথরটার গায়ে কে ছড়িয়ে গেল এমন এক মুঠো রোমান্স!

বেশীক্ষণ কেউ দাঁড়াচ্ছিল না সেখানে। তা সম্ভবও ছিল না। পড়ে নাও আর সরে পড। লেখাগুলি ভয়ানক রকমের অশ্লীল।

শুধু তাই হ'লে ভাল ছিল। দেখা যাচ্ছে; কথাগুলি সবই একটি মেয়েকে উদ্দেশ্য করে লেখা। শুধু নাম থেকে ঠিক বোজা যাচ্ছে না কাদের বাড়ির মেয়ে। এই নিদারুণ পরিচয়-লিপির অনেক কিছু বাদ দিলে সংক্ষেপে তাকে এইটুকু শুধু চেনা যায়:

—পূর্ণিমা বসু। রূপে আব নামে এমন মিল আর দেখা যায় না। তুমি নাকি গয়না ভালবাস না। লজ্জাই তোমার ভূষণ, খুব সত্যি কথা। ছ' মাস চেষ্টা কবে একটি বার শুধু তোমায় চোখে দেখতে পেয়েছি। জানি তোমার চিঠি আসে ভিয়েনা থেকে। তিনি ভাল আছেন তো? আর এক যক্ষ যে সিমলা পাহাড়ে হা করে বসে আছেন। ক'দিক সামলাবে? যাচ্ছ কবে? যখন তখন ওভাবে হাই তুলতে নেই, বড বিশ্রী দেখায়।

কে লিখেছে কে জানে! এই অজানা অশ্লীল কুৎসাবিশারদের লেখাগুলি মৌচাকে ঢিলের মত শহরের বুকে এসে লাগলো। তিন ঘন্টাব মধ্যে প্রত্যেক ঘরে ও বৈঠকে নিভৃতে ও নেপথ্যে গুন্ গুন্ করে উঠল শুধু এই প্রসঙ্গ—কালো পাথরের লেখা।

শুধু এই প্রশ্ন, কে লিখলো? কে পূর্ণিমা বসু? কথাগুলি কি সত্যি? মনে মনে মুখে মুখে আলাপে আলোচনায়, সন্দেহে ও সন্ধানে এক প্রচণ্ড কৌতূহল যেন পরোয়ানা হয়ে ছুটল চারিদিকে। এই প্রশ্নের উত্তর চাই।

প্রথম কৌতূহলের বিকার একটু শান্ত হয়ে এল। পূর্ণিমা বসুর পরিচয় পাওয়া গেছে। আজ দুবছর হলো পুরানো গির্জার দক্ষিণে যে নতুন বাড়িটা তৈরি হয়েছে, সেই বাড়ির মালিকের নাম মহীতোষবাবু। মহীতোষবাবুর মেয়ে পূর্ণিমা। ক'জনই বা এদের চেনে! লতা-মোড়া উঁচু প্রাচীর দিয়েই ঘেরা থাকে এঁদের বড়মানুষী বনিয়াদ। এঁবা অগোচর। তার মধ্যে পূর্ণিমা বসুকে একরকম অলীক বললেই হয়। কিন্তু সেও আজ সব জানা অজানাব ব্যবধান ঘুচিয়ে নতুন আবিষ্কারের মত সবার কাছে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছে।

নিশ্চয় নতুন কেউ একজন এসেছে এ'শহরে। যেই হোক, পূর্ণিমা বসুর ওপর তার এত আক্রোশ কেন? এ কি কোন বিগত অপমানের প্রতিশোধ? তবুও এটা বড় কাপুরুষের মত কাজ হয়েছে। অত্যন্ত গর্হিত।

অনেকে এই ভেবে লজ্জিত হচ্ছে, পূর্ণিমার বাড়ির লোকেরা কি মনে করলো।

কেন তাদের ওপর এই অহেতুক কুৎসার আঘাত? সত্য হোক, মিথ্যা হোক, এই আঘাত কারও গায়ে না বেজে পারে না।

মহীতোষবাবুর বাড়ির সবাই বিকেলের দিকে একবার বেড়াতে বার হতেন। সমস্ত দিনের মধ্যে প্রাচীরের বাইরের পৃথিবীতে একটিবার ঘোরাফেরার এই শ্রদ্ধাটুকুও তাঁদের হারাতে হলো। তাঁদের কাউকে আজ কোথাও দেখা গেল না।

কিন্তু পূর্ণিমা কি ভাবলো? এতক্ষণে সেও নিশ্চয় সব খবর শুনেছে। হয়তো ঘরে খিল দিয়ে কাঁদছে, হয়তো আজ সারাদিন খায় নি। ভাবতে গেলে কত কি মনে হয়, কিন্তু ঠিক বোঝা যায় না, এই উপদ্রবে পূর্ণিমার মনের শান্তি কতটা নষ্ট হলো। এও হতে পাবে, সে কিছুই গ্রাহ্য করছে না, তাব রীতিমত মনের জোর আছে।

ক্ষুব্ধ হয়েছেন চৌধুরী মশায়।

ঠিক বেলা বারটার সময় কাছারি রোড দিয়ে যেতে চোখে পড়ে, সমাজবাড়ির সামনে কুঁয়োতলায় প্রচারক চৌধুরী মহাশয় স্নান করছেন। মাথা ভরা টাক আর চিবুক ভরা পাকা দাড়ি, ফর্সা রোগা চেহারা। এক এক সময় দেখা যায় স্নান সেরে আদুড় গায়ে কুঁয়োতলাব শানে বসে সাবান দিয়ে খদ্দরের ধুতি কাচেন। দু' খানাব বেশী তাঁর ধুতি নেই। সমাজবাড়ির কোণের ঘরটাতে তাঁর আস্তানা। দারা সুত পরিবার অর্থাৎ সংসার বলতে কোন বালাই তাঁর নেই। দুপুরের বোদে সেই লোল-পেশী বুড়ো মানুষের সাদা শরীরটা বড় অদ্ভুত দেখায়।

তিনি সত্যবাদী ও নির্ভীক। এই কারণেই সরকারী চাকরী গ্রহণ করতে পাবেন নি। যেখানে দুর্নীতি, সেখানে তিনি ক্রুর ও কঠোর। বহু বহুবার তিনি ছেলেদের সখের থিয়েটারের আয়োজন পণ্ড করেছেন। তিনি একবার মিউনিসিপ্যালিটিব কমিশনার হয়েই পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। কারণ, তাঁর প্রস্তাব ছিল বিড়ির দোকানগুলিকে উচ্ছেদ করা, যাতে ধূমপানের পাপ যথেচ্ছা ধুঁইয়ে না ওঠে। সে প্রস্তাব গ্রাহ্য হয় নি।

অন্য দিকে যতই নিরীহ ও নমনীয় মানুষ হোন্ না কেন, নীতিগত কোন অন্যায়ের ব্যাপারে তিনি নিজের কর্তব্য ভুলতে পারেন না। সেখানে তাঁকে ঠেকিয়ে রাখার মত প্রতাপ কারও নেই। লোকে মানুক আর না মানুক, প্রচারক চৌধুরী মশায় জানেন, তিনিই স্বয়ং এ শহরের ভদ্র সমাজের নীতি রুচি ও শালীনতার অভিভাবক স্বরূপ। একবার হোলির দিনে মেথরদের মদ খাওয়া বন্ধ করে সকলকে গেলাস

ভর্তি দুধ খাইয়েছিলেন চৌধুরী মশায়। এ'শহরের ইতিহাসে এরকম অঘটনও ঘটে গেছে।

তাই ক্ষুব্ধ হয়েছেন চৌধুরী মশায়, তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেছেন পাপের এই দুঃসাহসিক রূপ দেখে। রাগে ও ঘৃণায় চৌধুরী মশায় স্থৈর্য হারালেন। স্বয়ং থানায় এসে ড'য়েরী করিয়ে গেলেন, কে বা কারা শহরের বুকের ওপর বসে এই অপকীর্তি করলো? অবিলম্বে তাকে যেন ধরে ফেলা হয়। এমন কঠোর শাস্তি তাকে দেওয়া হোক্, যাতে এক যুগ ধরে যত দুষ্ট ও দুর্বৃত্তের বুক কাঁপতে থাক্‌বে। নইলে বুঝতে হবে দেশে সুশাসনের শেষ হয়েছে, গভর্ণমেণ্ট নেই।

পুলিশের ইনস্পেক্টর প্রতিশ্রুতি দিলেন—তিনি এই ঘড়িয়াল বদমায়েসকে সাত দিনের মধ্যে ধরে ফেলবেন, সে যতই গভীর জলে থাক্ না কেন।

মালা বিশ্বাস অবশ্যই দেখেছে পাথরের লেখাগুলি। বোধ হয় একমাত্র সেই লেখাগুলি ভাল করে পড়েছে, পরম নির্ভয়ে নিঃসঙ্কোচে। মালা চিনেছে পূর্ণিমাকে, লোকমুখে শুনে নয়, সে আগেই তাকে জানতো। গির্জার সড়কে বেড়াতে গিয়ে কতদিন সকালবেলা মালা তাকে দেখেছে, দোতালা ঘরের জানলার কাছে বই হাতে বসে আছে পূর্ণিমা। চোখোচোখি হতেই পূর্ণিমা সশব্দে জানালাটা বন্ধ করে দিত। বোঝা যেত, এই জানালা বন্ধ করা একটা সশব্দ প্রতিবাদ মাত্র। কিন্তু কিসের বিরুদ্ধে বা কার বিরুদ্ধে তা ঠিক আন্দাজ করা যায় না। হতে পারে, সেটা মালার গায়ে জড়ানো ঐ সবুজ রঙের রেশমী নেট, বড় বেশী ঝক্‌ঝক্ করে।

আজ সারাক্ষণ হেসেছে মালা। রূপসী পূর্ণিমা বসুর সকল অহঙ্কার কালো পাথরের নোংরামির আঘাতে কী ভয়ানক জব্দ হয়ে গেছে।

সমস্ত শহরের শাসন ও সতর্কতাকে বিদ্রূপ করে ক্রসরোডের পাথরটা পনের দিনের মধ্যে আর একবার খেউড় গেয়ে উঠলো।—"সুমিতা নন্দী, প্রতিজ্ঞা করেছ মনের মত মানুষ না পেলে গলায় মালা দেবে না। তবে তোমার এলবাম ভরা ওসব কাদের ছবি? কিছু বেছে উঠতে পারলে? এ অভ্যাস ভাল নয়, এটা দ্বাপর যুগ নয়। বয়স তো সাত বছর ধরে সেই তেইশে ঠেকে রয়েছে। তবে তোমার মেক-আপের পায়ে গড় করি। এত শিথিলতাকে কি কৌশলে এত উদ্ধত করে রেখেছো। নাঃ, তুমি সত্যিই সুতনুকা, তুমি অমর্ত্যবধূ। ও ছাই মানুষের ছবির এলবামে কি হবে? তোমার বিয়ে না করাই ভাল।"

ব্যাপারটা আগাগোড়া বিস্ময়কর বলেই মনে হচ্ছে। যেই লিখুক না কেন, সে দুঃসাহসী সন্দেহ নেই। সুচতুর তো নিশ্চয়ই। প্রতি দুশ্চিন্ত মনের মেঘে মেঘে, সন্দেহের পরতে পরতে, এক একবার তার রূপ আবছায়ার মত গোচরে আসে যেন।

কল্পনার নেপথ্যে এই অদ্ভুতকর্মা কাজ করে চলেছে। নেহাৎ বাজে ফক্কড় গোছের কেউ নয়। লেখাপড়া খুব ভালই জানে। বয়স বিশ পঁচিশের বেশী বোধ হয় হবে না। বোধ হয় কোন হতাশ-প্রেমিক।

সেবক সমিতির অফিসে সন্ধ্যায় মোমবাতি জ্বালিয়ে সেক্রেটারী ননীবাবু চিন্তিতভাবে বসেছিলেন। আজ জেনারেল মিটিং আহ্বান করা হয়েছে। সভ্যেরা সব এল একে একে। এরা সবাই ছাত্র—সতু, প্রিয়তোষ, লোকনাথ।

ননীবাবু জানালেন—এটা আমাদের সবারই অপমান। কোন্ এক বদমাস দিনের পর দিন এইসব কুকর্ম করে চলেছে, আজও ধরা পড়লো না। সে যে শীগগির বন্ধ করবে, তারও লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। কখন কার নামে লেখা উঠবে এই ভয়েই সবাই শঙ্কিত। বাস্তবিক…।

ননীবাবু দুঃখের হাসি হাসলেন।

—যেই হোক্, এটা বুঝতে পারছি, বাইরের লোক কেউ নয়। নিশ্চয় আমরা সবাই তাকে চিনি, তবে ভোল দেখে হয়তো বুঝতে পারছি না।

ননীবাবুর কথায় সংশয়ের কুয়াশা ঠেলে তার মূর্তিটা যেন ছায়ার মত দেখা যায়।

—এ ধরণের লোককে সহজে চেনা মুস্কিল। যাকে কোন মতেই সন্দেহ হচ্ছে না, এ কাজ হয়তো তারই।

স্বয়ং ননীবাবুই শেষ পর্যন্ত আশ্বাস দিয়ে বলেন,—তাকে না ধরতে পারলে কোন সুরাহা হবে না। হাতে হাতে ধরে ফেলা চাই।

চৌধুরী মশাই রণে হার মানেন নি। অনেকদিন পরে সংগ্রাম করার মত এক পাপের চ্যালেঞ্জকে পাওয়া গেছে। আবার একদিন থানায় এসে পুলিশ কর্মচারীদের সঙ্গে একপ্রকার বচসা করে গেলেন। চৌধুরী মশায় বিশ্বাস করেন না, পুলিশ আন্তরিকভাবে তার কর্তব্য করছে, নইলে অপরাধী নিশ্চয়ই এতদিন ধরা পড়তো। তিনি প্রস্তাব করলেন,—পাথরটার কাছে দিবারাত্র পাহারা দেবার জন্য এক বন্দুকধারী সান্ত্রী মোতায়েন করা হোক্।

ইনস্পেক্টর হেসে হেসে বললেন।—কি যে বলেন চৌধুরী মশায়, পুলিশের আর কাজ নেই? একটা মামুলী ব্যাপারে কামান বন্দুক নিয়ে টানাটানি করতে হবে?

চৌধুরী মশায় উত্তেজিত হলেন—মামুলী ব্যাপার। কথাটা প্রত্যাহার করুন।

ইনস্পেক্টর।—আপনি বৃথা রাগ করছেন। চুরি রাহাজানি খুন ডাকাতির খবর দিন, এক সপ্তাহে আসামীকে বেঁধে আনছি। কিন্তু এসব ভুতুড়ে গোছের ব্যাপার, এটা কি একটা তদন্ত করার মত কেস চৌধুরী মশায়?

চৌধুরী মশাই।—তাহলে প্রাইভেট ডিটেক্‌টিভ নিয়োগ করুন।

ইনস্পেক্টর।—মাপ করবেন, আপনি আমার শ্রদ্ধেয়। তবু আপনার প্রস্তাব গ্রাহ্য করতে আমরা অসমর্থ, তবে যথাসাধ্য চেষ্টা অবশ্য করবো।

চৌধুরী মশাই।—তা'হলে আমাকেও বাধ্য হয়েই গভর্ণরকে টেলিগ্রাম করে কম্‌প্লেন জানাতে হয়।

চৌধুরী মশাই উঠে চলে গেলেন।

ইনস্পেক্টর ভয় পেল কি না বোঝা গেল না। চৌধুরী মশায়ের মত প্রবীণ শ্রদ্ধাভাজন লোককে রাগানো উচিত নয়। যেকারণেই হোক্ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একজন কনেস্টবল লাঠি হাতে পাথরটাকে পাহারা দিল। সকালবেলা ছিল সামান্য একটু পুরনো লেখার অবশেষ। স্মিতা নন্দীর কলঙ্কগুলি প্রায় অস্পষ্ট হয়ে এসেছে। কিন্তু এই সজাগ সতর্ক পাহারার এক ফাঁকেই বিকেলের মধ্যে ঝলসে উঠলো একটা নতুন লেখা। সারা গোধূলিবেলা পাথরটা যেন ঠাট্টার সুরে হাসতে লাগলো। —"সুধা দত্ত, অনেক মেয়ের গলার সুর শুনেছি, তবে তোমার মত এত মিষ্টি কারও নয়। সত্যিই গলাটি তোমার সুধায় ভরা, ছোট্ট গলগণ্ডটাই তার প্রমাণ। হাই কলার ব্লাউজে আর ঢাকা পড়ছে না। কেন যে এত ইংরেজী বুলি বলছো বুঝি না। প্রফেসর ভদ্রলোকের স্ত্রী আছে যে, ও পথ ছেড়ে দাও।"

কনেস্টবলের চাকরী যাবার উপক্রম হলো! সে কসম খেয়ে জানালো, এক মুহূর্তের জন্য সে ডিউটিতে ফাঁকি দেয় নি। একটা পিঁপড়ের দিকেও ভুল করে তাকায়নি।

আশ্চয এই কালোপাথরের অশরীরী শিল্পী।

সন্দেহের ঝড় উঠছে অলক্ষ্যে যদি গরুর হাড় বা মড়ার মাথা কেউ ফেলে দিয়ে যেত, তবে না হয় বলা যেত ভূতের কাণ্ড। কিন্তু এটা নিছক প্রাকৃতিক আর চারিত্রিক ব্যাপার। একজন কেউ আছে পেছনে। সাবাস্ তার বাহাদুরী। তিন মাস ধরে শহর সুদ্ধ লোককে আঙুলের ডগায় নাচাচ্ছে। এক এক সময় বেশ ভেবে চিন্তে সন্দেহ করতে হয়। যার তার ওপর এই কৃতিত্ব আরোপ করা যায় না। যেই হোক সে কবি ও প্রেমিক, সে দুঃসাহসী ও চতুর। এতগুলি তরুণী হিয়ার গোপন কথা যে জানতে পেরেছে, সে গুণী ও যাদুকর। সব সময় তাকে অশ্লীল বলতে বাধে, সে বড় রসিয়ে লেখে।

কিন্তু একবার যদি এই অধরা যাদুকর ধরা পড়ে! চৌধুরী মশায়, পুলিশ, সেবক সমিতি আর নিন্দিতাদের বাপভাইয়েরা ওর হাড়মাস কুচি কুচি করে ছড়িয়ে দেবে রাণীঝিলের মাঠে। সন্দেহ হয় অনেককে। কার্নিভালের বাঙালী ম্যানেজারটা ঠিক তিন

মাস ধরে শহরে বসে আছে। কেন? ঘড়ির দোকানে নতুন ম্যাট্রিক-পাশ ছেলেগুলি বড় বেশী গুলতানি করে আজকাল। কেন? নন্দ মিস্তিরি উপন্যাস পড়ছে। হাতুড়ি ছেড়ে হঠাৎ এ সখের ব্যামো আবার কেন? প্রশান্ত পানের দোকান করে, এমন কি লাভ হয়? তবু সপ্তাহে তিনখানা রেকর্ড কেনে। হঠাৎ এত সুরেলা হয়ে উঠলো কেন সে? তবু ভরসা, প্রশান্ত নাকি লেখাপড়া জানে না। কিন্তু এ ভব মাঝারে কিছুই অসম্ভব নয়। সেবক সমিতি সন্দেহ করে পুলিশকে, পুলিশ সন্দেহ করে খদ্দরধারী মতিলালকে। মতিলাল চেষ্টা করছে, কাকে সন্দেহ করা যায়। এই সন্দেহের মাৎস্যন্যায়ে কারও অস্তিত্ব বুঝি আর ঠিক থাকে না।

কিন্তু ক্রসরোডের পাথর কি হঠাৎ বোবা হয়ে গেল! এক মাস পার হয়ে গেছে, কোন নতুন রহস্যের দাগ পড়ছে না আর। তা'হলে চলে কি করে? শহরের প্রাণের তার যে বাঁধা পড়েছে কালো পাথরের সুরে। দিবস রজনী ঐ কালো পাথরে ফুটে উঠবে নব নব শ্বেতলিপিকার ফুল। জ্যোৎস্না রোদ কুয়াসা শিশির – তারই ছোঁয়ায় প্রতি প্রভাতে কত প্রেমবৈচিত্র্যের অর্ঘ্যে পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে ক্রসরোডের পাষাণবেদিকা ক'মাসের মধ্যে কত অজানা কথা বলে দিল পাথরটা। এই লেখাগুলির মধ্যেই শহরের ঘুমন্ত মহিমা সাড়া দিয়ে উঠেছে।

সিনেমায় দর্শকের ভীড় কমে গেছে। সকাল বিকেল রাণীঝিলের মাঠে লোকের সমারোহ। গত বছরেও শরৎ এসেছিল এমনি আকাশ-ভরা নীল নিয়ে। কিন্তু রাণী-ঝিলের মাঠ আর ক্রসরোডের ধূলো এত চঞ্চল হয়ে ওঠেনি জনপদধ্বনির উচ্ছ্বাসে। ঘরে ঘরে চিত্তে চিত্তে দোলা লাগে। ক্রসরোডের পাথর তাদের হাতছানি দিয়ে ডাকে। এবার কার পালা কে জানে! মনে হয়, এই ক্ষমাহীন পাথরের আমোঘ অনুশাসন একে একে সকল গোপনচারিণীর কীর্তিকলাপ ফাঁস করে দেবে।

শত শত মূক মুখের প্রার্থনা পাথরের কাছে পৌঁছল যেন। বহু জিজ্ঞাসার আবেদনে ক্রসরোডের পাথরে অনুগ্রহের স্বাক্ষর আবার জল্ জল্ করে ফুটে উঠলো।

—"প্রীতি মুখার্জি, তুমি অপরূপ না হলেও অদ্ভুত। পরের কোলের ছেলে নিয়ে এত টানাটানি কেন? সবই বুঝি সখি। যাক্ যা হবার হয়ে গেছে, এবার সামলে থেক। গিরিডিকে ভুলে যাও।"

যেই যাক্ ক্রসরোড দিয়ে, সকলকে একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে হবেই লেখাগুলিকে, যতদিন না কেউ সাহস করে মিটিয়ে দেয়। ক্ষুণ্ণ ক্ষুব্ধ বিরুদ্ধ, মুখে যে যাই বলুক, এই কুৎসা দৃপ্ত পাথরের কাছে যেন ঝুঁকে পড়ে সকলেই, অভিবাদনের আবেশে।

শরৎবাবু যান, কান্তিবাবু আসেন। ক্রসরোডে মুখোমুখি দুজনের সাক্ষাৎ হয়। উভয়েই এই কুপথে চলার গ্লানিটুকু বার্তালাপের মধ্যে ধুয়ে ফেলার চেষ্টা করেন।

কান্তিবাবু— এ যে অসহ হয়ে উঠলো মশাই। কুৎসিত লেখাগুলি কি বন্ধ হবে না?

শরৎবাবু—আর বলেন কেন, বড়ই ঘৃণ্য ব্যাপার!

দুই সজ্জনের আলাপ হয়তো আরও কিছুক্ষণ চলতো, আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠতো; কিন্তু তাঁদের পাশ কাটিয়ে চলে গেলেন চৌধুরী মশাই—সাদা ভুরু ও দাড়ির মাঝখানে শাণিত নাক আর কঠোর দৃষ্টি। ওভাবে চলে যাওয়া বড় অস্বাভাবিক মনে হয়। শরৎবাবু একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন।

কান্তিবাবু—চৌধুরী মশাই ওভাবে তাকালেন কেন বলুন তো?

শরৎবাবু সশব্দে হেসে বলেন—কে জানে, উনি হয়তো মনে করছেন আমরা দুজনেই লেখাগুলি লিখেছি।

কান্তিবাবু—বলা যায় না, এ সন্দেহ তাঁর হতে পারে, যে রকম নীতিবাতিক লোক।

এতক্ষণে তারা কি ভাবছে? কালো পাথরের লেখাগুলি যাদের সুনামকে কালো করেছে, সেই অপমান শয্যা থেকে তারা কি এতদিনে সুস্থ হয়ে উঠতে পেরেছে? কিন্তু যতই কৌতূহল হোক্ না কেন, এ সংবাদ জানবার উপায় নেই। প্রথমে ভয় হয়েছিল, নিন্দিতাদের মধ্যে দু'একজন অতি-অভিমানিনী আত্মহত্যা করে না বসে। খুব বেশী ভয় হয়েছিল সুধা দত্তের কথা ভেবে।

সত্য মিথ্যা যাচাই হয় না, তবু রীতিমত মনোবেদনা পায় অনেকে। মানুষ আজ খারাপ থাকে, কাল ভাল হয়ে যায়। কিন্তু লোকসমাজে কারও দোষ-ত্রুটিকে ঢোল পিটিয়ে রটিয়ে দিলে কোন লাভ হয় না, বরং তাতে অনেকে উল্টো বেপরোয়া হয়ে ওঠে। যদি সত্যও হয়, তবুও এতগুলো ভদ্রবাড়ির মেয়ের চরিত্র নিয়ে মাঝময়দানে লেখালেখি করা খুবই অন্যায়।

শুধু সন্দেহ নয়, বিচিত্র রকমের গুজব উড়ছে চারদিকে। পূর্ণিমারা নাকি চিরকালের মত চলে যাচ্ছে এ শহর ছেড়ে। সুমিতা নন্দী বিষ খাবার চেষ্টা করেছিল বোধ হয়। প্রীতি মুখার্জীর দাদা খুব সম্ভবতঃ গুণ্ডা লাগিয়েছে—যে এসব লেখা লিখছে, তাকে খুন করা হবে। সুমিতার জোর করে বিয়ে দেওয়া হবে এই মাসেই। গুজব উড়ছে—বিশ্বাস না করলেও অবিশ্বাস করার উপায় নেই। এতগুলি বাড়ির হাঁড়ির খবর কে আর স্বচক্ষে দেখে এসে সঠিক বলতে পারে? হ্যাঁ, সে কাজ একমাত্র পারে এবং যদি দয়া করে—সে হলো কালো পাথরের কবি।

মালা বিশ্বাস তাদের দেখলো একদিন, টাউন সিনেমার ওপরের গ্যালারিতে। প্রথম সারিতে বসে আছে—পূর্ণিমা, সুমিতা, সুধা ও প্রীতি। গুনে গুনে তারা ঠিক চারজন।

পাশে ও পেছনের সারিতে আরও অনেক মেয়ে বসে আছে। মালা একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে আছে একেবারে শেষ প্রান্তে—ঝক্‌ঝকে একটা আলোর ঝাড়ের নীচে।

মালা ভাল করে আর একবার দেখলো। হ্যাঁ ঠিক ওরাই চারজন। কিন্তু কবে ওরা এত ঘনিষ্ঠ হলো? আগে তো ওরা কেউ কাউকে ভাল করে চিনতোও না। আশ্চর্য, আজ ওরা এক হয়ে গেছে।

পেছনের সারিতে সেনপাড়ার মেয়েদের মধ্যে বসে আছে মুক্তি রায়, মালারই স্কুলজীবনের বন্ধু। ওরা সকলেই ব্যস্ত, সবাই উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখছে সামনের সারির চারজনকে। মুক্তি রায় এক এক করে চিনিয়ে দিচ্ছিল সকলকে—কে পূর্ণিমা, কে সুস্মিতা কে সুধা...।

পূর্ণিমারাও চুপ করে ছিল না। ওদের আলাপ গল্পের উদ্বেল কলরব সমস্ত গ্যালারিকে চুপ করিয়ে রেখেছিল। সকলেই আস্তে কথা বলে, শুধু পূর্ণিমারা ছাড়া। ওদের হাসি থামতে চায় না। একজন বাদাম কেনে, চারজন ভাগ করে খায়। ওরা তাকায় না কারও দিকে। সমস্ত গ্যালারির জনতা যেন প্রকাণ্ড একটা ছায়া মাত্র, শুধু ওরাই সজীব।

মালা একা পড়ে গেছে, তাকে কেউ দেখছে না। জীবনে বোধ হয় এই প্রথম সে আড়ালে পড়ে গেল। এত প্রখর বিদ্যুতের বাতিটার নীচে বসে আছে মালা, অষ্ট্রিচের পালকের বর্ডার দেওয়া মেরিনো পশমের জামা গায়ে, দু'ইঞ্চি লম্বা সোনার চেনে গাঁথা একজোড়া উদ্ভট প্যাটার্ণের দুল দু'কান থেকে ঝুলে ঘাড়ের ওপর লুটিয়ে আছে। তবু কোন বিস্মিত বিরক্ত বা ধিক্কারভরা দৃষ্টি কোন দিক থেকে তার দিকে তেড়ে আসছে না। মালা আজ নিষ্প্রভ হয়ে গেছে।

ছবির অভিনয় আরম্ভ হলো। ক্ষান্ত হ'ল গ্যালারির কলরব। আলোগুলি নিভলো। পূর্ণিমাদের সারি থেকে এক এক টুকরো হাসিভরা কলরব মাঝে মাঝে বাঁধভাঙা জলস্রোতের মত উছলে পড়ছিল। কে জানে, কোন্ সার্থকতায় ভরে উঠেছে ওদের জীবনে এই খুসিয়ালী রাত!

সিনেমার ছবি চোখের সামনে বৃথা ঝলসে পুড়ছিল! মালা ডুবেছিল তার মনের অন্ধকারে। কালো পাথরের সেই ভয়ঙ্কর কুৎসা, মনে পড়লেই আতঙ্ক হয়। মালা জান্‌তো, এই গরবিণীরাই তো মান হারিয়েছে। কিন্তু এ আবার কোন্ ছবি! এ যে নতুন করে মান পাওয়া। ওদের চোখে মুখে সেই তৃপ্তির উদ্ভাস!

পেছনের মেয়েদের দৃষ্টি আর এক তৃষ্ণার ছলনায় ছলছল। ওরা তাকিয়ে আছে পূর্ণিমাদের দিকে—এক দুরধিগম্য মহিমলোকের দিকে। ওখানে আসন পেতে হলে ছাড়পত্র চাই, সে বড় কঠিন ঠাঁই।

কালো পাথরের কবি মরে যায় নি।

সেদিন মেয়েদের বাৎসরিক আনন্দমেলার অনুষ্ঠান। রাণীঝিলের মাঠে বাঁশের জাফরি আর খেজুর-পাতার ঘেরান দিয়ে সারি সারি স্টল সাজানো হয়েছে। পথে যেতে সবাই দেখলো, বহুদিনের স্তব্ধ পাথরটা আবার মুখর হয়ে উঠেছে।—"মুক্তি রায়, অমন মেঘে ঢাকা চাদের মত ফুলবাগানে গাছের আড়ালে আর কতদিন থাকবে? আজকাল সব সময় হাতে ওটা কি থাকে? কাব্য-গ্রন্থ? তোমার আসল কাব্য ভাল আছেন মজঃফরপুরে। আমার আর কি লাভ? শুধু যখন হেঁটে চলে যাও, তখন পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখি। বড় সুন্দর তোমার চলার ছন্দ। মুখের দিকে তাকাতে ভাল লাগে না। স্নো-পাউডার দিয়ে কি চোখের কালি ঢাকা পড়ে? অসুখটা সারাবার ব্যবস্থা কর।"

দলে দলে মেয়েরা এসেছে আনন্দমেলায়। মালা বিশ্বাসও এসেছে। আজ তার বেশভূষার কেমন একটা উদভ্রান্ত দীনতা। একটা সাধারণ মিলের সাড়ী, আঁচলটা আধ হাত ছেঁড়া। দেশী ছিটের একটা আধময়লা ব্লাউজ। পায়ে জুতো নেই, চোখে নেই চশমা।

চন্দ্রার দিদিরা একটা স্টল নিয়েছে। হরেক রকম ফুলের তোড়া আর বুকে বিক্রী হচ্ছে সেখানে, এক আনায় একটি। স্কটিশ মিশনের মেয়েরা খুব ভীড় করেছে সেখানে, তোড়া কেনার জন্য। মালা সেখানে সামান্য একটু দাঁড়িয়ে আবার এগিয়ে চল্‌লো।

মালতীরা একটা স্টল নিয়েছে—ঘরে তৈরী নানারকম জ্যাম জেলী আর চাটনী শিশি ভরে সাজিয়ে রেখেছে। সেখানে কোন ভীড় নেই, তবু মালতীর অনুরোধে দাঁড়ালো একবার। এক শিশির দাম ছ'আনা পয়সা রেখে দিয়ে মালা বলে গেল, ফেরবার সময় নিয়ে যাবে।

মালার চোখে পড়েছে—একটু দূরেই রাণুদের ম্যাজিকের স্টল। ভীড় সেখানেই সব-চেয়ে বেশী। নবীনা প্রবীণা সকলেই সেখানে দলে দলে ঘাসের ওপর বসে পড়েছে। কী এমন আকর্ষণ আছে রাণুদের স্টলে?

আর একটু এগিয়ে যেতেই নজরে এল, হ্যাঁ কারণ আছে। সেখানে বসে আছে পূর্ণিমাদের দল। আজ তাদের মধ্যে একটা নতুন মুখ দেখা যাচ্ছে, মুক্তি রায়। পূর্ণিমারা সবাই খুসী হয়ে ম্যাজিক দেখছিল, আর সবাই দেখছিল পূর্ণিমাদের।

মালার চলার বেগ শান্ত হয়ে এল। ওদিকে এগিয়ে যেতে ওর বুকটা যেন দুরু দুরু করছে আজ। কিন্তু যেতেই হবে তাকে। তার ছেঁড়া কাপড়, খালি পা, নোংরা ব্লাউজ। নিশ্চয় তাকিয়ে দেখবে সবাই, পূর্ণিমারাও দেখবে।

হঠাৎ পাশে অনেকগুলি বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে চীৎকার করে ডাকল—মালাদি ! মালাদি !

মালা মুখ ঘুরিয়ে দেখলো অনুপমা ডাকছে তাদের চায়ের স্টলে। সবাই মিলে চিৎকার করে মালাকে চা খেতে অভ্যর্থনা জানাচ্ছে।

কি ভেবে নিয়ে মালা স্টলের ভেতরে গিয়ে বসলো। পর পর তিন কাপ চা খেল। অনুপমারা খুব খুসী। বয়স্কাদের মধ্যে কেউ তাদের এক কাপ চা খেয়েও অনুগৃহীত করেনি। কত চেনা অচেনা মহিলাদের হাত ধরে ওরা টানাটানি করেছে, কিন্তু কারও হৃদয় গলেনি।

অনুপমা মানুষ জাতির ওপর তাই চটে গেছে। ম্যাজিকের স্টলের দিকে তাকিয়ে চড়া মেজাজে বলে—বুঝলে মালাদি, আমাদের দোকানের সব বিক্রী মাটি করে দিয়েছে রাণুদি। কাঁচা আম জলে ডুবিয়ে দেখাচ্ছে আম নেই। ছাই ম্যাজিক, ওটা তো চিনির তৈরী আম।

মালা—রাণু তোমাদের দোকানের বিক্রী মাটি করে নি।

অনুপমা—তবে কে ?

মালা—করেছে··· ।

উত্তর দিতে গিয়ে মালা হঠাৎ সামলে গেল। অনুপমার মত এতটুকু মেয়েকে অবাক করে দিয়ে আর লাভ কি ?

চায়ের স্টলের সামনে দিয়ে কতজন আসছে যাচ্ছে। মালা আজ জোর করে সকলের চোখের ওপর ভেসে রয়েছে। তবু যেন তাকে কেউ লক্ষ্য করছে না। একটু দূরেই বসে রয়েছে পূর্ণিমারা। খুবই ইচ্ছে করছিল সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে। আজও ভীড়ের পাশে গিয়ে দাঁড়ালে হয়তো সবাই তাকিয়ে দেখবে তার এই ছেঁড়া-ময়লা সাজ—তার নিরাভরণ জীবনের চরম বিনতি। এই তো দেখাবার মত একটা নতুন জিনিস। কিন্তু যদি কেউ না তাকায়, এই আবেদনও যদি ব্যর্থ হয়। মালার সাহস হলো না।

মালা যেন আভাষে দেখতে পাচ্ছে—এই মেলার ভীড় ভাগ করে দেওয়া হয়েছে তিন ভাগে। এখানে একদল আছে, যারা পূর্ণিমাদের মত অসাধারণ। একদল রয়েছে, রাণু অনুপমা ও এই পাঁচশত নবীনা প্রবীণার মত সাধারণ। আর আছে মাত্র একজন —মালা বিশ্বাস—সাধারণের নীচে। তার এতদিনের আত্মবিজ্ঞাপনের সাধনা ব্যর্থ হয়ে গেছে।

সেবক সমিতির বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে আবার। সেক্রেটারী ননীবাবু বললেন —একটা দুঃখের কথা বলবো আজ।

ননীবাবুর গলার স্বরে বোঝা গেল, অদ্ভুত কিছু একটা ঘটেছে। সভ্যেরা কৌতূহলী

হয়ে ননীবাবুর মুখের দিকে তাকালো। ননীবাবু টেবিলের আলোটার গায়ে একটা বই মেলে দিয়ে তাঁর চিন্তিত মুখের ওপর যেন আরো খানিকটা অন্ধকার মেখে নিলেন।

—তোমাদের গ্যারেন্টি দিতে হবে, একথা আমাদের ক'জন ছাড়া বাইরের কোন জীবের কানে পৌঁছবে না! সে ধরা পড়ে গেছে—কালো পাথরের লেখাগুলি যার কুকীর্তি। এ কাজ করেছে চৌধুরী মশাই।

কথাগুলি যেন মাথায় হাতুড়ি মেরে ভয়ানক একটা ঠাট্টা করে বসলো। প্রিয়তোষের রাগ হলো—আপনি কি তার কোন প্রমাণ পেয়েছেন?

ননীবাবু—ইয়েস্। যারা দেখেছে স্বচক্ষে, তারাই বলেছে।

প্রিয়তোষ—কে স্বচক্ষে দেখেছে?

ননীবাবু—তাদের নাম বলতে আমি বাধ্য নই।

ননীবাবুর চোখদুটো মিটমিট ক'রে এক দুর্বোধ্য প্রদীপের মত জ্বলতে লাগলো।

সেবক সমিতির দায়িত্ব সমাপ্ত হলো এইখানে। কিন্তু এই উদ্ভট অকল্পেয় তথ্যটা প্রতিজ্ঞা দিয়ে বেঁধে গোপন রাখা সম্ভব হলো না। দুদিনের মধ্যেই সকলে জানলো, বার লাইব্রেরী থেকে আরম্ভ করে গুরুদাসের ঘড়ির দোকান পর্যন্ত। যে শোনে সেই লজ্জা পায়, আপত্তি তোলে—এও কি সম্ভব?

তবু এই বিশ্বাসের সম্পদ হারাতে কেউ রাজী নয়। হোক না শোনা-কথা। শোনা যাচ্ছে কেউ একজন স্বচক্ষে দেখেছে। তাহলেই হলো।

বিশ্বাসবাড়ির জানালায় সেই অচঞ্চল মূর্তিও আর দেখা যায় না। ক্রসরোডের কালো পাথরে আর লেখা পড়ছে না। শহরের উৎসাহে মন্দা পড়েছে। জমাট গানের মাঝখানে হঠাৎ যেন সুর ছিঁড়ে গেল।

আজকাল ঘরের ভেতরেই থাকতে ভালবাসে মালা। বাইরের পৃথিবী, সেখানে মানায় পূর্ণিমাদের। ওরা অঘ্রাণের তারা, সন্ধ্যা সকাল ওদেরই শুধু দেখতে হয়।

সার্থক জীবন পূর্ণিমাদের। ওরাই প্রার্থিতা। আড়াল থেকে মুক্ত করে এনে সংসার ওদেরই মুখ দেখতে চায়। ওরা দয়িতা—কামনার লীলাকুরঙ্গী। কুৎসা কলুষও ধন্য হতে চায় ওদেরই আশ্রয়ের প্রসন্নতায়। আর, সকল কামনার সীমানার ওপারে, এক বেদনাহীন বিরাগের মরুস্থলীতে দাঁড়িয়ে আছে মালা। সে একা, সে নিঃস্ব।

মালা নিজেকে বন্দী করে ফেলেছে। সব দেখা আর দেখা দেওয়ার পালা শেষ হয়ে গেছে। ওর মধ্যে কোন সত্য নেই। পৃথিবীর চোখের ওপর নিজেকে যে এতদিন অকুণ্ঠভাবে সঁপে দিয়ে এসেছে, সেই মুছে গেল আজ। এই বুঝি দুনিয়ার রীতি!

জানালার খড়খড়ি দিয়ে পড়ন্ত রোদের এক ফালি ঘরে এসে পড়েছিল। আনমনে জানালাটা খুলে দিয়েই মালা বন্ধ করে দিল আবার।

আয়নার সামনে বসেছিল মালা। নিজের চেহারা চোখে পড়তেই মুখ ফিরিয়ে নিল। আর বুঝতে বাকী নেই, এ চেহারা যদি গ্রহের মত আকাশে ভেসে বেড়ায়, তবুও চোখ তুলে কেউ তাকাবে না।

এক এক সময় মালা চেষ্টা ক'রেও তার অস্থিরতাকে চেপে রাখতে পারে না। মনে হয় বাইরের বাতাসে নিশ্বাস না নিলে যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে তার। তবু জোর করে কপাটে খিল এঁটে দেয়—কোন পলাতকার পায়ে যেন বেড়ি পরিয়ে তাকে সবলে ধরে রাখে।

সন্ধ্যে হয়ে আসে, অনেকদিন পরে চাঁদ উঠেছিল আবার। মালা জানালা বন্ধ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ একটা ঝড়ো মেঘে ঢাকা পড়ে গেল। দৃশ্যটা ভালোই লাগলো মালার। মালা ডাকলো—রামজীবন, আমি বেড়াতে যাব এখনি।

সাজ-সজ্জার পর মালা কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইল আয়নার সামনে। চোখের জলে দু'দুবার মুখের পাউডার ভিজে গেল। রামজীবন বার বার হাঁক দিচ্ছে। নিজেকে একরকম জোর করে ঘরের বাইরে টেনে নিয়ে গেল মালা।

রাণীঝিলের চারদিকে দু'বার ঘোরা হলো, মাঠটা আড়াআড়ি দুবার হাটাফেরা হলো। দিক ছাপিয়ে অন্ধকার আসছে। পুবে পশ্চিমে দেওদারের মাথা শিউরে উঠছে। বনজোয়ানের গন্ধমাখা ধুলো ছিটিয়ে পড়ছে চারদিকে। ঝড় আসছে। রামজীবনের হাঁক ডাকে অগত্যা মালা ফিরলো ঘরের দিকে।

রামজীবন এগিয়ে গেছে কিছু দূর। মালা খুবই আস্তে আস্তে যেন টেনে টেনে চলেছিল। হ্যাঁ, এই যে ক্রসরোডের মোড়। এই তো সেই পাথর, অন্ধকারে যেন কারও প্রতীক্ষায় বসে আছে।

মালা থমকে দাঁড়ালো। এই সেই পাথর, এই কলঙ্ককীর্তনিয়ার প্রসাদে কত নগণ্যা গরীয়সী হয়ে উঠেছে। অপবাদ হয়েছে প্রশস্তি। কিন্তু এ পাথরের মনে সুবিচার নেই। এর সব চক্রান্তকে আজ একটি আঘাতে চূর্ণ করে দেওয়া যায়। কালো পাথরের কবিকে কেউ ধরতে পারেনি, মালা তাকে আজ নিঃশেষ করে দিতে পারে। সব পরাজয়ের প্রতিশোধ নিতে পারা যায় এতক্ষণে। মালা যেন একটা ঝাঁপ দিয়ে লুটিয়ে পড়লো পাথরটার ওপর। ব্লাউজের ভেতর থেকে টেনে বার করলো এক টুকরো খড়ি।

বিদ্যুৎ চমকবার আগে, রামজীবনের হাঁক শোনার আগেই খড়ির আখরে এক স্তবক ঘনঘোর মিথ্যা সাদা ফুলদলের মত ছিটিয়ে পড়লো কালো পাথরের গায়ে।

—মালা বিশ্বাস, তোমায় দূর থেকে সেলাম করি। এক দুই তিন চার···থাক্, বেচারাদের নাম আর করবো না। কত পতঙ্গের পাখা পুড়ে গেল। আর সংখ্যা বাড়িও না। তোমার চিঠির তাড়া রাণী ঝিলের জলে ভাসিয়ে দিয়ে এবার সুস্থির হও।

উচলে চড়িনু

তেঁতুলিয়া মাঠের ঘাসের রঙ বার মাস সবুজ। অনেক দিন আগে ভোরবেলা ঘুম ভেঙে বাইরে আসতেই দিনেশ বড় সুন্দর একটা দৃশ্য দেখেছিল। তেঁতুলিয়া মাঠে লাল কৃষ্ণচূড়ার ভাঙা ভাঙা ডালপালা ছড়িয়ে রয়েছে। ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে এসেছিল কোথা থেকে। আজ আবার ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে—তেঁতুলিয়া মাঠের সবুজে হঠাৎ কোন উত্তুরে হাওয়ায় রক্তিম তুষারের ফুল কতকগুলি এসে ছড়িয়ে পড়েছে। একদল ইরাণী বেদের মেয়ে—মাঠের এককোণে পড়েছে তাদের তাঁবু।

পরণে খাট খাট লাল ঘাগরা, হাঁটবার সময় কেঁপে দুলতে থাকে। মনে হয় ওটা বুঝি ওদের গায়ের পালক। নিটোল খালি পা—গোলাপী মোমের প্রলেপ দেওয়া। রুক্ষ বেণীগুলি কোমর পর্যন্ত ঝোলে। গায়ে বেগুনী রঙের জামা, চুড়িদার আস্তিন কব্জি পর্যন্ত। মাথায় কপাল চেপে রুমালের ফেট, তার নীচে লালচে মুখ, টিকালো নাক আর তার দুপাশে জোড়া জোড়া চোখ যেন কাস্পিয়ান নীলিমায় টলমল।

মাঠের অন্যদিকে হল্লা আর হররা চলেছে খুব। বেদিয়া যুবকেরা ছোট ছোট জুয়ার বৈঠক বসিয়েছে। বাজারের বহু উৎসাহী জুয়াড়ী সেই ব্রাহ্মমুহূর্তেই এসে ভীড় করেছে গন্ধে গন্ধে—ভাগ্যের সঙ্গে প্যাঁচ কসে নিচ্ছে এক হাত। অথবা রাত্রেই সুরু হয়েছিল—হারজিতের টানা-পোড়েনে মাৎ করে আর মার খেয়ে দেখতে দেখতে ভোর হয়ে গেছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। দত্ত কোম্পানির আফসে এতক্ষণ ধর্না দিয়ে ঘরে ফিরেছে দিনেশ। মাত্র পাঁচটা টাকা এডভান্স, তাও চেয়ে পাওয়া যায় নি। তবে শুধু হাতে ফিরতে হয়নি।

পথে ফিরতে বিলাসী কোত্থেকে এসে তার হাতে গুঁজে দিয়ে গেছে কয়েকটা টাকা—"ধারই দিলাম বাবু। যখন পার শোধ করে দিও।"

খনির মজুরণী বিলাসী, এ বয়সেই পাঁচবার সাঙ্গা তালাক করেছে। নামকরা নেশাডী—স্পেশল কালো কঠিন চেহারা। মুখ ও বুকের ছাঁদে নারীত্বের কোমলতাটুকু তবু অটুট আছে। গতরভাঙা পরিশ্রমে পুরুষ মজুরও ওর কাছে হার মানে।

বিমর্ষ দিনেশ ঘরের বাইরে দাওয়ার ওপর বসে ভাবছিল। ভাবতে ভাবতে হিষ্টীরিয়ার মত শরীরে একটা তীব্র কম্পন আর অবসাদ নেমে আসে। কিসের বিরুদ্ধে যেন তার একটা অভিযোগ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে।

বছর দু'এক আগের কথা, কলেজের বার্ষিক উৎসবে দিনেশ তার রোমান রিংয়ের খেলা দেখিয়েছে। বাঘের চামড়ায় আঁটসাট জাঙ্গিয়া, খোলা গা। দোলায়মান রিংয়ের

ওপর কসরৎ। লীলায়িত পেশীপুঞ্জের রক্তরাগে ফুটে ওঠে প্রাণের শ্রেষ্ঠ সম্মানলিখা। করতালির বরষা আর শত শত দর্শকের বিমুগ্ধ দৃষ্টির আশীর্বাদ। গ্যালারি থেকে কনভেন্টের মেয়েদের রুমালের উৎক্ষেপ আর হর্ষের কাকলি। কোথায় মিলিয়ে গেল সে ছবি!

বাঙালী সমাজে কাণা খোঁড়ার জীবনেও বিয়ের ফুল ফোটে। ভবিষ্যপুরুষের ধমনীতে তারা সঁপে দিয়ে যায় শুধু কতগুলি পঙ্গু বীজাণুর প্রবাহ। তাতেও দোষ নেই। যত বিচার আর ব্যতিক্রম শুধু দিনেশের অদৃষ্টে। বিয়ের সম্বন্ধ আসে আর ভেঙ্গে যায়। পাত্রের যা রোজগার—এক সপ্তাহের পেটের খোরাক যোগাতেই নিঃশেষ। কন্যাপক্ষ আতঙ্কে পিছিয়ে যায়।

এদিকে দত্ত কোম্পানী আবার মাইনে কাটে। দিবারাত্রি দু'দফা সিফট চলে। খনি হাতড়ে মাল ওঠে না। এটাও যেন তারই অপরাধ। এর চেয়ে সাত সাগর ছেঁচে মুক্তা আনাও বোধ হয় সহজ।

দিনেশের অন্তরাত্মা হিংস্র হয়ে ওঠে। তাঁর চেয়ে ভাল ফ্যাকাসে তোবড়া একটা মুখের ভেতর দুপাটি পোকাপড়া দাঁত—সোনা দিয়ে বাঁধানো। অস্থিসার একটা নড়বড়ে শরীরে অজীর্ণ আর অম্লশূল—কাশ্মীরী শালে ঢাকা। যে কোন ঘটক দেখলেই খুসিতে আটখানা হয়ে যাবে। যেন ঐ সোনা আর শালের ঔরসে জন্ম নেবে জাতিধর আর বংশধরের দল।

আরো মুস্কিল হয়েছে ভদ্রলোক হয়ে, লেখাপড়া শিখে। জীবনের দুর্ধর্ষ আবেগ টেনে নিয়ে যায় পাতালের দিকে। বিলাসীকে নিয়ে যে জনরব গড়ে উঠেছে তার সম্বন্ধে —সেটা সত্য হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু রুচিতে বাধে। পদে পদে ভদ্রয়ানার নিষেধ—ভীরুতা। অভাবে স্বভাব নষ্ট হবে, এ হতে পারে না।

আবার মনে হয় সমাজ সংসার মিছে সব। এই জঙ্গল আর পাথরের চটান। চুনা পাথরের ধস্ নেমে গেছে নদীর গড়খাই পর্যন্ত— অগণ্যকোটি কীটের চূর্ণাস্থি। এই সেই গণ্ডোয়ানা ভূমি যেখানে গলিত প্রস্তরের নিশ্বাস শূন্যে মিলিয়েছে একদিন। যে পরমাণুর যজ্ঞে সৃষ্টি হ'লো হীরা, পান্না, পোখরাজ, নীলা, পদ্মরাগ। প্রথম প্রেমে মরণাহত কত অতিকায় গোধিকার চুম্বন আঁকা আছে এই পাষাণে পাষাণে। দিনেশের ইচ্ছে হয়, অর্বাচীন বিংশ শতাব্দীর এই সংকুচিত জীবনের জঞ্জাল ঠেলে দিয়ে বিলাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়ায় আত্মনাশের আনন্দে।

কিন্তু তা হয় না।

ঘরে চোর ঢুকেছে। দিনেশের ঘুম ভেঙে গেল। খুট্ খাট শব্দ।

বড় ভুল ক'রেছে চোর। দিনেশ ভাবতে গিয়ে নিজেই লজ্জিত হলো। এ ঘরে চুরি করার মত কিছু নেই। কি নেবে চোর? পাশের ঘরে আছে একটা রুটী সেঁকার তাওয়া, বেলুন, চাকি, খুন্তি আর এলুমিনিয়ামের ডেকচি। বারান্দায় আছে এঁটো থালা আর গেলাসটা। উঠোনে একটা পাইখানা যাবার পেতলের গাড়ু। পশ্চিমের ঘরে শুধ্ একটা এনামেলের গামলা— ছোলা ভেজান আছে। এর মধ্যে কোন্ জিনিষটি চোরের পক্ষে লোভনীয় হ'তে পারে?

একটু দূরেই তো ছিল দত্ত কোম্পানীর অভ্রের ষ্টোর। হাঁপানী রুগী কুঁজো মুকুটধারী সিং বন্দুক ঘাড়ে পাহারায় রয়েছে। চোর যদি তার সামনে গিয়ে একটু জোরে কাশে তবে বন্দুক খসে প'ড়বে হাত থেকে—নির্ঘাত! তারপর কাঠের বাক্সগুলি ভেঙে ফেললেই হলো—হাজার পাঁচ তো পাবেই। কিন্তু গবেট চোরগুলোর চোখে সোজা রাস্তা তো পড়ে না। এসেছে ওভারম্যান দিনেশের ঘরে।

আরও ভুল করেছে চোর। সে জানে না এখানে থাকে দিনেশ চৌধুরী—যে সাড়ে পাঁচ ফুট লম্বা, পুরো দম টানলে যার বুকের বেড় বেলুনের মত ফুলে আটচল্লিশ ইঞ্চি হয়, আধ ইঞ্চি পুরু ও আড়াই ইঞ্চি চওড়া লোহার পাত যে চিটেগুড়ের মত দুমড়ে মুচড়ে দেয়। দৈবাৎ যদি চোরের হাতে দিনেশের ঐ লোহার পাঞ্জায় ধরা পড়ে, কি হবে পরিণাম? একটি হ্যাঁচকা টানে কাঁধ থেকে ছিঁড়ে খুলে আসবে না কি?

সত্যি চোর ঢুকেছে, এ ব্যাপার জেনেও দিনেশ আবার গায়ে চাদরটা টেনে নিল। ঘুমের আরামটুকু নষ্ট করে লাভ নেই। চোরের যা সাধ্যি থাকে করুক।

কিন্তু মনে পড়লো বড় আয়নাটা. রূপোর ফ্রেমে বাঁধা। পশ্চিমের ঘরে দেয়ালে টাঙ্গান আছে। কমিশনার সাহেবের মেম কসরৎ দেখে খুশি হয়ে এটি উপহার দিয়েছিলেন। পঁচিশজন গুরুভার মানুষে বোঝাই একটা গরুর গাড়ির চাকা ঘাড়ের ওপর দিয়ে পার করেছিল দিনেশ, যার জন্মে আজও একটা ঘাড়ের রগ মাঝে মাঝে টনটন করে।

এখন মাসের শেষ। একটা গামছা দিয়ে ঢাকা আছে আয়নাটা। খোরাকের কমতি পড়েছে এখন, তাই ডন বৈঠক মেহন্নতও বাদ পড়েছে। এখন চলেছে শুধু ঝিঙের তরকারী আর ভাত। এই খোরাকে এক্সারসাইজ ক'রলে ক্ষতি হয় শরীরের—দম ঢিলে হয়ে আসে, পেশিগুলো রুক্ষ হয়ে কুঁচকে যায়। একটুতে ক্লান্তি বোধ হয়।

পাঁয়ত্রিশ টাকা মাইনে। তবু মাসের প্রথম কটা দিন প্রতি নিঃশ্বাসে, মাংসপেশীর প্রতিটি লীলায়িত নৃত্যের মধ্যে দিনেশ প্রাণের আস্বাদ পায়। পেট ভরে রুটী তরকারী —একপো ঘিয়ের ফোড়ন দেওয়া অড়হরের ডাল—একটু সুরুয়াদার মাংসের কারি— সকালের দিকে মোষের দুধ—বিকেলে বাদামের সরবৎ। ডন বৈঠক আর বারবেল

ভাঙার পর তেলে মাজা শরীরে স্নান সেরে দিনেশ এই আয়নার সামনে এসে দাঁড়ায়, আয়নার বুকে সেই অপার স্বাস্থ্যমহিমার প্রতিচ্ছায়ার পায়ে তার মন অনুরাগের আবেশে নুয়ে পড়ে।

আয়নাটা গেলে ক্ষতি হবে। দিনেশ বিছানা ছেড়ে উঠলো।

দিনেশের পায়ের শব্দে একটা চোরের ছায়ামূর্তি ঘরের ভেতর থেকে ছিট্‌কে বারান্দায় এসে পড়লো—সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে পড়লো দিনেশের লোহার মত দুটি বাহুর পাকে। মুহূর্তের মধ্যে চোরের শরীর নরম নতুন বালিসের মত চেপ্টে যেন এতটুকু হয়ে গেল।

দুড় দুড় আওয়াজ। আরও কজন চোর উঠোনের পাঁচিল ডিঙিয়ে খিড়কির দোর খুলে পালিয়ে গেল।

বন্দী চোর হাঁপাচ্ছে। দিনেশের কানের কাছে চোরের কাতর স্বর বেজে উঠলো, অতি করুণ এক আবেদন—'উঃ, গায়ে ফোড়া আছে, বড় লাগছে।'

আচম্‌কা শিথিল হয়ে পড়লো দিনেশের বাহুবন্ধন। দ্বার খোলা পিঞ্জরের পাখীর উল্লাসের মত চোর একবার মরিয়া হয়ে ছটফটিয়ে উঠলো মুক্তির জন্য। কিন্তু দিনেশ তার ভুল বুঝে সামলে নিল।

আর একবার কেঁপে উঠলো দিনেশ। চোর তার বুকের ওপর বসিয়ে দিয়েছে হিংস্র এক কামড—নির্বিষ সাপের ছোবলের মত একটু চিন্ চিন ক'রে উঠলো শুধু। স্প্রিংয়ের মত পেশিতে দাঁত ব'সতে পারে না—চামড়াটা শুধু ছড়ে যায় সামান্য। দিনেশ আর একবার কষে দিলে তার নিদারুণ আলিঙ্গন গ্রন্থি। নিষ্পিষ্ট চোরের দম ফেটে এক পরম হতাশায় আক্ষেপ ফুঁপিয়ে বেজে উঠলো।

কিন্তু ধীরে শিথিল হ'য়ে আসছে দিনেশের হাত অলস অবসাদে। রেশমের মত নরম চুলেভরা চোরের মাথাটা দিনেশের চিবুকে ঘসা খেলে একবার। ছোট্ট একটা ঝাঁকুনি দিতেই চোরের মাথার বেণীটা চাবুকের মত দিনেশের কাঁধের ওপর সাপটে পড়লো। তার ওপর মিঠে ফুলের গন্ধ, বেণীতে গোঁজা ফুল, টাটকা সুলতান চাঁপা।

একটা স্বেদাক্ত মসৃণ মুখ মাছরাঙা পাখীর মত হঠাৎ ঝাপিয়ে পড়েছে দিনেশের মুখের ওপর। জেলির মত কোমল দুটি অদৃশ্য অধরের বিহ্বল চুম্বন। অগোচরের এই স্পর্শ তিলে তিলে গ্রাস করে নিচ্ছে তার পরিচয়। শরীরের প্রতি কণিকা যেন চূর্ণ হ'য়ে যাচ্ছে কাঠিন্য হারিয়ে।

বাইরের অন্ধকার থেকে মৃদু ঝড়ের স্রোতে ভেসে আসছে অতি করুণ একটা শব্দের কম্পন—ফাটা বাঁশির আওয়াজের মত। শত শত সাপ যেন ফণা তুলে শিষ দিয়ে ডাকছে সঙ্গিনীকে। দিনেশের হাত দুটি ঝুলে পড়লো।

এক মিনিট মাত্র। অবসাদের ঘোর কাটিয়ে উঠেই দিনেশ দেশলাই জ্বালালো।

হাতে চকচকে ছুরি—একটি ইরাণী বেদে মেয়ে—হাতড়েহাতড়ে দরজা খুঁজছে। এরাই এসেছে তেঁতুলিয়া মাঠে।

বাইরের আর একবার সাপের শিষের ঝড় শিউরে উঠলো একসঙ্গে। চোর খিড়কির দরজা দিয়ে চকিতে পার হয়ে চলে গেল।

দত্ত কোম্পানীর অভ্রের খনি। ওভারম্যান দিনেশ ডিউটি দিতে নেমে চললো সুড়ঙ্গের পথে। হাতে টর্চ আর বেঁটে একটা লাঠি। চওড়া ঢালু পথ নেমে গেছে—গাছের ডাল দিয়ে সিঁড়ি করা, পা ঠেকা দেবার জন্যে। মাথার ওপরটা যেন এক বিরাট পাষাণের চন্দ্রাতপ—গাঁইতার মারে চেঁচে ছুলে খিলান ক'রে দেওয়া হয়েছে। তবুও মাঝে মাঝে ফাটল—ভূভারের আক্রোশ যেন ভ্রুকুটি ক'রে রয়েছে। কাঁচা গাছের তক্তা দিয়ে খিলানটা এক প্রস্থ তালি মারা হয়েছে—পচে ছিঁড়ে গেছে আদ্ধেক কাঠ। তারই ফাঁকে চুঁয়ে পড়ছে ভুস্‌কো মাটি, কাদাজল আর কাঁকর। একটা শিমুলের শেকড় সাপের লেজের মত ঝুলছে। ঢালু সিঁড়িটা শেষ হয়েছে যেখানে—ছাতটা যেখানে পাকা ফোড়ার মত ফুলে উঠেছে। এক ভয়ংকর পরিণামের আশঙ্কায় টনটন করেছে জায়গাটা। দুর্বল আশ্বাসের মত কয়েকটা কাঠের খুঁটি দিয়ে ঠেকা দেওয়া হয়েছে।

নামতে নামতে দিনেশ এসে দাড়ালো ঢালুর শেষে—জায়গাটা প্রায় সমতল। দুধে মাটির কাদায় প ডুবে যায়। দুপাশে স্তরে স্তরে কেওলিন গলে রয়েছে। এখানে দাঁড়িয়ে আর কিছু দেখা যায় না। শুধু একটা খাড়া চানকের মুখ মাথার অনেক ওপরে বহিঃপৃথিবীর আলোয় রাঙা দিনমানের একটি বুদ্বুদের মত ভেসে রয়েছে।

এখান থেকে তিন দিকে তিনটে সুঁদ চলে গেছে। দুপায়ে গুঁড়ি মেরে আর দু থাবায় হেঁটে দিনেশ চললো—টর্চের আংটা দাঁতে কামড়ে। ধারালো কোয়ার্টসের নুড়িতে হাঁটু ছড়ে যায়। ঘাড় টাটিয়ে উঠলেও মাথা তোলা যায় না। মাথার ওপরে এবড়ো খেবড়ো পাথর—পাতাল দানবেরা দাঁত মেলে পড়ে আছে। বেসামাল হলেই মাথার খুলি ঠুকে যায়, ভেঙে যেতেও পারে। সরীসৃপের মত পাকিয়ে পাকিয়ে বুকে হেঁটে দিনেশ চলেছে ডিউটি দিতে—পঁয়ত্রিশ টাকার চাকরী।

নুড়ি ভরা পথটা শেষ হয়েছে। তারপর হঠাৎ একটা ঢালু। দিনেশ ঝুপ করে পড়ে গেল।

যেন একটা স্প্রিংয়ের গদি। একটা রামার গাদি। খনিকরের উপেক্ষিত কালো অভ্র রামা। রামা কালো ব'লেই অকেজো, কেউ ছোঁয় না। এ জায়গাটা তবু একটু সুপরিসর—চারটে দিক ঠাহর করা যায়। নইলে সুঁদের পথে একবার ঢুকলে মনে হয়—এ জগৎ যেন আয়তনতত্ত্বের বাইরে। দৈর্ঘ্য প্রস্থ বেধ—উত্তর দক্ষিণ পুর্ব পশ্চিম, সব

নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। শুধু অশরীরী একটা প্রাণ অচরিষ্ণু পাথরের স্তব দীর্ণ ক'রে এগিযে চলে—চাকরী ক'রতে।

দিনেশ উঠে দাঁড়িয়ে হাত-পাগুলো একবার টেনে সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যেন মেরুদণ্ডের আশ্রয়ে বসিয়ে দিল। সুঁদের পথ এবার আরও গভীরে ডানদিকে ঘুরে খাড়া নেমে গেছে। গুমোট বড বেশি—কাছে কোন চানক নেই। টর্চ জ্বাললেও পথ পরিষ্কার দেখা যায় না। কোটী কোটী অভ্ররেণু স্তব্ধ ঝড়ের মত পথ জুড়ে রয়েছে।

অনেকটা ঝুলে ঝুলে নামতে হয়। একটা দড়ি খুঁটোয় বেঁধে ঝুলিযে দেওয়া হয়েছে, গতির বেগে দেহের ভার যেন আয়ত্তের বাইরে না চলে যায়। পাশে একটা চওড়া খুপরি। রেড়ির তেলের একটা পিদিম নিভে রয়েছে। একটা শূন্যগর্ভ তাড়ির ভাঁড—কয়েকটা ভাঙা গালার চুড়ি। নামার পথে দিনেশ এখানে রোজই একবার জিরিয়ে নেয়।

এই খুপ্‌রিটা যেন পাতালপুরীর একটা পান্থশালা। শুধু মুনফা-শিকারী ব্যবসায়ী মানুষের নখরের আঁচড নয—প্রাণময মানুষের কামনার শিলালিপি লেখা রয়েছে এখানে।

দড়ি ধরে ধরে দিনেশ নীচে নেমে চললো। এই ধূলি ধাতু ও পাষাণের সংসারে সেও যেন পরমাণুর মত লঘু হযে আসছে। মর্ত্যলোকের যত পাপ পুণ্যের সংস্কার এই অতল অন্ধকারের শাসনে খসে প'ডেছে একে একে। মৃত্যু এখানে কত ঘনিষ্ঠ—তাকে প্রাণের মতই এখানে অনুভব করা যায়।

গন্ধকের ধোঁয়ার গন্ধ। দিনেশের চাকুরীর আস্তানা এগিয়ে আসছে। সুঁদের একটা সংকীর্ণ বাঁক—একটা কুঁযোর মত গর্তের মুখে এসে শেষ হয়েছে। হুম হুম হুম—একটানা একঘেয়ে একটা শব্দের গমক। পাষাণের হৃদ্‌পিণ্ডটা যেন অন্ধকারের নিঃশ্বাস ছাডছে। আবার মনে হয়, লক্ষ দীর্ঘনিশ্বাসের একটা ঘূর্ণি পাথরের পেটে বন্দী হ'য়ে আছে—ক্ষেপে ফেটে প'ডতে চায়।

কুঁয়োর মুখে এসে ঝুঁকে তাকাতেই এই শব্দ তাণ্ডবের যেন একটা ছন্দোবদ্ধ অর্থ পাওয়া গেল। খনিমজুর বানিয়াতিদের গান। মেয়ে-কুলি ধারিদের কলহাস্য। ঘান হাতুড়ির আছাড়ের গুরু গুরু ধ্বনি। মুডির স্তুপের ওপর ছপ ছপ ক'রে বেলচার টান প'ডছে। একেবারে নীচে একটা পিদিম—একটা আলোদানার চক্ষু যেন নিষ্প্রভ হ'য়ে রয়েছে।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে দিনেশ অন্ধ অজগরের মত লাফিয়ে পড়লো হাত তিনেক নীচে—সাত নম্বর দরজা, দিনেশের ডিউটি স্থল।

বানিয়াতিদের গান আর ঘান ছেনির উদ্দাম সংঘর্ষ বন্ধ হলো। পিদিমে আরও খানিকটা তেল ঢেলে সলতে উস্কে দেওয়া হলো। জেলেক-নাইটের ধোঁয়া ধুলো আর

ঘোলা আলোর সেই নীহারিকার মধ্যে দিনেশের চোখে প্রথম ধরা দিল একটি হাসি মুখ —প্রতীক্ষমান এক জোড়া চোখের সার্থক দীপ্তি—বিলাসী।

বিলাসী একটা বেলচা কোলের কাছে ধরে দাঁড়িয়ে আছে।—'আজ বড় দেরি হলো বাবু ?'

বিলাসীর দিকে একবার তাকালো দিনেশ—হাঁ, পাতালপুরীর মেয়েই বটে। ধুলোয় রুক্ষ চুলের ওপর অজস্র অভ্রের কুচি চিক্ চিক্ ক'রছে—যেন একটা চুমকির জালি দিয়ে ঘেরা। নোংরা শতছিন্ন কালো রঙে ছোপানো একটা ধূলিকীর্ণ শাড়ি—রসাতলের এক তপস্বিনীর মূর্তি! ওরা হাড় দিয়ে পাথর ভাঙে। মর্ত্যনারীর মত ওদের দেহ লালিত্যে লতিয়ে ওঠেনি। ধরিত্রীর এই তমসাবৃত জঠরলোকে ওদের অয়স্কান্তির কঠিন লাবণ্য কত নয়নাভিরাম তা এখানে না এলে কেউ বুঝবে না। এই পাষাণের ছন্দে ওদের যৌবন বাঁধা। যে কোন ক্লিওপেট্রাকে এখানে কুৎসিত প্রেতিনীর মত মনে হবে!

কিন্তু দিনেশের মন আজ ছন্দ হারিয়েছে। বিলাসীর কথার উত্তর না দিয়ে কাজের হিসেব নিতে মন দিল।

দুটো মেয়ে ধারি বেলচায় মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে আর ঘুমের ঘোরেই থুথু ফেলছে মাঝে মাঝে। মেয়ে দুটোর কণ্ঠনালি রবারের থলির মত এক একবার ফুলে উঠছে—বমির তোড় আটকাচ্ছে দাঁতে দাঁত দিয়ে।

বীভৎস। দিনেশ অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। বিলাসী এসে পাশে দাঁড়িয়েছে। দিনেশ সরে গেল।

বানিয়াতি লোটন বললো, "ওদের আজ আর হুঁস নাই বাবু। মানা ক'রলাম তবুও শুনলো না। নেশা করেছে।"

দিনেশের মেজাজ রুক্ষ হয়ে উঠলো, 'আর কে কে ? নাম বল্তো!'

'—আর চমন। একবার ঐদিকে তাকিয়ে দেখ বাবু।' লোটন হেসে ফেললো।

চমন পাথরের গায়ে একটা খুপরির মধ্যে হাত পা গুটিয়ে চোখ বুঁজে ধীর স্থির হয়ে বসে আছে। পাতালপুরীর কোন ভাস্কর যেন এক অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্ব মূর্তি রেখেছে খোদাই ক'রে।

তিন জনের হাজরি কেটে দিয়ে দিনেশ আবার কাজের কথাই পাড়লো, "একি ? এতখানি ছাড় রেখে বিঁধ দিয়েছিস কেন ?"

লোটন মুচকে হেসে বললো, "বাবু, আর একজনের হাজরি কাটতে হয় তা'হলে।"

দিনেশ, "আর কে ?"

বিলাসীর মাথাটা নেশায় দুলছিল। দিনেশের মেজাজী গলার স্বর শুনে, মুখে আঁচল

চাপা দিল ভয়ে। লোটন তেমনি মুচকে হেসে কাজের কথার উত্তর দিল, "ওটা বাজা পাথর বাবু। বিঁধে কিছু হবে না। মিছা বারুদ নষ্ট হবে।"

টর্চের আলো ফেলে দিনেশ চারদিকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলো। কোন দিকে কোন ভারসার চিহ্ন নেই। আজ সাত দিন ধরে কাজ হচ্ছে, দশ সেরও মাল ওঠে নি। জেলেকনাইটের করাল বিস্ফোরণে এই অন্ধ পাথরের বুক থেকে এক আধটু ধুলো চাপড়া ঝড়ে পড়েছে শুধু। মালিকের পয়সা নষ্ট হচ্ছে। এর পরিণাম কি হবে তা সেই জানে। এই পাতাল বেঁটে তাকে বার করতে হবে কোথায় অভ্রের রেতি—রত্নকায় সরীসৃপের মত কোয়ার্ট্‌সের বুকে লুকিয়ে আছে। নইলে মাইনে ও মজুরা মুন্সীজীর খাতায় চিরকাল কালির আখরেই লেখা থাকবে। হাতে আর আসবে না।

দিনেশের মেজাজ ধারি ও বানিয়াতিদের কাছে আজ একটু অন্য রকম লাগলো। হুমকি হুকুমবাজি তো এখানে অচল। তা ছাড়া দিনেশবাবু অতি দিলদার লোক। ধারি বানিয়াতি আর ওভারম্যানের ধর্ম এখানে একই সঙ্গে সমাহিত ছিল পাতালিক প্রীতির বন্ধনে। আজ এই ব্যতিক্রম কেন?

আর বিলাসী? সে তো বেশ ভালো ফাকানর কাজ জানে, কারখানায় বসে অভ্র কাটলে রোজগার অনেক বেশি হতে পারে। তবু ধারি হয়ে ঝুড়ি ও বেলচা নিয়ে নেমেছে এই মৃত্যুময় অভ্রমরীচিকার গহনে। যে সিফ্‌টে যত নম্বর দরজায় ওভারম্যান দিনেশের ডিউটি থাকে, বিলাসীও সেখানে থাকবে। খনিমহলে কথাটা কারও অবিদিত নেই। প্রত্যেক শ্রমিক ও শ্রমিকার কাছে ঐ দুজনের গল্প অনেকটা রূপকথার মত, আলোচনা করতে বেশ মজাই লাগে। এর মধ্যে কিছুই অশোভন, কিছুই অসুন্দর নেই।

সেই দিনেশবাবু আজ কেমন যেন বিসদৃশ হয়েছে। বিলাসীর সঙ্গে একটা কথাও হলো না। লাঠি ও টর্চ হাতে দিনেশ আবার সিঁড়ির তলায় এসে দাঁড়ালো। "—তোরা আবার একটা বিধ দিয়ে আওয়াজ কর। দেখ্‌, কপালে যদি কিছু থাকে। আমি ওপাশের ছোট গাড়াটা একবার দেখে আসি।"

সিঁড়ি ধরে একটু ওপরে উঠে আসতেই দিনেশ পেছনে নিঃশ্বাসের শব্দ শুনে মুখ ফিরিয়ে তাকালো। বিলাসী।

"—এ কি? তুই আসছিস কোথায়?"

"—তোমার সঙ্গে।"

"—না, নিজের কাজে যাও।"

বিলাসী সেখানেই দাঁড়িয়ে রইল নিথর অভিমানের শিলীভূত মূর্তির মত।

"—তালা নেবে! খুব সস্তা, খুব মজবুত। চোরে ভাঙতে পারে না, বউ পালাতে পারে না।"

দিনেশ চম্‌কে গিয়ে মুখ ফিরিয়ে দেখলো—একটা ইরাণী বেদে মেয়ে, যাদের তাঁবু পড়েছে তেঁতুলিয়া মাঠে। একটা বড় চামড়ার পেটি ঝুলছে কাঁধের ওপর—রকমারী পণ্য সামগ্রীতে পরিপূর্ণ।

"—দেখছো কি। তালা নেবে কি না বল?" মেয়েটা সরাসরি দাওয়ায় উঠে একেবারে দরজার মুখে এসে দাড়ালো।

দিনেশ তাকিয়েছিল। হাঁ, এই সেই মেয়ে। সেই রেশমী চুলের বেণী—সুলতান চাঁপা গোঁজা। হতভম্ব হয়ে ধরা গলায় দিনেশ আস্তে আস্তে ব'ললো, "কত দাম?"

মেয়েটা এদিক ওদিক দুবার তাকালো। ভুরু কুঁচকে কি ভাবলো। ছোট একটা পেতলের তালা তুলে ধরে ব'ললো, "দাম দশ টাকা।"

ফ্যাল ফ্যাল ক'রে কিছুক্ষণ তাকিয়ে দিনেশ আর কোন কথা না ব'লে দরজা বন্ধ ক'রে দিল। বাইরে থেকে মেয়েটা আর একবার চেঁচিয়ে ব'ললো, "আচ্ছা, পাচ টাকা। না হয়, দু'টাকা। জিনিস চেন না বেকুব?"

দিনেশের কানে কোন কথাই পৌছল না।

দুপুরের রোদ মাথার ওপর তেতে উঠেছে। দিনেশ তবু দাওয়ায় ব'সে আছে। আজকাল রোজই এই রকম হয়। বসে বসে দেখে তেঁতুলিয়া মাঠের চার দিকে তাতারসি কাঁপে—তৃষ্ণার ছবির মত। বেদে মেয়েটা হস্ত দস্ত হয়ে রোজই এ পথে তাঁবুতে ফেরে।—"পেলে টাকা?" যাবার সময় জিজ্ঞাসা করে যায়।

দিনেশের ইচ্ছে হয় একবার ডেকে প্রশ্ন করে—নামধামগোত্র। কেমন এই পথিক মানুষের দল, মেরুমবালের পাখার মত পথের প্রেমে যাদের স্নায়ু শিরা সতত চঞ্চল। মহাদেশের পরিদরীবন ধ'রে যায় আর আসে। ভাষা গান উৎসব, সবই পথ থেকে কুঁড়িয়ে নেয়। যেখানে পায় তুলে নেয় নতুন পাপপুণ্য, নতুন রক্ত, নতুন ব্যাধি। দিনেশের জানতে ইচ্ছে হয়, ওরা কাঁদতে জানে কি না। না শুধু হাসির ফুৎকারে জীবন উড়িয়ে নিয়ে যায় আয়ুর সীমানায়? ডাকতে সাহস হয় না দিনেশের।

"—আচ্ছা, এক টাকা। সস্তা করে দিলাম। এইবার রাজি হয়ে যাও।"

নির্লিপ্তভাবে এক নিঃশ্বাসে কথাগুলি বলে মেয়েটা চলে যায়। দিনেশও আর বড় বিচলিত হয় না। যাযাবরীর এই নিত্য চতুরালি গা-সহা হয়ে আসছিল।

গলায় চুনীর মালা আর ঘাঘরার শব্দে দিনেশকে সচকিত করে মেয়েটা একদিন সামনে এসে ভালমানুষের-মত চুপ করে বসলো। মুখ ঘুরিয়ে নিল দিনেশ। শীগ্‌গির চলে গেলে হয়। এ সব অপ্রাকৃতিক জীব—ঘনিষ্ঠ না হওয়াই ভাল। কিন্তু বড় সুন্দর।

"—কি ? তাকাতে ভয় পাচ্ছ বুঝি ? কোন ভয় নেই, যত খুশি তাকাও।"

কথার মধ্যে কোন আবেগ নেই তবু মোহ এসে পড়ে! দিনেশ তাকালো লজ্জা সত্ত্বেও।

"—একটু ঠাণ্ডা জল খাওয়াতে পার মেহেরবান !" মেয়েটা একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো।

ক্লান্ত হবার কথা। তুপায়ে পুরু ধুলোর ঢাকা পড়েছে। এই রৌদ্রে কতদূর ঘুরে এসেছে কে জানে। দিনেশ ব্যস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো জলের জন্য। এক তুরন্ত বনহরিণী দোরে এসে তৃষ্ণার জল চাইছে তার কাছে।

গেলাসে জল নিয়ে বাইরে আসতেই দিনেশ দেখলো মেয়েটা নেই। রাস্তা ধরে নিজের মনে চলে যাচ্ছে। পেছন ফিরে একবার তাকিয়েই খিলখিল ক'রে হেসে উঠলো।

দিনেশ সেদিন প্রতিজ্ঞা করে বসে আছে। আজ ডেকে ওর পরিচয় নেবেই। নিষ্কলঙ্ক রুবিঅভ্রের মত অমন সুন্দর চেহারা। ওর মধ্যে মানুষীর হৃদয় থাকবে না, এ কি ক'রে হয় ?

"—এই শোন, কাজের কথা আছে।" দিনেশ সহজস্বরে ডাকলো।

নকল ত্রাসে চোখতুটো বড় বড় করে মেয়েটা বললো, "ওরে বাবা, যাব না। জুলুম ক'রবে।"

দিনেশের প্রতিজ্ঞাটা যেন কিসের সংকোচে এলোমেলো হয়ে গেল, কিন্তু প্রত্যুত্তর তৈরী হবার আগেই মেয়েটা সটান চলে এল। বললো, 'আমার নাম সারা, তুমি একটাও তালা কিনলে না। কত ক'রে বললাম !'

হাসিমুখেই দিনেশ বললে, "তোমার তালা কিনবার মত লিয়াকৎ আমার নেই। আমি গরীব।"

সারার উদ্ধত দৃষ্টি যেন নরম হয়ে আসে। জিজ্ঞাসা করলো, "তুমি কি কর ? রোজগার কর না ?"

"—অভ্রের খাদে কাজ করি।"

"—খাদে ? ভেতরে নাম তুমি ?"

"হাঁ,—রোজই।"

"—তুমি আদমি নও। তুমি সাপ, নইলে গর্তে ঢোক কি ক'রে ?"

সত্যি এদের কথাবার্তার চালচুলো নেই। দিনেশ একটু বিরক্ত হয়েই চুপ করে গেল।

কতক্ষণ আনমনা হয়েছিল দিনেশ জানে না। হঠাৎ চোখে পড়লো সারা একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে তাকেই দেখছে—তুটি শান্ত মেয়েলী চোখের দৃষ্টি। দিনেশ খুশি হলো। সারার কণ্ঠস্বরে সত্যই মমতার আমেজও ফুটে ওঠে। বললো,—"তোমার বিবি নেই ?"

"—না।"

"—এমন নওজোয়ান তুমি। বিবি নেই? আজব তোমার কাণ্ড।"

দিনেশের সাহস বেড়েছে, "তুমি বিবি হবে?"

"—হব। বুড্ঢা হলে কিন্তু পালিয়ে যাব।"

'—আর তুমি বুড্‌ঢি হবে না বুঝি?"

সারা ততক্ষণ উঠে ঝোলাঝুলি পিঠে তুলে তর্ তর্ করে নেমে গেছে দাওয়া থেকে। ভুরু কুঁচকে মুচকে হেসে বলে গেল, "এত দিল্লগী ভাল নয় সাপ কাঁহাকা।"

আর একদিন সারা বললো, 'তোমার সঙ্গে ব'সে ব'সে শুধু গল্প আর গল্প। আর পারবো না। আমার রোজগার খারাপ হয়ে গেছে। মালিক আমায় জবাই ক'রে ছাড়বে, যদি জানে · · ।"

দিনেশ, 'কি?"

সারা, "যদি জানে তোমার সঙ্গে মোহব্বৎ হয়েছে।'

দিনেশ চমকে উঠলো।—এ কি কথা বলে? মোহব্বতের কথা যাযাবরীর মুখে? হিমনদের মত নিরাবেগ যাদের জীবনে হাসি কান্না উষ্মা অভিমান। পথে তুলে নেওয়া আর পথে ফেলে যাওয়া যাদের আনন্দ?

সারা, "হা মালিকের কানে একথা পৌঁছে গেছে। আমাকে হুঁসিয়ার ক'রে দিয়েছে। এ বেইমানীর সাজা কি জান তো? নেড়া করে তাড়িয়ে দেবে দল থেকে। ব'লবে—'যা তোর মাশুকের কাছে যা।" ওকে তো চেন না, একটা কুর্দ কসাই।"

সারার চোখ ছল ছল ক'রছে। হিমনদের গহনে অন্তঃশীল প্রবাহের কলক্রন্দন। সারা মুখ ফিরিয়ে নিল।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধতার পর সারাই কথা বললো। গলাটা যেন একটু ধরে এসেছে। ওদের ভাষায় মিনতি নেই, চোখ দেখে বুঝে নিতে হয়।—"তুমি চল।"

"—কোথায়?"

"আমার কাছে, আমার তাবুতে।"

"—তারপর?"

"—তারপর আর কি? থাকবে, ঢোলক বাজাবে।"

প্রস্তাব শুনে দিনেশ হেসে চুপ করলো। সারা বিস্ময়ের সুরে প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো, "এ কি হাসছো? জবাব নেই?"

দিনেশ তেমনি একটা ভাবিক্কি হাসি হেসে বললো, "আচ্ছা সে হবে হবে।" যেন কোন দোজবরে বাঙ্গালী স্বামী তার দ্বিতীয়পক্ষের একটা ছেলেমানুষী বায়না মিষ্টি কথায় ঠাণ্ডা করছে।

সারার দৃষ্টিও প্রখর হয়ে এল। আবার জিজ্ঞাসা করলো, "কি জবাব দিলে না ?"

আবার সেই ন্যাদাডে ভালমানুষী হাসি। দিনেশ শুধু বললো, "হাঁ, হাঁ, নিশ্চয় জবাব দেব।"

সারা মাঠেব পথে নেমে পড়লো।

সারা ভালবেসেছে। এতদিন পরে সত্যিকারের ট্রফি লাভ হয়েছে দিনেশের। জীবনের সব চেয়ে বড় বঞ্চনার ক্ষতে এতদিনে যেন একটু আসাহর প্রলেপ পড়লো। তার পৌরষের তোরণে এসে ইরাণী যাযাবরীর চিত্ত সকল উদ্‌ভ্রান্তি ঘুচিয়ে শান্ত হয়ে গেছে। নতুন করে যেন মধ্য এশিয়া জয় করলো সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত।

মনে পড়লো বিলাসীর কথা। ওর ওপর মমতা হয়। দুদিকের দুই আহ্বান। বিলাসী ডাকে মৃত্যুব গহনে, আর সারা ডাকছে জীবনেব খরস্রোতে। সারার নীল চোখের দিকে তাকিয়ে এক স্বর্গঙ্গাব কলরোল শুনতে পায় দিনেশ, শুধু ভেসে চলে যাবার আহ্বান। কিন্তু বিলাসীর কালো চোখ তাকিয়ে আছে নিঃসঙ্গ ভোগবতীর অতল থেকে, যেন ডুব দিয়ে তলিয়ে যেতে ডাকছে বার বার।

সারা এসে বিষণভাবে বললো, "কেমন আছ ? আমাদেব দিন ফুরিয়ে এল। এবার তাঁবু উঠবে। আর কি ? এবার একদিন এসে শেষ সেলাম জানিয়ে যাব।"

দিনেশের বিমূঢ় বিবর্ণ মুখের দিকে তাকিয়ে সারা কোন মতে হাসি চেপে রাখলো।

একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে দিনেশ সেদিনের মত ঘরোয়া কথা পাড়লো, যার ঘর নেই তার সঙ্গে। "—তোমাব বাড়ি কোথাও একটা ছিল তো ? সে কোথায় ? ইরাণ ?"

"—আমি ইরাণী নই। আমি জহান-কি-রাণী।" সারা খিলখিল করে হেসে উঠলো।

তার পরে সহজভাবে ভাটেব ছড়ার মত নিরর্গল কথার স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে চললো দিনেশকে।—"আমি তাজিকের মেয়ে, বাবা আমাকে বেচে দেয় এক খোরাসানী সদাগরের কাছে। হিন্দুস্থানে আসতে আজাদ এলাকার তোচিখেল বদমাসেরা আমাদের লুট করে। বড় বেইজ্জত হয় আমার। আমাকে তারা ধরে নিয়ে যায়। তারপর পেশোয়ার বাজার।"

সারার চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে গেছে। ঘাঘরার ধূলোর মত সমস্ত স্মৃতিভার সে যেন ঝেড়ে ফেলে দিতে চাইছে কথা ব'লে ব'লে।

—পেশোয়ারে বাজারে আমাকে তারা বেচে দিলে পাচ আফগানীর বদলে— মিয়াওয়ালী বেদিয়াদের কাছে। তারপর কানপুর। অসুখে ভুগে খোঁড়া হয়ে

গেলাম। মিয়াওয়ালীরা বেচে দিল কঞ্জরহাটিদের কাছে—একটা মুর্গীর দামও তারা পায়নি। রোগা শুকনো খোঁড়া মেয়ে মানুষ—কিই বা তার দাম হতে পারে? সেই থেকে আমি এই কঞ্জরহাটির তাঁবুতে। তারা নাচিয়ে নাচিয়ে আমার খোঁড়ামি ঠাণ্ডা ক'রে দিয়েছে। আর ভাল লাগে না, তবে বেইমানি ক'রে চলে যেতেও পারি না। ভাল লোক যদি কেউ আবার কিনে নিত!"

একটা আফ্‌শোষের শব্দ ক'রে সারা চুপ হলো।

"—তুমি আমায় কিনে নাও। যতদিনের জন্য ইচ্ছে কিনে নাও। যেদিন খুশি ছেড়ে দিও। কিছু টাকা দিলে মালিককে দিয়ে তোমার কাছে চলে আসি।" উত্তেজনায় রাঙা হয়ে উঠলো সারার মুখ।

এ প্রখর অনুরোধের আঘাতে দিনেশের নিরেট ভালমানুষী ভীরুতা একটু নাড়া খেল যেন। অধৈর্যে কাতর সারার গলার স্বর।—"তবু তুমি ভাবছো? না হয়, পরে আমায় আবার বেচে দিও। এমন নওজোয়ান মরদ, টাকা যোগাড় ক'রতে পার না। ইচ্ছে ক'রলে এক রাত্রে তুমি হাজার টাকা আনতে পার। আমি চললাম। সেলাম।"

সারা উঠতেই দিনেশ তাকে ধরে বসাতে গেল। সারা দু'পা পিছিয়ে বললো, "বাস্ ছুঁয়োনা। আমাকে ছোঁবার কোন হক্ নেই তোমার।"

দিনেশ, "এই তোমার মোহব্বত?"

সারার গলার স্বর আবার যেন কাতরতায় আকুল হয়ে উঠলো—"তুমি বোঝ না অন্ধ। এই মোহব্বতের জন্য আমায় সাজা পেতে হবে। প্রাণ যেতেও পারে। রোজগার নষ্ট করে তোমার সঙ্গে দোস্তি করেছি, সময় নষ্ট করেছি। মালিক সব কথা জানে। আমায় বাঁচাও।"

—"ভয় নেই সারা। আমি টাকা আনছি দু'তিন দিনের মধ্যেই। পাকা কথা দিলাম।"

"—জিতা রহো মাশুক মেরা। আমায় উদ্ধার করো। মালিকের দেনা শোধ ক'রে দিয়ে আমি চলে আসি তোমার কাছে।"

সরার মুখ কৃতার্থতার হাসিতে দীপ্ত হ'য়ে উঠেছে। আজ বিদায় নেবার সময় দিনেশকে একটা ছোট সলজ্জ আদাব জানিয়ে গেল। পথে নেমে চামড়ার ঝোলা থেকে বার করলো একট নাসপাতি। গুন গুন করে চাপা গলায় গান ধরে, নাসপাতি খেতে খেতে তেঁতুলিয়া মাঠের পথে হেলে দুলে চলে গেল।

টাকা চাই। কন্যাপণ। এই পরম নির্বন্ধের জন্যই দিনেশের নির্বাসিত যৌবন অপেক্ষায় বসে ছিল শুধু। বরপণের দেশে তাইতো সে পুরুষের মর্য্যাদা পায় নি।

ভালই হয়েছে। বীর্যশুল্কা যাযাবরীর চিত্তজয়ের আমন্ত্রণ এসেছে তারই কাছে। মধ্যযুগের ক্ষত্রপ প্রেমিকের মত আত্মপ্রসাদে দিনেশ যেন অস্থির হয়ে ওঠে।

বিলাসী এসে সামনে দাঁড়িয়েছে। সেদিনের আচরণের কথা স্মরণ ক'রে দিনেশ অনুতপ্ত হলো।

"—আয় বিলাসী, তোকে ছাড়া কাজ চলবে না আমার। একটা শক্ত কাজ আছে।"

এই আহ্বানের জন্যই বিলাসীর অন্তরাত্মা উদগ্রীব হয়ে থাকে। অনেকদিন আগেই এ আহ্বান শোনার দাবী ছিল তার। যার সঙ্গে ছায়া হয়ে মিশে থাকতে চায় সে, তারই কাছে। আর কারও কাছে নয়। যার হাত ধরার জন্য রোজগার, কুলমান, কুটীরসুখ ও আলো বাতাসের মায়া ছেড়ে নেমে এসেছে এই অতলতার অমারাজ্যে—যেখান মরণ ও মিলন মিশে আছে একাকার হয়ে।

যে সিঁড়ির কাছে সেদিন বিলাসীকে থামিয়ে দিয়েছিল দিনেশ, সেখানে থেকেই আজ আবার সুরু হলো যাত্রা। কোথায় কোন্ লক্ষ্যে, বিলাসী তা জানে না। তার জানবার প্রয়োজন নেই।

দিনেশের প্ল্যান ঠিক ছিল। বেলচা, শাবল, গুল্‌লা টোপি আর বেড়ির তেলের পিদিম নিয়ে তারা অগ্রসর হলো।

ছোট বড় নানা সুঁদের বাঁক ঘুরে ঘুরে একটা ছোট খাদের কাছে এসে দিনেশ ও বিলাসী দাঁড়ালো। টর্চের আলো ফেলে ধীরে ধীরে চারদিকে দেখে নিল। বিলাসীর বেলচা দিয়ে দিনেশ কবার আঘাত দিতেই একটা ফাটল ধরা পাথরের চাপ খসে পড়লো ঝুপ করে।

উৎকট উল্লাসে দিনেশ চেঁচিয়ে উঠলো "—দেখছিস বিলাসী ?"

"হাঁ।"

বিলাসী দিনেশের মুখের দিকেই তাকিয়ে ছিল। ওর চোখের তারা দুটো তারই দিকে স্থির নিবদ্ধ, লুব্ধক জ্যোতি জ্বল্ জ্বল্ ক'রছে।

"—এই দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। খুব সাবধান বিলাসী। কেউ যেন না জানে। মাত্র তিনটে বিঁধে খসে পড়বে হাজার টাকার মাল। পশ্চিমের চানক দিয়ে তুই মাল পার করে দিবি। ওপরের জঙ্গলে খদ্দের দাঁড়িয়ে থাকবে। উপায় নেই বিলাসী, ক'রতেই হবে, আমার টাকা দরকার।"

সারি সারি গোরিয়া পাথর যেন ভরসার স্তরের মত এখানে এসে পৌঁছেছে। দেখা যাচ্ছে কাজরা পাথরের চাপ—তিল-চিহ্নখচিত সুলক্ষণা গৌরী ললনার গালের

মত। তারপর এই যোগিনিয়া পাথরের ত্রিলকুট—রাঙা পাষাণীর কটাক্ষে রত্নলোকের ইসারা ফুটে উঠেছে স্পষ্ট হয়ে। “—এই নে গুল্‌লা টোপি। বিঁধে ফেল্ বিলাসী।” দিনেশ পকেট থেকে জেলেকনাইটের মোড়কটা নামালো।

শাবল দিয়ে একটা জায়গা বিঁধে আওয়াজ করবার ব্যবস্থা হয়েছে। ফিউজের বাতিটা ধীরে ধীরে পুড়ে ক্ষয় হচ্ছে। একটা ভূমিকম্পের বীজ যেন ধীরে ধীরে অগ্রসর হচ্ছে মহাপরিণামের দিকে।

দিনেশ ডাকলো, “আমার কাছে সরে আর বিলাসী। এবার আওয়াজ হবে।”

প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দ। আর্ত প্রস্তরপুঞ্জের শিহর আর ধোঁয়ার উৎপাত থামলো। দশটা মিনিট দিনেশ আর বিলাসীর কাটলো মুহ্যমান অবস্থায়। দিনেশ উঠে দাঁড়াতেই তাঁর হাতটায় টান পড়লো। বিলাসী ধরে আছে।

আস্তে আস্তে হাতটা সরিয়ে নিয়ে দিনেশ বিঁধের দিকে তাকালো—দুই চোখে তীব্র ঔৎসুক্যের জ্বালা। দিনেশের গলা থেকে আর একটা উন্মাদ আনন্দের বিস্ফোরণ ফেটে পড়লো। “ঐ দেখ্ বিলাসী।”

কাজরা পাথরের একটা চাপ খুলে গিয়ে অভ্রের টিকরি ঝক ঝক করছে—প্রাক্ পুরাণিক কোন কুবেরের রত্নীভূত পাঁজর সাজানো রয়েছে স্তবে স্তবে।

“—চললাম বিলাসী। আজ সন্ধ্যের চানকের মুখে খদ্দের দাঁড়িয়ে থাকবে। তুই অন্তত দুটো বোঝা পার ক’রে দিস। আমি বন্দোবস্ত ক’রতে চললাম।”

বিলাসী দাঁড়িয়ে রইল নির্বোধের মত। দিনেশ সত্যিই চলে যায় দেখে ডাকলো, “বাবু।”

“কি? না আর দেরি করিস্ নি।”

“—ও চানক পার হব কি ক’রে বাবু?”

“—খুব পরিষ্কার রাস্তা। খাড়া উঠে যাবি।”

দিনেশের টর্চের আলো সুঁদের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

“—ও চানকে গ্যাস আছে বাবু।” কিন্তু বিলাসীর এই আর্তস্বরের আবেদন দিনেশের কানে পৌঁছল না।

টাকার তোড়াটা তোরঙ্গে রেখে দিনেশ ঘরের বাইরে একবার পায়চারি ক’রে গেল। তেঁতুলিয়া মাঠে ঢোলকের বাজনা মেতে উঠেছে। লণ্ঠনগুলোতে ঝড়ের আঁচ লেগে দপ দপ ক’রছে, যেন কতগুলি আগুনের কৃষ্ণচূড়ার গুচ্ছ।

বিলাসী গ্যাস লেগে জখম হয়েছে খুব। সংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাকে হাসপাতালে পাঠান হয়েছে। হয়তো এই শেষ, আর চোখ মেলে তাকাবে না বিলাসী। এ খবর শুনেছে দিনেশ, খুব সহজভাবেই গ্রহণ করেছে। এটা যেন অবধারিত সত্য ছিল।

দুঃখ পেয়ে গেল বিলাসী, নিজের দোষে। ওর অন্ত্যজ অনুরাগের মধ্যে যেন একটা সহমরণের তৃষ্ণা লুকিয়ে ছিল। বিংশ শতাব্দীয় রুচিমান দিনেশ চৌধুরী অত নীচে নামতে পারে না। নিশ্চিহ্ন হতে পারে না। বিলাসীর জন্যে দুঃখ হয়, অন্য সময় হ'লে বোধ হয় কান্নাও আসতো।

কিন্তু সব দুঃখ ছাপিয়ে নেশার মত একটা সুখাবেশ স্নায়ুজালে জড়িয়ে ধরেছে আজ। বাহিরের মৃদু ঝড়ে বাসক রাত্রি উদ্বেল হয়ে উঠেছে। সারার আসবার সময় হলো। মুক্তির মুহূর্ত আসছে এগিয়ে। প্রতি দণ্ড পল অনুপল গুণছে দিনেশ।

খুট খাট শব্দ। চোর এসেছে। খস্‌খস্‌ ঘাঘরার শব্দ। চূণীর মালাটা বেজে উঠেছে ঘুমন্ত পাখীর কলালাপের মত। দিনেশের কায় মন প্রাণ সার্থক হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বিছানার ওপর নিস্পন্দ হয়ে বসে তাকিয়ে রইল দরজার দিকে—নিষ্পলক চোখে।

চোরের আবছায়া মূর্তিটা ঘরে ঢুকলো—মার্জারীর মত পদশব্দহীন। তোরঙ্গের ডালাটা কঁকিয়ে উঠলো একবার। কচ্ কচ্ করে উঠলো টাকার তোড়াটা। দিনেশ চোখ দুটো একবার রগড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

বাইরে অনেকগুলি সাপের বিষের সংকেত তীব্র শব্দের শিহব তুলে বেজে উঠলো একসঙ্গে। চোরের আবছায়া মিলিয়ে গেল ধোঁয়া হয়ে।

ভাট তিলক রায়

ভাট তিলক রায়ের কথা আমরা এখনো ভুলে যাইনি। তাকে আমরা ভাল করে চিনতাম, তার মুখে অনেক গান শুনেছি। মাঝে কিছুদিন সে বহুরূপীর পেশা ধরেছিল। সে সময়ের একটা ঘটনা আজও মনে পড়ে। গয়লানী সেজে তিলক রায় ব্রজবাবুর বাড়ীর বারান্দায় এক হাঁড়ি দই নিয়ে এসে বসেছিল, আমরা পাড়ার ছেলেরা সবাই মিলে জটলা করে সেখানে দাঁড়িয়েছিলাম। আমাদের কৌতূহলের সীমা ছিল না। ব্রজবাবুর মত গম্ভীর রাশভারী মানুষের কাছে এত বড় একটা ফষ্টি নিয়ে তিলক রায় কোন্ সাহসে এসে দাঁড়িয়েছে? কিন্তু ব্রজবাবু গম্ভীরভাবে দরদস্তুর করলেন, দই চেখে দেখলেন, তারপর এক সের দই কিনলেন। দামটা হাতে নিয়েই সেই কৃত্রিম গয়লানী এক টানে তার মাথার পরচুলা আর নাকের নথ ফেলে দিয়ে তিলক রায়ের মূর্ত্তিতে দেখা দিল। হাত পেতে বক্‌শিস চাইলো। ব্রজবাবু হতভম্বের মত খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর একটা প্রচণ্ড খুসীর উচ্ছ্বাসে তাঁর জমাট গাম্ভীর্য্য ধূলো হয়ে উড়ে গেল। একটি দশ টাকার নোট তিলক রায়ের হাতে ফেলে দিলেন।

বিষুয়া পরবের সময় ভাট তিলক রায় গেরুয়া পাগড়ী প'রে কালীবাড়ীর চত্বরে এসে বসতো। ঘণ্টার পর ঘণ্টা শুধু ছড়া কেটে আর গান গেয়ে পার করে দিত তিলক। গানের ভাষাটাও ছিল অদ্ভুত—না ভাখা, না ঠেট হিন্দী, না খাড়ি বোলি, না বাংলা, না মগহি। মনে হতো ঐ সব ভাষা মিলিয়ে যেন তিলক নিজস্ব একটা ভাষা তৈরী করে নিয়েছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে দু'একটা মুণ্ডারী কুরুম্ কারুম্'ও থাকতো। আজ তিলক রায় বেঁচে থাকলে তার কাছে ভাষাতত্ত্বের গবেষণা করার মত একটা উপাদান পাওয়া যেত। এমনও হতে পারে, তিলক রায়ই আমাদের দেশের সেই অখ্যাত মনস্বী, যে প্রথম এই বহুবচনাবৃত ভারতের উপযোগী একটি এস্পারান্টো তৈরী করেছিল, কিন্তু কেউ জানতে পারলো না। তিলক যখন মাঝে মাঝে কাঁচা হিন্দী ও বাংলা মিলিয়ে তার গাথাগুলির ভাষ্য করে আমাদের বোঝাতো, তখন আমরা সবই বুঝতে পারতাম আর মুগ্ধ হয়ে যেতাম।

ভাট তিলক রায়ের গানের মধ্যে কী না ছিল? বুন্‌ডুটুককুরু গুহার রাজার ছেলে মুলুটুংলা এক হরিণীর প্রেমে পড়ে সারা অরণ্য ঢুঁড়ে ফিরছে—চোখে ঘুম নেই, মুখে জল নেই। দুর্ব্বা ঘাসের পোষাক গায়ে দিয়ে নদীর ধারে চুপ করে শুয়ে থাকে—যদি

ভুলে ভুলে সেই ছলনাসুন্দরী হরিণী একবার কাছে চলে আসে। রাজা হাতীর দাঁতের কুন্তল নিয়ে সদল-বলে বের হয়েছেন। হয় সে হরিণী, নয় এই উদ্‌ভ্রান্ত কুপুত্র—দু'জনের একজনকে পেলেই হবে—নিজের হাতের সংহার না করে তিনি আর শান্ত হবেন না।

ভাট তিলক রায়ের গানের এই রূপকথার আস্বাদ আমাদের তখন কিছুক্ষণের জন্য যেন হতবুদ্ধি করে দিত। তিলকের গানের সেই চরম অবাস্তব কত সত্য বলে মনে হতো। তার মধ্যে ভেবে দেখবার মত কোন প্রশ্নই থাকতো না। তিলকের গান আর ছড়ার প্রতিটি পদের সঙ্গে আমাদের বিস্ময় এক ইন্দ্রজালের জঙ্গলে দিশেহারা হয়ে ঘুরে বেড়াতো। আমরাও যেন মনে মনে ঘাসের পোষাক প'রে সঙ্গে সঙ্গে নিঝুম হয়ে শুয়ে থাকতাম, কতক্ষণে সেই হরিণী এসে পৌঁছায়। বুন্-ডুটুক্-কুরু—কথাগুলি এক একটি টোকা দিয়ে আমাদের বোধরাজ্যের কুয়াশার মধ্যে যেন ছোট ছোট এক একটি সূর্য্য জ্বালিয়ে দিত।

আজ বড় হয়ে ভাট তিলক রায়ের রূপকথার একটা অর্থ বুঝতে পারি। বিস্ময় আরও বেড়ে যায়। তিলক রায় কি সেই প্রাগৈতিহাসিক বেদের শ্রুতিধর? যখন মানুষ আর পশু একই অরণ্যের জঠরে প্রতিবেশীর মত থাকতো? তিলক কি সেই পুরাকল্পের মানুষের সংসারে প্রথম বিজাতীয় প্রণয়ের কাহিনীটি শুনিয়েছিল? বন্-ডুটুক্‌কুরু গুহার যুবরাজ মুলুটুংলা কি সেযুগের ওথেলো আর সেই শৃঙ্গবতী হরিণী কি তার ডেসডেমোনা? আজ অবশ্য অনেক মাথা ঘামিয়ে—এথ্‌নোলজী আর সাইকো এনালিসিসের প্রয়োগ বিয়োগ করে এই তত্ত্বটা বুঝে খুসী হচ্ছি। কিন্তু প্রথম যখন শুনেছিলাম, তখন ভাট তিলক রায় ছিল হ্যামলিনের বাঁশীওয়ালা আর আমরা ছিলাম ছেলের দল।

আমাদের মুগ্ধাবস্থা হঠাৎ চম্‌কে উঠতো। তিলক অন্য একটা গাথা গাইতে সুরু করে দিত। এটা আবার অন্য ধরণের। এই গাথার কথা কাহিনী ও সুরে সেই নিশির ডাকের মত আহ্বান ছিল না। কথাগুলি আমাদের হাতে হাতে যেন এক একটি তলোয়ার ধরিয়ে দিত।—কার্ণাইল ডালটন সাহেবের পল্টন পালামৌ কেল্লা ঘিরে ধরেছে। মুহুর্মুহু তোপ পড়ছে। ফটকের মুখে রক্তের ফোয়ারা ছুটছে। এক একটা শওয়ারের দল ঝাঁপিয়ে পড়ছে ফটকের ওপর। কালো কালো কোল তীরন্দাজ আর তলোয়ারবাজ রাজপুতেরা দলে দলে ফটকের মুখে রুখে দাঁড়িয়ে আছে। কেউ হটবে না। খাড়া দাঁড়িয়ে লড়ছে আর মরছে।

মিউটিনির সর্দ্দার রাজার খুড়ো। থুড়থুড়ো বুড়ো। ফটক সামলাতে যখন আর কেউ নেই, কার্ণাইল ডাল্টন যখন পল্টন নিয়ে কেল্লায় ঢুকতে চলেছে, ঠিক সেই

সময় সমস্ত কেল্লাটা যেন শেষ বারের মত হুঙ্কার ছাড়লো। দেখা গেল, এক আশী বছরের লোলচর্ম বুড়ো রাজপুত তার মাথার পাগড়ীটাকে ঢালের মত এক হাতে তুলে, আর এক হাতে তলোয়ার ঘুরিয়ে মত্তসিংহের মত যেন কেশর ফুলিয়ে, নাচতে নাচতে, হুঙ্কার দিয়ে, সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। ক্ষণিকের জন্য যেন একটা মৃত্যুর হোলি খেলে নিয়ে রাজার খুড়ো, থুড়থুড়ো বুড়ো, সেইখানে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে লুটিয়ে রইল।

ভাট তিলক রায় মারা গেছে অনেক দিন। আজ মনে হচ্ছে, তার সঙ্গে যেন ইতিহাসের প্রেতাত্মাটি সরে গেছে। যুগে যুগে কত ঘটনা দেখা দিয়েছে, শেষ হয়ে গেছে। আধুনিক মানুষ আমরা, ইতিহাসের জীব হয়েও আমরা তার খপ্পরে থাকি না। আমরা বদলে যাই। আজ যে-ব্যথায় আমরা কাঁদছি, কাল তা শুধু স্মৃতি হয়ে যায়, পরন্তু সেই স্মৃতি হয়তো আমাদের শুধু হাসাতে থাকে।

কিন্তু ভাট তিলক ছিল যেন এক নিদ্রাহীন যখ। অতীতের যত পাপ তাপ, আনন্দ বিষাদ, প্রেম প্রণয় ও লজ্জা, শত্রুতা প্রতিহিংসা ও প্রতিজ্ঞাকে সতর্ক পাহারায় সে আগলে ছিল। যা বিস্মরণীয়, তাকে সে ভুলতে দেয়নি। যা ক্ষমার্হ, আজও সে তাকে ক্ষমার যোগ্য হতে দেয়নি। যে গ্লানি আমরা ভুলে গেছি, সেই গ্লানিকে তিলক বাঁচিয়ে রেখেছিল। সেই কবেকার সভ্যতার হরিণীপ্রেমবিধুর বনবাসের লজ্জা আর এই সেদিনের কর্ণেল ডাল্টনের হাতে রাজপুত বিদ্রোহীর চরম শাস্তির জ্বালা—তিলক রায় এক মৃত যুগের শবাধার থেকে প্রেতের মত উঁকি দিয়ে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিত।

আমরা আর একটু বড় হয়েছি তখন, শুনতে পেলাম তিলক রায় সহর ছেড়ে দেশে চলে গেছে। আমরা শুনেছিলাম লাল্‌কি নদীর ওপর একটা প্রকাণ্ড বাঁধ তৈরী হচ্ছে, নিমিয়াঘাটের কাছে। তিলক রায়ের বাড়ী নিমিয়াঘাট থেকে কিছু দূরে। টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে গেলে মাত্র আধ ঘণ্টার সফর।

কলকাতার একটা কোম্পানী, জ্যাকব এণ্ড জ্যাকব, সেই বাঁধটার কণ্ট্রাক্ট নিয়েছে। জায়গাটার জরিফ হয়ে গেছে। মালপত্র আসছে, কুলি কারিগর আর ইঞ্জিনিয়ারেরা আসছে। তিলক রায়ের মনের মধ্যে সজীব ইতিহাসের প্রেতটা বোধ হয় সতর্ক হয়ে উঠলো। বহুরূপীর পেশা ছেড়ে দিল তিলক। সহরে ছড়া গাইতে আর আসে না। নিমিয়াঘাটের আশে পাশে যত গাঁ আছে, সব জনপদের কানে কানে তিলক

এক সাবধান বাণী শুনিয়ে বেড়াতে লাগলো।—ভয়ঙ্কর একটা অমঙ্গল আসছে, সময় থাকতে একটা বিহিত ব্যবস্থা করা চাই। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরী করতে যারা এসেছে, তাদের উদ্দেশ্য কি? বাঁধ তৈরী এমনিতেই হয়? লাল্‌কি নদীর ঢল সাম্‌লাবে সিমেণ্ট আর লোহার কয়েকটা দবজা? কেউ বিশ্বাস করো না। একশোটি নরবলি না দিলে লাল্‌কি নদী কখনই তুষ্ট হবে না। ছেলেধরার দল ঘুরছে, বাঁধ কোম্পানী টাকার লোভ দেখিয়ে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যাবে। তারপর একদিন মাঝরাত্রে হাত পা বেঁধে বলি দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলে ভাসিয়ে দেবে। ঐ যে একটা নতুন থাম তৈরী করেছে, ঐখানেই বলি দেওয়া হয়। বলির আগে আফিং খাইয়ে দেয়, কেউ বুঝতেও পারে না কোথায় নিয়ে যাচ্ছে, কি পরিণাম হবে।

নতুন নতুন ছড়া বেঁধে তিলক রায় তার বাণী প্রচার করে বেড়াতে লাগলো।—ইঞ্জিন এসেছে, কত রকমের কলকব্জা আসছে। কিন্তু কী সাধ্য আছে তাদের লাল্‌কি নদীর ঢল বেঁধে দেবে? আগে নববলি হবে, তবেই কল চলবে। তা ছাড়া আব কোন পথ নেই। অতএব সব গাঁয়ের মানুষ হুঁসিয়ার হয়ে যাও। কেউ কুলির খাতায় নাম লিখিও না, সোনার মোহর মজুরী দিলেও না।

এসব খবর আমরা তিলকের মুখেই শুনেছিলাম। বিয়ুয়া পরবের দিন একবাব সহরে আসতো তিলক। তিলকের চেহারাটাও কেমন পাগ্‌লা গোছের হয়ে গিয়েছিল। চোখের দৃষ্টিটাও একটা সংশয়ে উদ্বেল হয়ে থাকতো। চুপি চুপি বলতো—ভয়ানক কাণ্ড হচ্ছে খোকাবাবু। নিমিয়াঘাটে লাল্‌কি নদীর বাঁধ তৈরী হচ্ছে। কখন যে গরীবের প্রাণটা চলে যায় ঠিক নেই।

আমরা বলতাম।—কেন?

তিলক।—এক একটি থাম উঠছে, আর পাঁচটা মানুষের প্রাণ যাচ্ছে।

আমরা।—কেন?

তিলক।—নরবলি দিতে হচ্ছে, নইলে মাটিতে থাম ধরবে কেন? লাল্‌কি নদীব রাগ কি এমনিতেই শান্ত হবে?

তিলক একটা ছড়া গেয়ে শোনালো। এই গাথা সে কোন উত্তরাধিকার হিসাবে পায়নি, এটা তার নিজেরই রচনা। তিলক রায়ের গাথার ঝুলিতে যুগ যুগান্তের ক্ষোভ সঞ্চিত হয়ে আছে। এইবার নতুন একটা ক্ষোভ তার সঙ্গে যোগ হলো।

আমরা গল্প শুনেছিলাম, গ্র্যাণ্ড কর্ড লাইন যখন নতুন তৈরী হয়, তখন কিছুদিন হাতীর উপদ্রবে ট্রাফিক ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। হাতীরা তাদের জঙ্গলে এই কলকব্জাব অনধিকার প্রবেশ ভাল মনে গ্রহণ করেনি। তারা দল বেঁধে লাইনের ওপর বসে থাক্‌তো, কখনো বা এসে শুড় দিয়ে লাইন উপড়ে ফেলে দিত।

তিলক ভাট যখন তার সেই বড় বড় চোখ কুঁচ্‌কে আমাদের দিকে তাকিয়ে চলে গেল, তখন আমাদের এই হাতীদের রাগের গল্পটা একবার মনে পড়েছিল। তিলক ভাটের চোখে যেন সেইরকম একটা আক্রোশ।

তার কিছুদিন পরে আমরা শুনে শিউরে উঠলাম, নিমিয়াঘাটের কাছে কোন্ একটা গাঁয়ে তিনটে ছেলে-ধরাকে টাঙি দিয়ে কুপিয়ে কা'রা মেরে ফেলেছে। সহর থেকে একটা পুলিশ ফৌজ নিয়ে এস-পি সেইদিনই নিমিয়াঘাট রওনা হয়ে গেলেন।

তার দু'দিন পরে শুনলাম—ছেলে ধরা নয়, তিনটে কুলি রিক্রুটারকে মেরেছে। কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করে সদরে আনা হয়েছে। আমাদের অনেকেরই কেমন একটা বিশ্বাস ও আশঙ্কা ছিল—এই প্রতিহিংসার ষড়যন্ত্রে তিলক রায়ও থাকতে পারে। তাই স্কুল থেকে পালিয়ে আমরা সেসন জজের আদালতের ভীড়ের মধ্যে এসে ভিড়ে পড়তাম। উঁকি ঝুঁকি দিয়ে দেখতাম, আসামীদের মধ্যে তিলক আছে কি না। না, তিলক রায় নেই। চার পাঁচজন গাঁয়ের লোক তারা, তাদের কাউকে আমরা চিনি না।

তিলক রায়কে আসামীদের মধ্যে দেখতে না পেয়ে আমাদের একটা উদ্বেগ শান্ত হতো, একটু খুসী হতাম। কিন্তু ঘটনাটা আবার একটু কেমন পান্‌সে হয়ে যেত আমাদের কাছে। এর মধ্যে তিলক রায় থাকলেই যেন ভাল হতো। হিরো হিসাবে তিলক রায় কিছুক্ষণের জন্য আমাদের কাছে একটু খাটো হয়ে যেত।

আরও বড় হয়েছি। তিলক রায়কে আরও কয়েকবার দেখেছি। তখন লাল্‌কি নদীর বাঁধ রচনার মধ্যপর্ব আরম্ভ হয়েছে। বড় মামার সঙ্গে নিমিয়াঘাটের অফিস কোয়ার্টারে থাকি। সারা দিন ঘুরে ফিরে বাঁধের কাজ দেখতাম। স্মৃতি থেকে সেদিনের অনুভবের কিছুটা, আর আজকের বিচার দিয়ে তার পরিশিষ্টের কিছুটা বলতে পারা যায়।

তিলক রায়ের বাণী ব্যর্থ হয়নি। নিমিয়াঘাটের কাছাকাছি কোন গাঁ থেকে কোন কুলি তখনো এই বাঁধের কাজে খাটতে আসেনি। লাল্‌কি নদীর বাঁধ তখনো তাদের কাছে শত্রু হয়ে আছে। কিন্তু তিলক রায় আসে মাঝে মাঝে। গুপ্তচরের মত যেন সে ছদ্মবেশে বাঁধের কীর্তি দেখে যায়। দেশী মজুর কেউ নেই, সবই ছত্রিশগড় থেকে এসেছে। কেরাণীরা সবাই বাঙালী। ইঞ্জিনিয়ারেরা বেশীর ভাগ সাহেব। মিস্ত্রী আছে সব জাতের লোক—পাঞ্জাবী পাঠান আর চাটগেঁয়ে। তিলক রায় সবারই সঙ্গে খাতির জমায়, নানা রকম প্রশ্ন করে। তার সন্দেহ দূর হয় কিনা

বোঝা যায় না। এমনি করেই মাঝে মাঝে হঠাৎ দেখা দেয় তিলক—তারপর আবার চলে যায়।

আমাকে একদিন দেখতে পেয়ে চিনতে পারলো তিলক। তিলক খুসী হয়ে ও আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলো।—আপনি এখানে কেন দাদাবাবু?

—বড় মামা এখানে আছে যে।

—আপনার বড মামা? তিলক চিন্তিত ভাবে তার স্মৃতি হাত্‌ড়ে বড় মামার পরিচয় খুঁজে বের করার চেষ্টা করলো।

আমিই সাহায্য করলাম।—লালকুঠির জিতেনবাবুকে মনে নেই, তিনিই আমার বডমামা।

তিলক খুসী হয়ে উঠলো।—ওঃ হো, চিনতে পেরেছি। চলুন দাদাবাবু, তাঁকে একটা আদাব জানিয়ে আসি।

তারপর বললো বডমামাকে অভিবাদন জানিয়ে তিলক রায় মেজের ওপর বসে পডলো।—একটা কথা আমার মত বোকাকে একটু বুঝিয়ে বলবেন বডবাবু, এই বাঁধ তৈরী হয়ে কি হবে? কারও কোন ভাল হবে কি?

উত্তরে বডমামা যা বললেন, তা'তে তিলক শুধু হাঁ করে রইল, যেন গিলতে পারছে না কিছু।—বলিস্ কি তিলক? দশ বছর পরে নিমিয়াঘাটকে আর চিনতে পারবি? এখান থেকে চারটে পাকা সডক বের হবে—চোস্ত ম্যাকাডাম করা সডক। মীটার গেজ রেল লাইন বসবে। এরই মধ্যে সিমেণ্টের কারখানা খোলার বন্দোবস্ত সুরু হয়ে গেছে। বাঁধটা একবার শেষ হয়ে নিক তো, তখন বিরাট একটা পাওয়ার স্টেশন হবে এখানে। তিনটে জেনারেটর বসবে, সঙ্গে এক জোডা টার্বাইন। ছে'ষট্টি হাজার ভোল্টের বিদ্যুৎ ছুটে যাবে এখান থেকে দশ মাইল পর্যন্ত—ডবল সার্কিট ট্রাঙ্ক লাইন ধরে।

বড মামার কথার মধ্যে ভবিষ্যতের এক সুখী ও সম্পন্ন উপনিবেশের বিচিত্র মূর্তি ফুটে উঠেছিল। তিনি আরও জাঁকালো করে শুনিয়ে দিলেন।—কত কারখানা খুলে যাবে দেখবি। বাঁশের জঙ্গল পডে রয়েছে, কাগজের মিল বসবে। একটা কাঁচের কারখানা খুলবে—এই যে পডে রয়েছে টন টন সাদা বেলেপাথরের ধূলো, এসব তখন গ'লে গিয়ে স্ফটিক হয়ে যাবে রে তিলক।

আমরা ছেলেবেলায় যেভাবে সম্মোহিতের মত তিলক রায়ের গান শুনতাম, তিলক নিজেই আজ যেন সেইরকম একটা কিশোর কৌতূহলে মুগ্ধ হয়ে বড়মামার কথাগুলি শুনছিল। মনে হচ্ছিল, বডমামাই একজন ভাট, তিলক একজন শ্রোতা মাত্র। আধুনিক যুগের এক ভাটের মুখে ভবিষ্যতের কথা শুনছে স্বয়ং তিলক।

তবুও তিলকের মুখে একটা বেদনার্ত ছায়া পড়েছিল যেন। ইতিহাসের প্রেতটা যেন ভবিষ্যতের এই ঔদ্ধত্য দেখে মনের দুঃখে মুসড়ে পড়ছে। তিলক চলে গেল।

তিলক আবার একদিন এল। জ্যাকব এ্যাণ্ড জ্যাকবের নিমিয়াঘাট বারেজ কনস্ট্রাকশনের একটা প্রস্পেক্টাস হাতে নিয়ে বড় মামা তিলক রায়কে নানা তথ্য পড়ে পড়ে শোনালেন। তিলক কি বুঝলো তা সেই জানে। বড মামা পডছিলেন নিজের আগ্রহের আবেগে। নিজেকে উৎফুল্ল করার জন্যই যেন তিনি নতুন ধরণের একটি লক্ষ্মীর পাঁচালী পডছিলেন। কারণ আছে, বড় মামা কিছু শেয়ার কিনেছেন।

আজ তিলককে দেখে কেমন একটু শান্ত মনে হলো। সমস্ত শক্তি দিয়ে তার সব রোষ সংযত করে লাল্‌কি নদীর বাঁধকে যেন একটু সুনজরে দেখবার চেষ্টা করছে।

তারপরেই একদিন তিলক রায় এল। সেদিন সে আর একা নয়। শ'তে চারেক গাঁয়ের কুর্মি আর জোলা তার সঙ্গে এসেছে। সবাই সুবাধ্য ছেলের মত কুলি আফিসের সামনে দাঁড়িয়ে নাম লেখালো; নম্বরের চাক্‌তি আর কোদাল হাতে নিয়ে দল বেঁধে নতুন একটা মাটির ধাওড়াতে গিয়ে সবাই উঠলো। আগামী কাল থেকেই ওদের কাজ সুরু হবে। শুধু আজকের দিনটা ওরা জিরিয়ে নিচ্ছে। শুক্‌নো পাতা পুড়িয়ে বড় বড় হাঁড়িতে ভাত ফুটিয়ে ওরা খেল। তখনো ওদের মনের সন্দিগ্ধ ভাবটা বোধ হয় একেবারে কেটে যায়নি। এই নতুন ঘরের সুখ আজ ওরা অস্বীকার করতে পারছে না, তবু চোখের দৃষ্টিতে একটা প্রশ্ন যেন ঘনিয়ে আছে—এই সুখ সইবে তো?

লাল্‌কি নদীর বাঁধটা সত্যিই একটা কীর্তি। সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখতাম—উঁচু উঁচু ক্রেনগুলির মাথার ওপর রোদ পড়েছে। যেন বিশ্বকর্মার কিরীট। ছোট ছোট ক্রেনগুলি নিতান্ত অবলীলায় ছোঁ মেরে এক একটা কংক্রীটের চাঙড় তুলে নিচ্ছে—পর মুহূর্তে ঘাড় ফিরিয়ে বসিয়ে দিচ্ছে লাইনেই ওপর স্তরে স্তরে। একটা প্যাডেল টাগ, একটা ড্রেজার আর একটা এক্সক্যাভেটার নদীর ওপর পড়ে উৎখাতকেলির আনন্দে অস্থির। হাজার টন জল মাটি আর পাথর উপড়ে ফেলছে। ডবল সিলিণ্ডার ডিজেল ইঞ্জিনগুলি যেন দর্পভরে আত্মহারা। পিনিয়নগুলির মুখে একটা শানিত দন্তুর হাসি। সমস্ত যন্ত্রযূথ যেন হাসছে।

ইঞ্জিনিয়ার ওভার্সিয়ার আর সার্ভেয়ারের সংখ্যাই হবে একশোর ওপর। তাছাড়া ফিটার, টার্ণার, লেদমিস্ত্রী, ওস্তাগর, বয়লারম্যান, ইঞ্জিন ড্রাইভার আর কুলিমজুর সব

নিয়ে হবে হাজারের ওপর। দূব ছত্রিশগড থেকে এসেছে রোগা রোগা পুরুষ কুলি আর বেঁটে মজবুত চেহারার মেয়ে কুলি।

নিমিয়াঘাটের এই বেলে মাটির তেপান্তরে লাল্‌কি নদীর ধারে এক বিরাট বাহিনী যেন এসে ছাউনী ফেলেছে। প্রতিদিন ভোর থেকেই সাজ সাজ রব পড়ে যায়। পরেশনাথের ডাকবাংলাতে বসে নীচে দিকে তাকালে এই কুয়াশায় ঢাকা জনপদ অল্প অল্প দেখা যায়—নিঃশব্দ ষড়যন্ত্রেব মত যেন গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে; কার বিরুদ্ধে যেন সংগ্রাম ঘোষণা করেছে।

সত্যি কথা, এ'ও এক সংগ্রাম, জল পাথর আর মাটির জড়ত্বের বিরুদ্ধে। লাল্‌কি নদীর চাওডা খাত ধরে প্রতি মুহূর্তে এক বেগময় সলিলসম্ভার গড়িয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তার পাশেই বসে শুক্‌নো নিমিয়াঘাট যেন তৃষ্ণায় ধুঁকছে। সারা দুপুর ধরে এক নিদারুণ প্রদাহে চিক্ চিক্ করে পুড়তে থাকে নিমিয়াঘাটের বেলে মাটির পরমাণু। কত শত বছর পার হয়ে গেছে কে জানে, শ্যাম বনভূমির শেষ অঙ্কুরটি এইখানে জল বাতাসের অনুদার চক্রান্তে মরে গেছে।

মানুষেব বুদ্ধি আজ বুঝতে পেরেছে—আবাদ করলে ফলতো সোনা। নিমিয়াঘাটকে আর পতিত করে রাখা উচিত নয়। লাল্‌কি নদীর খাম্‌-খেয়াল শান্ত করে দিতে হবে—এক হাজার ফুট লম্বা এক সুকঠিন কংক্রীটের বাঁধ দিয়ে। পনেরটি খিলান করা স্প্যান, প্রত্যেকটির সঙ্গে পঞ্চাশ টনের গেট ফিট করতে হবে। মৌশুমী বৃষ্টি এই লাল্‌কি নদীকে প্রতি বছর ফাঁপিয়ে তোলে, ফাল্গুনে হাজার মাইল দূরের হিমগিরির বরফগলা জল গডিয়ে আসে, কিন্তু সবই বৃথা হয়। এক অন্ধ বেগ সব জলভবা লুটে নিয়ে চলে যায়, নিমিয়াঘাটের ডাঙ্গা তার এক কণা প্রসাদ পায় না। তাই গডে উঠেছে বাঁধ—আট কোটি টাকার স্কীম। দেশ বিদেশের মহাজনেরা সাত দিনে সাগ্রহে সব ডিবেঞ্চার লুটে নিয়ে গেছে।

এখান থেকে উত্তরে ও দক্ষিণে টেনে নিয়ে যাওয়া হবে, কম করে সাতটা খাল। জরিপ করা হয়ে গেছে। ভূস্তর ফুটো করে অন্তঃসলিলের রহস্য জানা হয়ে গেছে। এই খাল দিয়ে লাল্‌কি নদীর জলভার চলে যাবে দিকে দিকে—উর্বরতার অর্ঘ্য নিয়ে। রুক্ষ নিমিয়াঘাট সবুজ হয়ে উঠবে। তাই মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীর মানুষ যেন এক সুমহিম সংগ্রামের আয়োজনে, এক সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে এখানে। যুদ্ধ হবে পদার্থজগতের বিরুদ্ধে—সমস্ত নিসর্গের ঔদ্ধত্যকে পরাজিত করে বুদ্ধির দাস করে রাখতে।

এরই মধ্যে বেনেদের জুয়ো আরম্ভ হয়ে গেছে। এখানে নয়, দূর কলকাতা ও লণ্ডনের এক একটি দালালী হৌসে নিমিয়াঘাটের ভবিষ্যৎ নিয়ে ফাট্‌কা সুরু হয়ে

গেছে। বেতারে খবর বিলি হয়—কাজ কতদূর এগিয়েছে। শেয়ার নিয়ে হানাহানি চলে। নতুন এক ঘোড়দৌড়ের জুয়ার আস্বাদে নিখিল-বিশ্ব-দালালী মস্তিকে নেশা জমে এসেছে।

স্ট্রাইক আরম্ভ হয়েছে। নিমিয়াঘাটের এই সুন্দর ইষ্টাপূর্ত রূপ হঠাৎ বীভৎস হয়ে গেছে। সংগ্রামের সেই বুদ্ধির ঐক্য ঘুচে গেছে, দীপ্তি নিভে গেছে। এক আত্মবিচ্ছেদের বিষে শিবিরের শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। শুনলাম, কণ্ট্রাক্টর জ্যাকব এণ্ড জ্যাকবের ক'জন সাহেব অফিসার, গোটা দশেক ইঞ্জিনিয়ার আর বড়মামা ছাড়া ধর্মঘট করেছে। দশদিন থেকে কাজ বন্ধ।

সেদিনের ঘটনাগুলি আজও খুব স্পষ্ট হয়ে মনে পড়ে। দশ দিন ধরে সেই ময়দানবের পুরী যেন নিঝুম হয়ে রইল। চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে মাঠের উপর একটা গুর্খা ফৌজ এসে ডেরা নিয়েছে। সাহেবের ফুলবাগানে রোজ একটা জটলা দেখা যায়। তার মধ্যে অফিসারেরা আছে—কয়েকজন মিস্ত্রী, টাণ্ডেল আর সর্দারও আছে। বোধ হয় মীমাংসার জন্য একটা বৈঠক বসে সেখানে।

বড়মামার কাছে শুন্‌তাম্‌, স্ট্রাইক তাড়াতাড়ি না মিটলে একটা ভয়ানক ব্যাপার হবে। আরও মিলিটারী নাকি আসছে। নতুন লোক যোগাড়ের জন্য রিক্রুটারেরা বেরিয়েছে। কী বেয়াদব আর বেইমান এই মজুর মিস্ত্রি আর কেরাণীগুলি! এমন ঠেঙ্গানি দিয়ে হাত-পা ভেঙে এদের ছেড়ে দেওয়া উচিত, যাতে ভবিষ্যতে কোথাও যেন আর রোজগার করবার আশা না থাকে, এখানে তো নয়ই।

কলকাতার কয়েকটা খবরের কাগজকে বড় মামা কষে গালাগালি দিলেন। এই স্ট্রাইকের খবরটা তারা এরই মধ্যে রটিয়ে দিয়েছে। শেয়ারগুলির উঠতি ভ্যালু এরই মধ্যে ইনডিফারেণ্ট হয়ে পড়েছে। এর পর নামতে আরম্ভ করবে। আমারও মনে হতো, এই স্ট্রাইক একটা বড় বেশী গোঁয়র্তুমি। সামান্য কয়েক আনা মজুরীর রেটের দাবী গ্রাহ্য হয়নি বলেই একেবারে কাজটা নষ্ট করে দিতে হবে, এ কীরকম ব্যবহার? একটু কৃতজ্ঞতা নেই? এক এক সময় ভাবতে খুবই খারাপ লাগতো, এতবড় একটা কীর্তি অসমাপ্ত থেকে যাবে! এত বড় একটা উন্নতির স্কীম এইখানে জঙ্গলের মাঝখানে জল বালি আর পাথরের ওপর মরচে ধরে পড়ে থাকবে। কোনারকের মন্দির দেখেছি—একটা অসম্পূর্ণতার ব্যাথায় সেই মন্দিরের গায়ে ফাটল ধরে আছে। কিন্তু সেটা খুব বেশী দুঃখ দেয় না। কোনারকের স্থাপত্য-গরিমা যৌবন পর্যন্ত গড়ে উঠেছিল, তার পরেই কোন্‌ এক দুর্ভাগ্যে শুধু তার রূপসজ্জা পূর্ণ করার সময়টুকু আর হয়নি! ভগ্নস্তূপও কত দেখেছি; গোয়ালিয়রের প্রান্তরে উজ্জয়িনীর গর্ব চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে, কাঁটার ঝোপে ছেয়ে গেছে। দেখে তবু

খুব বেশী দুঃখ হয় না। এক বৃদ্ধের কঙ্কালের মত মনে হয়—জীবনের সব ভোগের মুহূর্তে পার হয়ে আয়ুক্রমের শেষ পরিচ্ছেদে পৌঁছে তার মৃত্যু হয়েছে। এমন কিছু শোকাবহ ব্যাপার নয়। কিন্তু নিমিয়াঘাট বারেজ লাল্‌কি নদীর বাঁধ যদি আজ নষ্ট হয়ে যায়, তবে ভবিষ্যতের কোন সার্ভেয়ার সত্যিই দুঃখে চমকে উঠবে—এক বিরাট কীর্তির শিশুদেহের এই চূর্ণাস্থি দেখে। অভিশাপ দেবে অতীতের এই মজুরদের, যারা এই বাঁধকে অকালে হত্যা করলো—এই স্টাইকওয়ালা মজুরদের।

স্টাইকটা আমারও ভাল লাগছিল না। একটা দুর্বুদ্ধির চক্রান্ত বলেই মনে হতো। তারপর সত্যি করে একদিন আমিও বড়মামার মত একটা প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন ছটফট করে উঠলাম। কারণ, যে-দৃশ্য দেখলাম, তাতে আমার মনের মধ্যে আর কোন ক্ষমার অবকাশ রইল না। হোক না মজুর আর কেরাণী, যতই গরীব হোক না কেন—ওদের বুদ্ধিতে পাপ ঢুকেছে। দেখলাম দুটো গার্ড তিলক রায়কে কাঁধে তুলে চীফ ইঞ্জিনিয়ারের বাংলোর সামনে নিয়ে এল। তিলকের গায়ের জামাকাপড় রক্তে ভিজে গেছে—মাথায় একটা পটি বাঁধা। ধর্মঘটীরাই তিলককে মেরেছে। এই সর্ববিভাগীয় ধর্মঘটে শুধু তিলক রায়ের কুলির দল যোগ দেয়নি। যোগ দেবে কেন? তিলক রায়ের দল খুসীই ছিল। দিন ছ'আনা হিসাবে তারা হপ্তা পায়, মেঠাই কাপড় কেনে, দৌড়ে দৌড়ে ঘন ঘন বাড়ী যায়, ছেলেমেয়েদের দেখে আসে। বাড়ী থেকে পুঁটুলি বেঁধে চিঁড়ে নিয়ে আসে। কাজ করতে করতে যখন একটু জিরিয়ে নেবার ইচ্ছা হয়, তখনি শাল পাতা ভেঙে ঠোঙা তৈরী করে নেয়। লাল্‌কি নদীর বালি খুঁড়ে পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল বার করে। খেতে খেতে অদ্ভুত একটা তৃপ্তির তোয়াজে ওরা নিজেরাও যেন চিঁড়ের মত ভিজে যায়। তিলক রায়ের দল এই মজুরীর দাবীর লড়াইয়ে সামিল হয়নি। সিটি বাজবার সঙ্গে সঙ্গে ওরা ঠিক নিয়ম মত কোদাল নিয়ে কাজে নেমে পড়ে।

কোম্পানীর গার্ডেরা আর একটি লোককে ধরে নিয়ে এল। একে আমরা আগে কখনো দেখিনি। ভদ্রলোকের ছেলে, বয়স চব্বিশ পঁচিশের বেশী হবে না, চোখে চশমা আছে, গায়ে খদ্দরের চাদর।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার বললেন।—তুমি কে হে জেণ্টেলম্যান? কোত্থেকে এসেছ?

যুবকটি উত্তর দিল—আমি ডাক্তার, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা আমার পেশা। এখানে আমার বহু পেসেণ্ট আছে।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার।—আমাদের এখানে বুঝি ডাক্তার নেই? তুমি এখানে ট্রেসপাস করতে এসেছ কেন?

যুবক।—আপনি চীফ জাষ্টিস্ নন যে আমার বিচার করতে আরম্ভ করেছেন।

আমার যদি কোন অপরাধ হয়ে থাকে তবে পুলিশে খবর দিন। আদালতেই বিচার হবে, আমি ট্রেসপাস করেছি কি না।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার একটা বেত দেখিয়ে বললেন।—আপাততঃ এইটাই হলো আদালত। এখানে দাঁড়িয়ে অঙ্গীকার কর, আর কখনো আমার, এলাকায় ঢুকবে না।

যুবক।—আমার রোগী দেখতে আমি আসবই।

চীফ ইঞ্জিনিয়ার।—অল রাইট!

ডাক্তারকে গার্ডেরা ধরে কোথায় নিয়ে গেল বুঝলাম না। সমস্তদিন একটা আশঙ্কায় গায়ে কাঁটা দিতে লাগলো। সন্ধ্যাবেলা বড়মামাকে বললাম।—কী ব্যাপার বড়মামা?

বড়মামা।—ওই ছেলেটাই এই ষ্ট্রাইক্‌টা বাধিয়েছে।

রাত্রিবেলা একটা গণ্ডগোলের শব্দে ঘুম ভেঙে গেল। বড়মামাকে একটা চাপরাশী ডাকতে এল। মজুরেরা ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলো ঘিরে ফেলেছে। ইঁট পাথর ছুঁড়ছে। থেকে থেকে সেই ক্ষিপ্ত জনতা হুঙ্কার ছাড়ছে।—ডাক্তারবাবুকো ছোড়্ দো।

বড়মামা গিয়ে চীৎকার করে জনতাকে আশ্বাস দিলেন।—ডাক্তারবাবু আমার কাছে আছে, ভাল আছে, তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে বিশ্বাস কর।

মাঠের দিক থেকে গুর্খা ফৌজের বিউগ্‌লের শব্দ শোনা গেল। বড়মামা হাতজোড় করে জনতাকে বললেন।—ডাক্তারবাবুর জন্য আমি তোমাদের কাছে জামিন রইলাম। আমার কথা শোন, এখনি সরে পড় সব।

ইঞ্জিনিয়ার সাহেবের বাংলোর ফটকটা আর কয়েকটা ফুলের টব ভেঙে দিয়ে ধর্মঘটি জনতা একটু মনের ঝাল মিটিয়ে সরে গেল।

অনেক রাত্রি পর্যন্ত একটা মানসিক উত্তেজনায় ঘুম আসেনি। সকালবেলা উঠতে একটু দেরী হলো। একটা খবর শুনেই কিন্তু মনটা হাল্কা হয়ে গেল। ষ্ট্রাইক্ মিটে গেছে। বড়মামা সালিশী করে সব নিষ্পত্তি করে দিয়েছেন। চার আনা নয়, মজুরীর রেট দু'আনা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারবাবু প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন—তিনি আর কখনো এদিকে আসবেন না ধর্মঘটি মজুরদের আর একটা দাবী স্বীকৃত হয়েছে—তিলক রায়ের কুলির দল নতুন রেটে মজুরী পেতে পারবে না। যা আগে পাচ্ছিল, তারা তাই পাবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার এই সর্ত মেনে নিয়েছেন।

তিলক রায় লোকটা আর তার ভাগ্যটা চিরকালই হেঁয়ালির মত। এইখানে একটু দুঃখ রয়ে গেল। আমাদেরই ছেলেবেলার ভাট তিলক রায়। ওর মনের সঙ্গে

আমাদের একটা আত্মীয় ছিল। তাই বড়মামার ব্যবস্থাটা ন্যায়োচিত মনে হলো না। বড়মামা আমার আপত্তি শুনে হেসে ফেললেন।—তিলকটা একটা গবেট; ঠিক হয়েছে।

বাঁধের কাজ জোরে এগিয়ে চলেছে। বর্ষার আগেই পিলারের কাজ শেষ করে ফেলতে হবে। চীফ ইঞ্জিনিয়ার একটু ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। শুনলাম, নতুন একটা এক্সক্যাভেটার এসেছে। বড়মামা খুব প্রসন্ন, শেয়ারের দাম বাড়ছে।

কদিন পরেই তিলক রায় এসে মুখভার করে বললো।—বড়বাবু, আমাদের সবাইকে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বড়মামা।—হাঁ, আর তোমাদের দরকার নেই। নতুন মেশিন এসে গেছে, এখন ফালতু লোক ছেঁটে ফেলতে হবে।

তিলক।—আমরা তো মাত্র এই কটি দেশী কুলি। সবারই কাজ রইল, শুধু আমাদের থাকবে না কেন বড়বাবু?

বড়মামা।—ওরে বাবা, তোর মত চার হাজার গেঁয়ো কুলির কাজ করে দেবে ঐ একটা এক্সক্যাভেটার। তারপর তোদের কত রকম মরজি আছে, স্ট্রাইক করবি, ঘুমোবি, ছুটি চাইবি। কিন্তু এক্সক্যাভেটার তা করে না। তাকে বিশ্বাস করা যায়, তোদের করা যায় না। যতদিন দরকার ছিল, ততদিন ছিলি। এইবার তোমাদের ছুটি।

তিলক।—আমরা তো কখনো স্ট্রাইক করি নাই বড়বাবু।

বড়মামা।—করতে পারিস তো। হঠাৎ মতিচ্ছন্ন হতে কতক্ষণ?

তিলক রায়কে দেখতাম, সমস্ত দিন ছুটাছুটি করে বেড়ায়। ইঞ্জিনিয়াব সাহেবের বাংলোর বাইরে বটগাছটার ছায়ায় সকাল বিকেল বসে থাকতো তিলক। বড় সাহেবের কাছে একবার ধর্না দেবে—এই তার উদ্দেশ্য।

আর একদিন এসে তিলক বড়মামার কাছে প্রায় কেঁদে পড়লো।—বড় বাবু, আজ আমাদের চাকৃতি আর কোদাল কেড়ে নিয়ে গেল।

বড়মামা।—মিছামিছি পড়ে আছিস্ কেন তোরা? কতবার তো তোকে বলেছি, এইবার তোদের চলে যাওয়া উচিত। যা ঘরে গিয়ে ক্ষেত খামার দেখ। একদিন তো যেতেই হতো।

তিলক।—বিনা দোষে কোম্পানী আমাদের সর্বনাশ করে দিল বড় বাবু।

বড়মামা।—কি বলছিস তিলক? তোরাই তো ভবিষ্যতের রাজা। এই খালগুলি দিয়ে যখন জল ছুটতে আরম্ভ করবে, তখন তোদের জমির দাম কোথায় গিয়ে উঠবে; ভাবতে পারিস? তোদের মাটিকে কোম্পানী যে সোনা করে দিল রে মূর্খ।

তিলক মাত্র আর একদিন এসেছিল। সেদিন ধাওড়া খালি করে দেবার জন্য ওদের ওপর অর্ডার হয়েছে। জোলা কুলিরা প্রায় সবই তখনই এলাকা ছেড়ে গাঁয়ের পথে মেলা দিয়েছে। কুর্মিরা কিছু কিছু রয়ে গেছে। ধাওড়ার সামনে একটা পাকুড় গাছের তলায় একটা পাঁঠা বলি দিল কুর্মিরা। মাংস রাঁধলো, হাঁড়ি ভরে ভরে পচাই মদ কিনে আনলো। দুপুর থেকেই মাদল পিটিয়ে বিদায় উৎসবকে মাতিয়ে তুললো।

রাত্রিবেলা গার্ডদের চীৎকার দৌড়দৌড়ি আর জলস্রোতের শব্দে আবার একটা অতিপ্রাকৃত কোন কাণ্ড ঘটেছে মনে হলো। বড়মামা বেরিয়ে গেলেন। জেগে বসে আছি। প্রায় শেষ রাত্রে বড়মামা ফিরলেন।

বড়মামা বললেন।—তিলক রায় খতম।

—কি হলো ?

—বারুদ দিয়ে একটা পিলার ব্লো করে দিয়েছে তিলক। বাঁধের একটা সাইডে ভয়ানক জলের চোট এসে লাগছে। আজ সারা রাত কাজ হবে।

—তিলক কোথায় ?

—মরে পড়ে আছে, একেবারে থেঁতলে গেছে।

ভাট তিলক রায়ের জীবনী এইখানে শেষ। ভারতবর্ষের ইণ্ডাষ্ট্রীয়ালিজেশন সম্পর্কে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে, আজ এতদিন পরে তিলক রায়ের কথা প্রথমে মনে পড়ে গেল। ভাট তিলক যেন সত্যিই ইতিহাসের প্রেতের মত। যখের মত অতীতের যত অভিমান পাহারা দিত। বহুরূপী হয়ে সে আমাদের বর্তমানকে ব্যঙ্গ করতো। ভবিষ্যৎকে সে সইতে পারলো না। তার সংশয়টাকে শেষ পর্যন্ত সে চরম সত্য বলে জেনে গেল। তিলক রায় যেন সেই প্রচণ্ড বন্য আত্মা, ক্যাপিটাল আর ইণ্ডাষ্ট্রির কলের মারের বিরুদ্ধে প্রাণপণে লড়াই করে যে ফুরিয়ে গেল।

বৈরনির্য্যাতন

তখন চুংকিংয়ের তাঁতিরা নিশ্চিন্তমনে রেশমী চাদর বুনছে। মাদ্রিদের অপেরা ঘরে বেহালার সুরের খেলা নিরুদ্বিগ্ন নাগরিকের দিনের ছুটি মধুর করে তুলছে। আকাশে উঠে মাটির মানুষের মাথায় বোমা ফাটাবার খেলাটা তখনো পৃথিবীতে এত ভালভাবে জমে ওঠেনি। নরহত্যার শিল্পে এই নতুন পদ্ধতিতে হাত পাকাবার কাজটা মাত্র তখন চলেছে, যে-দেশের কাঁচা মাথার ওপর, যেখানে এবং যেসময়ে— সেই সময়!

সেই সময়, বেস কম্যাণ্ডারকে স্যালুট জানিয়ে ফার্ষ্ট ইণ্ডিয়ান ফ্লাইং কোরের একটি স্কোয়াড্রন উড়লো আকাশে! নীচে ভোরের পেশোয়ার কুয়াশার বোরখায় মুখ লুকিয়ে পড়ে রইল চুপ করে। এই শ্বেতাঙ্গ বিমানবিহারীদের মধ্যে মাত্র একটি কৃষ্ণের জীব রয়েছে—অফিসার দিলীপ দত্ত।

ভারতভূমির উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ওপারে আজাদ এলাকা। সভ্যশাসনের শান্তিকে অপমান করবার স্পর্দ্ধায় দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে কতকগুলি রাষ্ট্রহীন যুথচারী মানুষ। তাদের দুর্বৃত্তি সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে। খাড়া পাহাড়, সরু নালা আর চোরাপথের গোলকধাঁধাঁর মত এই দেশ। কাদার কেল্লার গর্বেই লোকগুলি আত্মহারা। চুক্তির সম্মান জানে না. সরহদ্ মানে না, মজুরী নিয়ে খাটতে জানে না। বন্দুক বগলে, কার্তুজ দাঁতে কাম্ড়ে—পাহাড়ের মাথায় পাথরের মত নিঃশব্দে মিশে থাকে। ক্রোশের পর ক্রোশ ছাড়িয়ে ওদের চোখের দৃষ্টি যেন ইংরিজী সড়কের ধূলো শুঁকতে থাকে। সড়ক দিয়ে একটা সদাগরের কাফিলা পার হয়। আচম্বিতে নেকড়ের দলের মত হানা দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন করে।

ডেরা ইস্মাসিনের নাম-করা মহাজন তিলক সাহু আজও বুক চাপ্‌ড়ে বেড়ান। বিয়ের আসর থেকেই তাঁর ছেলে আর ছেলের বউকে ধরে নিয়ে গেছে। তিলক সাহু আপ্‌শোষ করেন—ছেলের কানে এক জোড়া হীরের মাক্‌ড়ি ছিল। সেটাই ভুল হয়েছে, নইলে রক্ষা পেত ছেলেটা। আর মেয়েটা—সেসব মেয়ের বাবা রাজারামের ভাবনা। সে ইচ্ছে করলেই মেয়েকে ছাড়িয়ে আনতে পারে, ওর টাকার ভাবনা নেই।

ছেলের মায়ের কান্নাকাটি আর চীৎকারেই তিলক সাহু ব্যতিব্যস্ত। জীবনব্যাপী

মহাজনী সাধনার যা-কিছু সিদ্ধি এইবার শেষ হতে বসেছে। সত্তর তোলা সোনা নিয়ে এক মুন্সীকে পাঠিয়েছেন আজ সাতদিন হলো। কে জানে কোন্ এক খেলের মালিকের খোঁয়াড়ে ছেলেটা পড়ে আছে। ছাড়িয়ে আনতে হবে। মুন্সী ফিরলে হয়। ভয় হয়—ছেলেটা তো গেছেই, এবার সোনাও যাবে, মুন্সীও বোধ হয় আর ফিরলো না।

রাজমাক রোডের সব কালভার্টগুলি ভেঙে দিয়েছে। রোডের ধারে পর পর তিনটে খসাদারকে মেরে ফেলেছে। কারা করেছে, বুঝতে দেরী হয় না।

এ সবই সহ্য করা যায়। সুসভ্য চিকাগো কত আল কাপোনকে সহ্য করে। সাম্রাজ্যওয়ালা ইংরাজের স্নেহাধীন কলকাতা কত মীনা পেশোয়ারীকে সহ্য করেছে। তার জন্য আকাশে এক ঝাঁক বম্বোদর বিমান ছাড়তে হয়নি। কিন্তু আজাদী বদমাসদের নতুন একটা অপরাধের খবর পাওয়া গেছে কোনমতে তার আর ক্ষমা হতে পারে না। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ থেকে তিনশো মালিক আর মেহ্তরের এক জীর্গা হয়ে গেছে। চেনারের ছায়ায় বসে আইন তৈরী করেছে তারা, পীরগলের চূড়ার ছবি আঁকা সোনার মোহর চালু করেছে। নতুন একটি বাজার বসিয়েছে কুনার নালার ধারে। দর-বাঁধা পণ্যের লেন দেন হয়। মোহ্মন্দেরা বস্তা বস্তা বাদাম আনে, ইয়ুসুফজাইরা নিয়ে আসে পশম। বিবাদে বিচার করার জন্য এক প্রবীন মুল্লা কাজীর আসনে বসেছেন—জির্গার প্রস্তাবই তাঁর কাছে দ্বিতীয় হাদিস।

মারামারি ভুলে নতুন এক মিতালীর আনন্দে এক লক্ষ ডানপিটে যেন এক রাজ্যগড়ার খেলাপতি খেলছে। ছোট্ট একটি রাষ্ট্রের পুতুল গড়েছে তারা। এই নতুন বিধান নতুন অহঙ্কারের পতাকার মত তাদের মনে মনে উড়তে থাকে। জির্গার বৈঠক শেষ হয়—শত শত উদ্ধত শির নেমাজের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা ভরসা ও আশ্বাসে নত হয়ে আসে।

তাই মৃত্যুগর্ভ শাস্তির মেঘ উড়ছে আকাশে। এক দানবের সংসার ছিন্নভিন্ন করতে চলেছে। ভাস্কো-ডা-গামার নখায়ুধ প্রেতাত্মা যেন এক নতুন ভারতের রক্তের গন্ধ পেয়ে উর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে।

বায়ুসমুদ্রে ডানা ঝাপ্টে দিলীপ দত্তের মন সুখে উড়ে চলেছে। সম্মুখে পশ্চাতে ডাইনে বাঁয়ে—ছক বেঁধে এক ধূমকেতুর পরিবার যেন সীমাহীন নীলে পাড়ি দিয়ে চলেছে। নীচের দিকে তাকালে তখনো দেখা যায়, দু'একটা মিনারের গায়ে হিমকাতর প্রভাতের একটু আড়ষ্ট আলোকের প্রলেপ লেগেছে মাত্র। তারপর সব আর

জাফরাণের ক্ষেত—কতগুলি মখমলের জাজিম যেন এখানে ওখানে পাতা রয়েছে। খাত উপত্যকার গিরিনদীটা রূপালী ফিতার মতো একবার চক্‌চক্ করেই মিলিয়ে গেল।

এমনি করে হেসে বিদায় দিয়েছিল ডোরা। প্ল্যাটফর্মের শত শত মুখের ভীড়ের মধ্যে সেই স্মিতমুখের ছবি ভোলা যায় না। ডোরা কাঁদেনি, মুখভার করেনি। কোন উদ্বেগ, কোন অভিমানবাণী মুখ ফুটে বার হয়নি। শুধু ট্রেন ছাড়বার আগে হেসে হেসে একমুঠো প্রীতির কণিকা দিলীপের যাত্রাপথে মাঙ্গলিকের মত ছিটিয়ে দিয়েছিল। ডোরার বাবা মিস্টার নন্দীও সঙ্গে এসেছিলেন। পিঠে হাত বুলিয়ে সস্নেহে সমাদরে বিদায় দিয়েছেন।—যাও, বড় হও, সুনাম কর, জীবনের সব ব্রত সফল কর। বাঙ্গালীর মর্য্যাদা বাড়িয়ে তোল। তারপর, সুস্থদেহে আমাদের কাছে আবার ফিরে এস দিলীপ।

দিলীপ ভাবছিল—ডোরা যখন পরের ডাকে তার চিঠি পাবে, বিবরণ পড়ে মুগ্ধ হয়ে যাবে।

দিলীপ দত্তের ভাবনায় পুলকের বিদ্যুৎ শিউরে ওঠে। তার কারণ আছে। চিরকালের সাহসী ছেলে দিলীপ। তার গায়ের জোরের খ্যাতি সুজাবাগের মৌমাছিটিও জানে। হারু ফটোগ্রাফারের দোকানে শো-কেসের ভেতর দিলীপের একখানি ফটো যেন পৌরুষ ও রূপের নমুনা হয়ে এখনো সুজাবাগের বুকে মেডেল হয়ে ঝুলছে। তাইতো ডোরা নন্দীর মত মেয়ে—আজ নয়, দিলীপ যখন সেণ্ট ডেনিসে পড়তো, তখন থেকেই।

বিলিতি ছাত্র-চালিয়াতির সব কায়দাগুলি বেশ দুরস্ত ছিল দিলীপের। সার্জের স্যুট ছাড়া ক্লাসে আসতো না। কোটের বুকের ওপর আল্‌মা মেটারের ইনসিগ্‌নিয়া হলদে সুতোয় আঁকা থাকতো। কলেজ ইউনিয়নের বার্ষিক উৎসবে হুড্‌রু ঝর্ণাতে যখন পিকনিক জমে উঠতো, পথে যেতে মোটর লরীর ছাতে বসে জ্যাক উড়িয়ে সবচেয়ে বেশী গলা ফাটিয়ে হুর্‌রা দিত দিলীপ! নন্দী সাহেবের বাংলোর বারান্দায় চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াতো ডোরা। দিলীপের সব চপলতা ধন্য হয়ে যেত। মিষ্টি মিষ্টি হাসতো ডোরা, তাকিয়ে থাকতো ঘাড় হেলিয়ে।

হঠাৎ শোনা গেল, ডোরা নন্দীর বিয়ে প্রায় ঠিকঠাক। মোমের মত সাদা ও সিড়িঙ্গে সেই পাঞ্জাবী প্রফেসর আর্থার সিংহের সঙ্গে। দিলীপের বিহ্বল যৌবনের অভ্যর্থনার সম্মুখে দাঁড়িয়ে এক চারুমুখী অ্যাক্রোদিতে যেন হঠাৎ অকারণে মুখ ভেংচে দিল। সাহেবিয়ানার পালেস্তারার নীচে চিড়্ খেয়ে ফেটে উঠলো একটি মেটে মলিন বাঙালী-অভিমান।

সেইদিন প্রথম ধুতি-পাঞ্জাবি প'রে ক্লাশে দেখা দিল দিলীপ। সেইদিন সেণ্ট

ডেনিস নতুন চোখে দেখলো দিলীপকে। দিলীপও সেণ্ট ডেনিসের এক নতুন রূপ দেখলো।

সংস্কৃতের অধ্যাপক মিষ্টার শর্ম্মা অর্থাৎ পণ্ডিতজী দিলীপকে আড়ালে ডেকে নিয়ে সস্নেহে পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন।—স নো বুদ্ধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু। তুম্‌হারা হৃদয় গগনমে বিবেককা সূর্য্য চমক উঠা হ্যায়। সমঝা?

মৌলবী সাহেব দিলীপকে দেখেই খুসীতেই থম্‌কে দাঁড়ালেন।—বাহ্‌বা বাহ্‌বা! কেয়া বাৎ হ্যায়—জওয়ান-ই-বঙ্গাল।

ফাষ্ট ইয়ারের কয়েকটি ছেলে কমনরুমে দিলীপকে ঘিরে দাঁড়ালো।—ধুতি-পাঞ্জাবীতে আপনাকে কী সুন্দর মানিয়েছে দিলীপদা!

দিলীপদা! এই সামান্য একটি সম্বোধনের আবেদন দিলীপকে যেন প্রীতিভরে গলা জড়িয়ে ধরলো।

যে-রমেশ খদ্দরের উড়ুনি গায়ে খালি-পায়ে কলেজে আসতো, কোনদিনও দিলীপের দিকে অবহেলাভরেও চোখ তুলে তাকাতো না, সেই রমেশ দিলীপকে নেমন্তন্ন করে বাড়ী নিয়ে গেল। রমেশের মা এসে দিলীপের কুশল-পরিচয় নিলেন। রমেশের বোন শোভা খাবার এনে দিল। বিবেকানন্দের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পড়ে, আলোচনা করে, রমেশ দিলীপ ও শোভার একটি সুন্দর সন্ধ্যে কেটে গেল।

তোচিখেল পার হয়ে গেল। উদগ্রীব পাথুরে কেল্লাটা যেন নিঃশব্দে চুপি চুপি দেখলো, ব্যোমচর গ্রহের মত রুষ্ট বিমানবহর গোঁ গোঁ করে উড়ে পার হয়ে যাচ্ছে। দেখা যায়, উঁচু উঁচু পাহাড়ের সর্পিল বিস্তার—একটা কবচাবৃত সরীসৃপ যেন নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সূর্য্য ওপরে উঠছে। পূব দিক থেকে একটা আলোর ঝালর হেলে পড়েছে মাটির দেশের কুহকের ওপর। সবই ছলনা বলে মনে হয়। নীচে হাজার মীটারের ব্যবধানে মহীতল যেন মিথ্যে হয়ে গেছে।

আজ তেমনি মিথ্যে হয়ে গেছে শোভা।

ডানাভরা নতুন পরাগের আবেশে প্রজাপতি যেমন খানিক ওড়ে, খানিক বসে—কাছে আসে না, দূরেও সরে যায় না, শোভার ব্যবহারটা ছিল সেই রকম। সেই যেদিন প্রথম দেখা, সেদিন থেকে। কথা বলে যায় ঠিক, কিন্তু উত্তরটা শোনে কিনা বোঝা যায় না। দুটো কথা বলেই হয়তো দেরাজের দিকে এগিয়ে এল; চোখে পড়লো আয়নাটা, তখুনি সরে গিয়ে ঘরের কোণের দিকে একটা চেয়ারে

গিয়ে বসলো। দিলীপদের বাড়ীতে বেড়াতে আসতো শোভা, ড্রইংরুমের নিভৃতে গল্পের ভেতর দিয়ে কত দুপুর সন্ধ্যে হয়ে যেত।

দিলীপ কতবার অনুযোগ করতো।—একটু সুস্থির হয়ে বসো শোভা। এ রকম ছটফট কর কেন?

শোভা।—ভয় করে।

—কেন? যদি ধরে ফেলি, তাই কি?

—না, যদি ধরা পড়ে যাই।

সেদিন এই দূরে-সরে-থাকাটাই স্বাভাবিক ছিল। হৃদয়ের দিক দিয়ে এত সান্নিধ্য ছিল বলেই। শোভার ভালবাসার হাওয়া দিলীপের মনের গায়ে গিয়ে লেগেছে। দিলীপের সাজপোষাকের রেশমী বাহার কবে যে সাদা খদ্দরে এসে শুচিতা লাভ করেছে, তা সে নিজেই ঠিক বলতে পারে না। দিলীপ একেবারে বদ্‌লে গেছে।

কার্ত্তিক পূর্ণিমার দিন ধীরাদের বাড়ীর সবাইয়ের সঙ্গে শোভাও গিয়েছিল মধুবনের মেলা দেখতে। মাত্র একটি বেলার জন্য দশ মাইল দূরে একটু ঘুরে আসা। কিন্তু যাবার আগে দিলীপের মুখভার শোভার মেলা দেখার আনন্দটুকু মাটি করে দিল। শোভার মনে হতো—ভালবাসার রীতিই বুঝি এই রকম। একটু মাত্রা ছাড়া, একটু অভিমান-ভীরু।

তাই যদি না হয়, তবে দিলীপ এত বদলে যায় কি করে?

মাসুদদের একটা গ্রাম। দূরবীনটা একবার চোখে লাগালো দিলীপ। অনেক দূরে একটা চেপ্টা পাহাড়ের মাথায় হাজার খানেক লোক হাঁটু মুড়ে মাথা ঝুঁকিয়ে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে আছে। পাশে এক একটি লম্বানল রাইফেল শোয়ানো আছে। আজ জুম্মার দিন। সকালবেলার নেমাজ সারছে একটা লস্করের দল। স্কোয়াড্রন উল্কার মত ঝাঁপ দেবার আবেগে স্পীড বাড়িয়ে দিল। চোখের পলক ফেরাতেই দেখা গেল— ত্রস্ত চতুর হরিণের পালের মত তর্‌তর্‌ করে নেমে লস্করের দল লুকিয়ে পড়লো একটা সুগভীর পাহাড়ী খাতের ভেতর।

প্রতিবছর রামনবমীর মিছিলের দিনে কসাইপাড়ার মসজিদের কাছে হিন্দু-মুসলমানে দাঙ্গা করে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটাতো। জের চলতো চারদিন ধরে। সাঁজবাতির অর্ডার আর মিলিটারী পাহারা তুচ্ছ ক'রে সুজাবাগের অলি গলিতে অন্ধকারের মধ্যে ছুরির উৎসব চলতো।

গত বছর দাঙ্গার সময় দিলীপ খুব নাম কিনেছিল। চকের ওপর যে ভয়ানক দাঙ্গাটা হয়েছিল, তাতে হিন্দুপক্ষের নেতা ছিল দিলীপ। বড় হিংস্র আর বেপরোয়া

দিলীপের হাতের লাঠির মার। বাছবিচার নেই। চেনামুখ, অচেনামুখ, বুড়ো হোক্, জোয়ান হোক্, রোগা বা মোটা—একবার সামনে পড়লেই হলো। শিক্ষিত ভেনিসিয়া-নের রুচির মুখোস যেন কিছুক্ষণের জন্ত খুলে পড়ে যেত। শুধু খুলি ফাটাবার নেশায় পাগল হয়ে যেন বারভুঁয়ে বাংলার একটা লেঠেল সর্দার লাফঝাঁপ দিয়ে বেড়াত।

মিলিটারী এসে গুলি চালিয়ে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। প্রতিবেশীর হিংসার চেয়ে বীভৎসতর বুঝি আর কিছু হয় না। তাই সারা রাত্রি গলিতে গলিতে ঠেঙ্গাঠেঙ্গি কোপাকুপি চলে। পথের উপর বোবা ভিখারী, বদ্ধ পাগল আর ছোট ছেলের লাস পড়ে থাকে। ভাবতে আশ্চর্য্য লাগে, সুজাবাগ সহরের হিন্দু-মুসলমানের মত চিরকালের ভীরু মেনিমুখো প্রাণগুলি হঠাৎ খুনী তাতারের মত হত্যার প্রেরণায় এত উতলা হয়ে উঠলো কি করে? এই চকের উপরেই গত মাসে এক মাতাল সাহেবের মোটর ইশাকের ছেলেটাকে চাপা দিয়ে মেরে ছিল। এক হাজার হিন্দু-মুসলমানের ভীড় নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্যের নিষ্ঠুরতা হজম করেছিল। সাহেবটাকে ধরে থানায় নিয়ে যেতেও কেউ এগিয়ে যায় নি। শুধু এক হাজার পদদলিত ব্যাঙের ফুসফুস যেন মোটর ঘিরে দাঁড়িয়ে সুনীচ সৌজন্যে ফিসফাস্ করে আপোশোষ করছিল। এখনও একটা কাবুলিওয়ালা একা ছুতোর পাড়ায় ঢুকে পেটে লাঠি খুঁচিয়ে সুদ আদায় করে আনে। সেই ইশাক আজ যদি দিলীপকে একবার বাগে পায়? থাক সে কথা। দিলীপের কথাই ধরা যাক্—খুড়িমার কার্বঙ্কল অপারেশন দেখে যার মাথা ঘুরে গিয়েছিল! সেই দিলীপ আজ…।

শোভা বললো।—তুমি এসব নোংরা কাজে থেকনা দিলীপদা।

দিলীপ।—আমি গায়ে পড়ে কাউকে ঠেঙাতে যাব না। তবে পাড়ার ভেতর ঢুকে উপদ্রব করতে এলে বা বেলতলার মন্দিরটাকে কেউ ভাঙ্গতে এলে বাধা দিতে হবে অবশ্য। নইলে বৃথাই এতদিন এক্সারসাইজ করে হাতের গুলি পাকিয়েছি।

—কিছু করতে হবে না তোমাকে।

—এসব ব্যাপারে তোমার গান্ধীমার্কা অহিংসা কিন্তু কোন কাজের কথা নয় শোভা।

—বেশ তো, তোমার গায়ের জোর যখন আছে, তখন দু'দলকেই লাঠিপেঠা ক'রে সায়েস্তা কর।

—কি রকম?

—হিন্দুরা যখন মুসলমান পাড়ায় আগুন দিতে দৌড়য়, তখন ওদের ঠেঙ্গিয়ে ঘরে ফিরিয়ে দিও। মুসলমানদেরও তাই কর।

—তা হয় না।

—তা হয় না যখন, তখন দু'দলকেই হাতযোড় ক'রে বাধা দাও।

—তাতে কোন ফল হবে কি ?

—তুমি একবার করেই দেখ, ফল হয় কি না ?

দিলীপের মুখে মৃদু হাসি দেখে বোঝা যায়, শোভার কথাগুলি তার বিশ্বাসের মধ্যে আমল পাচ্ছে না। হাসিটা ভদ্রগোছের বিদ্রূপের মত মনে হয়।

শোভা বলে—শুনেছি, হিন্দুরা তোমাকে একটা বীর বলে শ্রদ্ধা করে। মুসলমানেরাও নাকি তারিফ করেছে—সাবাস্ দিলীপবাবুর হিম্মৎ! তাতেই বোধ হয় গলে গেছ! মেকলে সাহেবের টিটকারী মিথ্যে করে দিতে গিয়ে তোমরা শেষে গুণ্ডাগিরির মধ্যে গিয়ে পড়েছ। এটাও একধরণের পাঁঠা মেরে শক্তিপূজা। ছি ছি!

দিলীপ আর উত্তর দিল না। শোভার কথাগুলির কটুতায় প্রথমে রাগ হলো। তারপর কিছুক্ষণের জন্য একটু বিমর্ষ হয়ে পড়লো। তারপর একটা অস্বস্তি। কিছুক্ষণ চঞ্চল হয়ে পড়ল দিলীপ। উঠে গিয়ে জানলার ধারে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালো। শোভা বললো—সত্যিই তুমি সিগারেট ছাড়তে পারবে না দিলীপ দা ?

জলন্ত সিগারেট আর সিগারেটের প্যাকেটটা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিল দিলীপ।

শোভা—আমার উপর রাগ করো না। যদি অন্যায় কিছু বলে থাকি, তবে আমায় মাপ করো।

দিলীপ।—না, কোন অন্যায় হয়নি। আমি কাল কসাইপাড়ায় মসজিদের সামনে একা দাঁড়িয়ে মিছিল পার করবো।

শোভার মুখ আশঙ্কায় কালো হয়ে এল।—এরকম করো না দিলীপদা।

—ভয় নেই। তুমিও আমার সঙ্গে থেক শোভা।

শোভার মুখ আবার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

মিলিটারী পুলিশের ট্রাকগুলি বৃথাই সিন্দুক ভরা বুলেটের বোঝা নিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়ালো। পেট্রোল পুড়লো শুধু। কোতোয়ালী কর্তাদের তোড়জোড় এবারের শোভাযাত্রায় নতুন একটা সঙের মত মনে হলো। মসজিদের সিঁড়িতে পাশাপাশি বসেছিল দিলীপ আর শোভা। মুসলমান ছাত্রেরা এসে মাঝে মাঝে হেসে গল্প করে যাচ্ছিল। কাতার বেঁধে মুসলমান জনতা রামনবমীর শোভাযাত্রা দেখলো। শোভাযাত্রার আগে আগে লাঠিধারী পুলিশ গুলি বেকুবের মত মাথা নীচু করে হাসছিল।

বেতারের অপারেটর দিলীপের হাতে একটা নোটিশ গুঁজে দিয়ে গেল। আর নাহি দূর। একটি সুকোমল সবুজ রেজাই দিয়ে ঢাকা আকা-খেল প্রান্তর। ঠাসা

গমের ক্ষেত। মাঝে মাঝে এক একটা বুড়ো দেওদারের মাথায় তখনো লম্বা লম্বা কুয়াসার জট ঝুলছে।

বাইরের ঘরে বাবার সঙ্গে নন্দী সাহেবের আলাপের হর্ষ ও উচ্ছ্বাস শোনা যায়। ডোরাও নিশ্চয় এসেছে—ওর চুলের ক্রীমের মৃদু সুগন্ধ ভেসে আসছে।

ওঁরা এসেছেন অভিনন্দন জানাতে। দিলীপের চাকরীর কথাটা শুনেছেন। আজ পর্যন্ত কোন বাঙালীকে যে সুযোগ দেওয়া হয়নি, দিলীপ তাই পেয়েছে। এক অভাবিত গৌরবে আজ দিলীপের কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা। ফৌজী কৌলীন্যের ফুলের মুকুটি যে বিমানসেনা, দিলীপ আজ সেই সেরা পদ ও পংক্তির সম্মান গ্রহণ করতে আহ্বান-লিপি পেয়েছে। শীঘ্রই পেশোয়ার গিয়ে ট্রেনিংয়ের জন্য কাজে যোগ দিতে হবে।

প্রফেসর আর্থার সিংহ অসুখে পড়ে ছুটি নিয়ে দেশে চলে গেছে। তাই ডোরা নন্দী এখনও সিংহ হয়নি।

---সুপ্রভাত! অপ্রতিভ ভাবে হেসে ডোরা দিলীপের পড়ার ঘরে এসে ঢুকলো। ঠিক আগের মত মুখ ভরে হাসির ঝলক ফুটিয়ে তুলতে পারছে না ডোরা। চেষ্টা করলেও দ্বিধায় জড়িয়ে যায়।

—কেমন আছেন?

দিলীপের প্রশ্নে আরও লজ্জিত হয়ে পড়লো ডোরা। বললো—এবার একেবারে মাটি ছেড়ে আকাশ উঠে গেলেন; ঘাসের ফুলকে কি আর চিনতে পারবেন?

—মাটির ঢেলা আকাশে উঠলে ঝুপ্ করে মাটিতেই পড়ে যায়।

—না-ও পড়তে পারেন। যদি আকাশকুসুম হয়ে যান?

দিলীপ মুগ্ধ হয়ে দেখছিল। সেই প্রথম জীবনের স্বপ্নে দেখা মাটির কোহিনুর আজ ঘাসের ফুলের মত সুলভ হয়ে গেছে।

ডোরা বললো।—আমার একটা অনুরোধ আছে দিলীপবাবু।

দিলীপ—বলুন।

—দূরে গিয়েই একেবারে পর হয়ে যাবেন না। অন্ততঃ সপ্তাহে একটিবার করে যাতে আপনার খবর পাই তার ব্যবস্থা করবেন। ভুলবেন না, আমি কিন্তু আশা করে থাকবো।

—সত্যি আশা করে থাকবে তুমি?

—হাঁ দিলীপ।

—তুমি এতদিন এই আশার কথা আমাকে বলনি কেন ডোরা? তা'হলে আমি হয়তো এ কাজটা নিতাম না। অবশ্য, এখনো নেব কিনা ঠিক নেই।

—ভুল করো না দিলীপ। তোমার জীবনের উন্নতির পথে আমি কোন বাধা দিতে চাই না, তাতে আমার যত দুঃখই হোক্ না কেন, সব সইতে পারবো। জানি, একদিন তোমায় ফিরে পাব।

স্কোয়াড্রন ক্রমেই ওপরে উঠছে—রাবণের সিঁড়ির মত যেন ঔদ্ধত্যে স্বর্গের দিকে মাথা ফুঁড়ে চলেছে। হিমাক্ত বাতাসের জিভ যেন ছুরির মত গায়ের চামড়া ছুলে ফেলবে। একটা কাঁপুনির বেগ পুরু ফ্লানেলের কিট ভেদ করে দিলীপের হাড়ে গিয়ে বিঁধছে। মাথাটা রিমঝিম করতে লাগলো। বমির তোড় এল গলা ঠেলে। অসাড় নাকের নালী দিয়ে অঝোরে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। অক্সিজেনের মুখোসটা চাপিয়ে কোন মতে সুস্থির হয়ে নিল দিলীপ।

শোভার জন্য দুঃখ হয়, রাগও হয়। কিরকম যেন ওর প্রকৃতি। দাদা রমেশের কাছে দেশ-জাতি-সমাজ-স্বাধীনতার কতগুলি বুলি শিখে তোতাপাখীব মত শুধু আওড়ায়।

সুজাবাগের কে না শুনে খুসী হয়েছে? প্রত্যেক বাঙালীই শুনে বোধ হয় খুসী হবে—দিলীপ দত্ত যোদ্ধা হয়েছে। এমন বুকের ছাতি, এমন নির্ভীক দুঃসাহসী ছেলে, ও কি কলম পিষে জীবনটা ব্যর্থ করে দেবে? যোগ্য কাজই পেয়েছে দিলীপ।

এতদিন পরে অনেকে হাঁফ ছেড়ে বাঁচে। ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছিল ছেলেটা। পাঁচু ডাক্তারের সেই তোখড় মেয়েটার পাল্লায় পড়ে স্রেফ ভেতো হয়ে যাচ্ছিল। ঐ মেয়েটারই নাম শোভা—এক নম্বরের স্বরাজওয়ালী। ভাই-বোনে মিলে শুধু গান্ধী-গান্ধী করে। পাঁচু ডাক্তারের পসার তো জানা আছে—ফুটো ষ্টেথিস্কোপ। দেনার দায়ে ভিটে বিকোতে বসেছে। মেয়েটাকে যদি দিলীপের মতো ছেলের কাছে গছিয়ে দিতে পারে—তবে আর ভাবনা কি? ভাউচারে হাতী কেনা হয়ে গেল।

ডোরার সঙ্গে দেখা হবার কয়েকদিন পরেই শোভা উপস্থিত। দিলীপ বেড়াতে যাবার জন্য সবে সাজ সেবে গ্যারেজের দিকে চলেছে—আজ টু-সীটার নিয়ে বার হবে। আজকের সাজটার মধ্যেও নিদারুণ এক ব্যতিক্রম। সন্ধ্যে হতেই ট্রাই-কলার-টাউজারে একটি আধ-ময়লা বৈলাতিক সন্ধ্যাতারার মত আবার বহুদিন পরে নতুন করে চমকে উঠেছে দিলীপ।

শোভা বুঝে বুঝে ঠিক এই অসময়েই দাঁড়িয়েছে, যেন পথ রুখে।

—তোমার চিঠি পেয়ে আসছি, অবশ্য আসতে লেখনি। কিন্তু ক্ষমা চেয়েছ কেন? লিখেছ, ভাগ্য তোমাকে ভিন্ন পথে টেনে নিয়ে চললো, সেই চরম দণ্ড বরণ করে নিয়েছ—তবু আমাদের ভালবাসার স্মৃতি চিরন্তন হয়ে থাকবে···। বেশ সুন্দর লেখাটা।

দিলীপ—তুমি ভুল বুঝে ঠাট্টা করছো, কিম্বা আমাকে মিথ্যাবাদী মনে করে……।

কথাগুলি তোতলামির মত শোনালো। যেন একটা আত্মগ্লানির লাঞ্ছনাকে জোর করে এড়িয়ে যাবার জন্য ফাঁক খুঁজছে দিলীপ।

শোভা—আজ সুজাবাগের কাক-কোকিলও জানে যে তোমার সঙ্গে আমার নাকি প্রেম হয়েছে।

—তাদের এই জানা তো মিথ্যে নয় শোভা।

—বেশ তো, এখন তারা যদি কেউ তোমায় জিজ্ঞাসা করে যে, সেই প্রেমযমুনা এক লম্ফে ডিঙিয়ে তুমি চল্‌লে কোথায় ?

—বলবো, জীবনে একটা কঠোর পরীক্ষার সামনে দাঁড়িয়েছি, তাই এই বিচ্ছেদ মেনে নিতে হলো।

—বাপ্ রে বাপ্। পরীক্ষা ? তার ওপর কঠোর ? সোজা কথায় যাকে বলে, একটা চাকরী পেয়েছে মাত্র। বাঙালীর ভীরুতার অপবাদ ঘোচাবে, মিছে কেন এত সব বড় বড় কথা বলছো দিলীপদা ? বল, তোমার নিজের অপবাদ ঘুচবে, তুমি নিজে বীর হবে, যোদ্ধা হবে। তাই দিয়ে বাঙালীর বীরত্ব বোঝায় না।

—কেন বোঝায় না ?

—যেমন তুমি মোটর গাড়ীতে বেড়াও মানে বাঙালী জাতির মোটর গাড়ীতে বেড়ানো বোঝায় না।

—আমার একটা খুব সোজা কথার উত্তর দেবে শোভা ; সত্যিই কি বিশ্বাস কর তুমি, চরকায় সুতো কেটে স্বরাজ পাওয়া যাবে ?

—মেনে নিচ্ছি, পাওয়া যাবে না। এবার তুমিই বল, কি ক'রে পাওয়া যাবে।

—যুদ্ধ করেই পেতে হবে, পৃথিবীর আর পাঁচটা পরাধীন জাত যে ভাবে লড়াই করে স্বাধীনতা পেয়েছে, সেই ভাবে।

—তা'ও মেনে নিলাম।

—তাই, বাঙালীকে শুধু কলমবাগীশ কেরাণী হয়ে থাকলে চলবে না। যুদ্ধবিদ্যা শিখতে হবে।

—অন্য সময় হলে তোমার মত লোকের মুখে একথা শুনলে রসিকতা মনে করে হাসতাম। কিন্তু আজ সত্যিই দুঃখ হচ্ছে। যুদ্ধে চাকরী করা আর যুদ্ধবিদ্যা শেখা কি একই ব্যাপার দিলীপদা ? এই তত্ত্বটা কি তোমাকে বুঝিয়ে বলার দরকার আছে ? তুমি তোমার মনকেই প্রশ্ন করে দেখ একবার।

সুবিজ্ঞা আচার্যার মত শোভা উপদেশ শুনিয়ে যাচ্ছে। দিলীপের মনের তারগুলি ক্রমেই বিরক্তিতে মোচড় দিয়ে কড়া হয়ে উঠতে লাগলো। বললো।—তুমি কোন

নতুন কথা শোনাচ্ছ না শোভা, তোমারই মত গোঁড়া ঠাকুরমাদের ঠাকুরমায়েরা এই যুক্তি দিয়েই হিন্দু ছেলের সমুদ্রযাত্রাকে পাপ মনে করতেন। সব বিদ্যারই অধিকারী হতে হলে আগে ছাত্র হতে হয়। ছাত্র হওয়াকে চাকরী করা বলে না।

শোভাকে এতক্ষণ সত্যিই যেন আততায়িনীর মত দেখাচ্ছিল। দিলীপের বিরক্তিভরা উত্তর শুনে চোখ নামিয়ে নিল। না, আজ আর দাবী করে বলবার কিছু নেই। চুপ করে হেঁট মুখে দাঁড়িয়ে রইল শোভা। দিলীপের মনে হলো, বড় বেশী কালো দেখাচ্ছে শোভাকে। বোধ হয় এত ঘেমে গেছে আর হাঁপাচ্ছে তাই। মমতা হয়, কেন এরা মানুষকে শুধু পেছনে টেনে রাখতে চায়। জানে না, তাতে কোন ফল হয় না। দিলীপ একটু অনুনয় করে বললো—দুঃখ করো না শোভা।

শোভা—যুদ্ধ শিখতে হলে মানুষ মারতে হয়, সেটা জানতো ?

দিলীপ—শত্রুকে মারতে হয়।

—তুমি শত্রুকে চেন ?

—চেনবার কোন প্রয়োজন হয় না।

—আমাকে জব্দ করার জন্য গায়ের জোরে কিছু বলো না দিলীপদা। আমার কথার উত্তর দাও।

—না, উত্তর দেবার কিছু নেই।

দিলীপের কথাগুলি ক্রমেই রুক্ষ হয়ে উঠছে, পালাবার পথ না পেলে বেড়াল যেমন রুষ্ট হয়ে ওঠে। শোভাও তেমনি টিট মেয়ে, সব অপমান সহ্য করে আজ যেন একটা হেস্তনেস্ত করার জন্যই সে এসেছে। বললো—তুমি এই চাকরী নিও না। তুমি নিজেই বুঝতে পারছ না যে, তোমার দ্বারা এসব কাজ হতে পারে না।

—কেন ?

—দশজনের বাহ্‌বা আর হাততালির উস্কানিতে দাঙ্গা করতে গিয়েছিলে, ভুল বুঝতে পেরেছিলে। এবারও হাততালির তারিফ পেয়ে যোদ্ধা হতে চলেছ।

দিলীপ শোভার কাছে এগিয়ে এসে সান্ত্বনার সুরে বললো—আজ অন্য কথা কি আর কিছু বলবার নেই শোভা ? শুধু আমার চাকরীটা নিয়েই তোমার দুঃখ ? আমি চলে যাব, শুধু এই কথাটা ভেবে তোমার কি……।

শোভা এইবার হেসে ফেললো।—সে দোহাই দেবার পথ বন্ধ ক'রে দিয়েছে তোরা। থাক্, সেসব কথা।

একটি কথার আঘাতে দিলীপের সব মুখর চপলতা স্তব্ধ হয়ে গেল। কিছু একটা বলবার জন্য বৃথা চেষ্টা করে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল শুধু।

শোভা—এইবার আমি যাই। অনেক সময় নষ্ট করলাম।

থার্মোমীটারের পারা শূন্য সেণ্টিগ্রেডের নীচে বিশ ডিগ্রী নেমে গেছে। সময়ের প্রবাহ যেন ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে এক চরম লুপ্তির দিকে এগিয়ে চলেছে। বিমানবহরের সেই একটানা সরোষ গুঞ্জন আর নেই। অদ্ভুত এক শব্দের উৎসবে মহাব্যোম স্পন্দিত হচ্ছে, যেন গান গাইছে একটা বিদেহী পরমাণুর জগৎ। আলোক ও শব্দের গুঁড়ো ছড়ানো এই বায়ুর দেশে পৃথিবীর জ্ঞানবুদ্ধি অসহায় হয়ে পড়ে। দিলীপ দত্ত বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকে। বিজ্ঞানী হওয়া উচিত ছিল তার, তবেই না এই পদার্থ-প্রপঞ্চের কিছু রহস্য লুঠ করে নিয়ে যেতে পারতো। যদি এখানে কেউ আসে, সে যেন এই অগোচরের অহঙ্কার ভেঙে এক মুঠো আলোককণিকা বন্দী করে নিয়ে যায়। মাটির দুনিয়ার মান রাখতে হলে তার চেয়ে বড় কাজ আর কিছু নেই।

ডোরাকে এইসব কথা লিখতে হবে। কিন্তু সে কি খুসী হবে? খুসী হতো যে, সে আজ পথ থেকে সরে গেছে। বোধ হয় এখন বিলিতি কাপড়ের দোকানে পিকেটিং করছে। হয়তো ছ'মাস জেলও হয়ে গেছে।

স্কোয়াড্রেন বধ্যভূমির ওপর পৌঁছে গেছে। নীচে ওয়াজিরিস্তানের বিচিত্র—প্রান্তর ছোট ছোট গ্রাম ক্ষেত আর বাগিচা। পাহাড়ের ঢালুতে ভেড়া চলছে। বেশীক্ষণ তাকিয়ে থাকলে মনে একটা আবেশ আসে। শিল্পী হয়ে ছবি এঁকে নিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। বিশ্বাস হয় না, পৃথিবীতে ধূলো আছে, কাঁটা আছে, বিষ আছে। সবই মিথ্যা অপবাদ বলে মনে হয়। মাটির পৃথিবীর এই রূপ মানুষেরা জানে না। তাই তারা স্বর্গ কামনা করে। শিল্পী হওয়া উচিত ছিল দিলীপের।

একটা বাজার। তাজটুপি আর পাগবাঁধা শত শত মাথা কিলবিল করছে। বাজারের পাশে খাড়া পাহাড়টার মাথায় একটা জীর্ণ বৌদ্ধ স্তূপ। পাথরের গায়ে ঘুলঘুলির মত কতগুলি গুম্ফা, কতগুলি কালো চোখের কোটর যেন আকস্মিক দুঃস্বপ্নে বিক্ষত হয়ে রয়েছে।

ভারতবর্ষের কোন্ ছাত্র না ইতিহাসে পড়েছে? মীরাগ্রাম থেকে তক্ষশিলা—তক্ষশিলা থেকে পুরুষপুর—পুরুষপুর থেকে রাজগৃহ। এই সেই পুরাতন হৃদয়ের পথ আজও পড়ে রয়েছে—অবহেলা ও অপরিচয়ের কাঁড়ায় ঢাকা। সেই যুগ যুগের কুটুম্বিতার সুখস্মৃতি যেন বিষণ্ণ বেদনায় পাহাড়টার মাথায় ভেঙে পড়ে আছে। আজ কিন্তু সেই……।

দিলীপের হঠাৎ মনে পড়ে যায়—রসিদ খলিফার মামাবাড়ী এই দেশে।

রসিদ খলিফা। দিলীপের ঠাকুরদার আমলের দরজী। আজও সে বেঁচে আছে। সাদা শণের মত ফুরফুরে তার দাড়ি, পাকা ডালিমের মত গায়ের রঙ। ছেলেবেলায় পুজোর সময় জামা সেলাই নিয়ে রসিদের সঙ্গে দিলীপের প্রতি বছর একটা সংঘর্ষ বাধতো। জামার ছাঁট মোটেই পছন্দ হতো না দিলীপের। বুড়ো রসিদকে খিমচে চড়ঘুঁসি মেরে নাজেহাল করতো দিলীপ তারপর দেয়ালীর সময়, লেপ সেলাই করতে আসতো রসিদ। দিলীপ বসে বসে রসিদের কাছে গল্প শুনতো—রসিদের মামাবাড়ী ওয়াজিরিস্তানের গল্প।

শত্রুপুরী নয়, সেই রূপকথার দেশ আজ তার পায়ের নীচে। রাবণের সিঁড়ির শেষ ধাপে উঠে দিলীপ ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে দেখছে সেই দেশ। কখন্ আবার বিদ্যুতের ঘণ্টি বেজেছে, কাজের অর্ডার এসেছে, দিলীপ কিছুই জানে না। ঠাণ্ডা আয়নার মত তার চোখ দুটোতে শুধু নীচের পৃথিবীর প্রতিচ্ছবি চিক্‌চিক্ করছে। বোমা পড়ছে—এক একটি বিস্ফোরণে এক একটি প্রকাণ্ড ধোঁয়ার গোলাপ হঠাৎ পাঁপড়ি মেলে ফুটে উঠছে। বাজারটা আর নেই। শুকনো পাতার মত কতকগুলি নিরুপায় ভূচর প্রাণ এক ঝড়ের ঝাপ্‌টায় ছিট্‌কে পড়ছে চারদিকে।

দিলীপের সহকর্মী দুজন উৎসাহের সঙ্গে কাজ করে চলেছে। ওদের চোখে মুখে কী অকপট সংহারের আনন্দ। শুধু দিলীপের অন্তরাত্মা যেন ধরা-পড়া চোরের মত আসরের এক কোণে মাথা গুঁজে পড়ে রইল।

শুধু মনে পড়ে—রসিদ খলিফার মামাবাড়ী। হিমে নয় বৈরাগ্যে নয়, নিতান্ত এক পার্থিব মমতার আবেশে দিলীপের সম্বিৎ অসাড় হয়ে রইল। নীচে যে জীবনের সুখদুঃখের নর্তন চলেছে, সে নিজেই যে তার একটি উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত জীবাণু। সেখানে রসিদ খলিফার মামাবাড়ী—মৃত্যুর ঢিল ছুঁড়ে মারতে হাত ওঠে না। একেই বলে ভীরু কাপুরুষ, একেবারে হৃদয় তাপের ভাপে ভরা ফানুস।

বোম্বারের দল ঘাঁটিতে ফিরে এসেছে। বিমানের ভেতর থেকে মূর্চ্ছাহত দিলীপ দত্তকে বের করে একটা ষ্ট্রেচারের ওপর শুইয়ে রাখা হয়েছে। ধরাচুড়া ছেড়ে কয়েকটি গগনবিহারী ষণ্ডা ষণ্ডা ভার্বিশায়ার দুলাল চায়ের বাটি হাতে নিয়ে আরামে চুমুক দিচ্ছে। দিলীপের দিকে তাকিয়ে হাসছে।

ঠিক মূর্চ্ছা নয়, চোখ মেলে তাকাতেই পারছিল না দিলীপ। অভিযান এখনও শেষ হয়নি, আরো পথ বাকী আছে। এখান থেকে হাসপাতাল, তারপর হেড

কোয়ার্টারে চালান, তারপর তদন্ত। তদন্তের শেষে বরখাস্ত। একটি মেকি বীর্য্যবন্তের কুশপুত্তলিকা আবার চুপি চুপি হাওড়া এক্সপ্রেসে চড়ে বসবে। আবার সুজাবাগ ষ্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। টেলিগ্রাম পেয়ে বাবার আর্দালি আর টু-সীটার এসে অপেক্ষায় বসে থাকবে।

ডোরা আসবে, নন্দীসাহেবও বোধ হয়। কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে ডোরা ফুলের তোড়া হাতে তুলে? কতক্ষণ তার সুন্দর ঠোঁট দুটিতে হাসি ফুটে থাকবে? এক মিনিট দুমিনিট···পাঁচ মিনিট। তারপর আর বঝতে বাকী থাকবে না।

দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে ডোরার হাত কাঁপতে থাকবে। সেই ধিক্কারে ফুলের তোড়া লুটিয়ে পড়বে প্ল্যাটফর্মের কাঁকরের ওপর। ফুলের তোড়াটা হাত তুলে দিলীপ নিতেও পারবে না, মাটি থেকে তুলে ফিরিয়ে দিতেও পারবে না। শুধু নিঃশব্দে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে থাকবে দিলীপ।

কালাগুরু

কত মহকুমা অফিসার এল আর গেল, কিন্তু মিস্টার টেনব্রুকের মত কেউ নয়। ছোট সহর সেখপুরার হৃদয় তিনি প্রায় জয় করে বসেছেন। একা উদ্যোগী হয়ে, চাঁদা তুলে আর গ্র্যাণ্ট বাগিয়ে হাসপাতালটাকে তিনিই মন্দদশা থেকে উদ্ধার করেছেন। পদগৌরবে তিনি মহীরুহ সমান, কিন্তু ব্যবহারে তৃণাদপি সুনীচ। অতি অমায়িক মিশুক প্রকৃতির লোক। আজ সন্ধ্যায় তাঁকে দেখা যায়, দর্জিপাড়ার মিলাদে অন্তরঙ্গ হয়ে মিশে আছেন, কাল সন্ধ্যায় হরিসভার প্রাঙ্গণে। জুতো জোড়া দরজার বাইরে খুলে রেখে আসতে কখন ভুল করেন না। কোন মতেই তাঁর নিষ্ঠাব খুঁত ধরা যায় না।

মিস্টার জেরোম টি এল টেনব্রুক ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের একটি নতুন নক্ষত্র। আর আলোটাও একেবারে নতুন ধরণের। তা'ছাডা তিনি একজন ইণ্ডোলজিস্ট। নিউ-ইয়র্কের স্যামসন ইনষ্টিটিউটের মুখপত্রে তাঁর গবেষণার বিবরণ নিয়মিতভাবে ছাপা হয়। তাঁর ভারতী বিদ্যার গভীরতা পশ্চিমা পণ্ডিতেরা প্রথম জানতে পারেন সেই বিখ্যাত থীসিস থেকে—ঋগ্বেদের প্যান-থীইজ্‌মে কেলটীয় চারণসঙ্গীতের প্রভাব। এই দুরূহ সিদ্ধান্তকে প্রমাণে-অনুমানে প্রতিপন্ন করতে হ'লে যে-পরিমাণ সপ্রতিভ যোগ্যতা থাকা দরকার, টেনব্রুক সাহেবেব সে-সবই আছে। অর্থাৎ তিনি দেবনাগরী লিপি পড়তে পারেন, বাংলা লিখতে পাবেন ও হিন্দীতে বক্তৃতা দিতে পারেন। তাঁর দাদু ক্যাপ্টেন টেনব্রুক ছিলেন বিখ্যাত পরিব্রাজক মার্ক টোয়েনের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। ভারতীয় কাল্‌চার সম্বন্ধে নানা নিগূঢ় তথ্য তিনি দাদুর কাছ থেকেই জানতে পেরেছিলেন। আজকাল ইণ্ডিয়াতে একটা জাতিবাদী অনুদারতার মালিন্য দেখা দিয়েছে, নইলে টেনব্রুকের প্রতিভার এই দিকটাও লোকে চোখে দেখতে পেত। জগদীশপুর থেকে বদলী হবার সময় বিদায়-সভায় বক্তৃতাক্রমে তিনি তাঁর মনের কথা অকপটে খুলে বলেছিলেন—"আমার বুঝতে ভুল হতে পারে, হয়তো আমার জানার মধ্যে ভুল আছে, কিন্তু ইণ্ডিয়ার আত্মাটিকে আমি একরকম চিনেছি। চিরধবল কাঞ্চনজঙ্ঘার চূড়ার মত ভারতের সেই আত্মাটিকে আমি ভালবাসি।"

অনেকদিন আগে রাজগীরের মাঠে একটা পাথরের ধূপদান কুড়িয়ে পেয়েছিলেন টেনব্রুক। এই ধূপদানটা একটা লালচে বেলেপাথরের ফোটা পদ্মফুলের মত।

স্টুডিয়োতে একটা লম্বা তেপায়া স্ট্যাণ্ডের ওপর ধূপদানটা বসানো থাকে। প্রতি সন্ধ্যায় বেয়ারা এসে ধূপদানের বুকে প্রায় আধমুঠো কালাগুরু পুড়তে দেয়। টেনব্রুক বলেন—এর মধ্যে একটা অদ্ভুত প্রাচ্য সৌগন্ধের যাদু লুকিয়ে আছে।

বিদ্যাপীঠের ছোট ছোট ছেলেরা ফুটবল খেলছিল। আচম্কা একটা হুডখোলা টুরার সড়ক ছেড়ে একেবারে সশব্দে দৌড়ে মাঠের গায়ে লাগলো। দুষ্টু ছেলের মতই উৎসাহে চঞ্চল টেনব্রুক গাড়ী থেকে একলাফে মাঠে নেমে পড়লেন। ছেলেদের সঙ্গে ফুটবল খেলতে লেগে গেলেন।

খেলার মাষ্টার অনাদিবাবুর বুকে দুরু-দুরু শুরু হয়ে গেল। কিছুক্ষণের জন্য হুইসিল বাজানো ভুলে গেলেন। তবু বার বার ডেভিড হেয়ারের কথা স্মরণ ক'রে কোনমতে নিজেকে ধীরে ধীরে আশ্বস্ত করে আনলেন। আবার আগের মত খেলা জমে উঠলো।

কিন্তু করালীবাবুর ছেলেটা, ঐ বলাই হলো এক নম্বরের বেয়াড়া। বল ছেড়ে দিয়ে যেভাবে পেছন থেকে সাহেবকে লেঙ্গি মারবার চেষ্টা করছে, ঘন ঘন ফাউল হেঁকেও ওকে দুরস্ত করা যাচ্ছে না। অনাদি মাষ্টারের মনের শান্তি ক্ষণে ক্ষণে খুঁচিয়ে নষ্ট করছিল বলাই—হিতাহিত ভাবনা নেই ছেলেটার।

খেলার শেষে টেনব্রুক সাহেব কিন্তু সব ছেলেদের মধ্যে বেছে বেছে বলাইকেই পিঠ চাপ্ড়ে বাহ্বা দিয়ে গেলেন। সাহেব চলে যাবার পর অনাদি মাষ্টার তবু বলাইকে আর একবার ভাল করে ধমকাতে ছাড়লেন না—ভবিষ্যতে আর কখনো এরকম গোঁয়ারের মত খেলবে না।

অনাদি মাষ্টারেব মন কেন জানি ভরসা পাচ্ছিল না।

টেনব্রুক সাহেবকে লোকে আরও ভাল করে চিনতে পারলো সেইদিন—দরবার দিবসের অনুষ্ঠানে। ধন্য ধন্য পড়ে গেল। বার লাইব্রেরী ও তালুকদার সমিতির প্রত্যেক সভ্য, তা'ছাড়া যত কেরাণী বেনিয়া পাদরী, সকলেই টেনব্রুক সাহেবের বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ হয়ে ঘরে ফিরে গেলেন।

টেনব্রুক সাহেব তাঁর বক্তৃতায় বলেছিলেন —"আমি প্রত্যেকটি সরকারী কর্ম্মচারীকে এবং বিশেষ করে পুলিশকে একটি সত্য স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেই সত্য হলো, তাঁরা যেন কখনো না মনে করেন যে তাঁরা জনসাধারণের ভাগ্যবিধাতা। তাঁরা পাব্লিকের সেবক মাত্র। পুলিশ যেন সর্ব্বদা মনে রাখে যে তারা মস্তিষ্ক নয় —তারা দুটি হাত মাত্র। তাদের কর্ত্তব্য শুধু অর্ডার পালন করা। আজকের সুপ্রভাতে আমার মনে কেন জানি একটা আবছা আশঙ্কা থেকে থেকে উঁকি দিচ্ছে,

ভারতের আকাশে অলক্ষ্যে কোথায়ও বোধ হয় এক টুকরো অবাঞ্ছিত বেদনার মেঘ ঘনিয়ে উঠছে। বোধ হয় একটা পরীক্ষার দিন এগিয়ে আসছে। আমাদের এই ছোট সুখী সহরেও ঝড় দেখা দিতে পারে। সেই পরীক্ষায় পাব্লিক ও গবর্ণমেণ্টের সম্পর্ক যেন অনর্থক তিক্ত না হয়ে ওঠে। সেইজন্য আমি আগে থেকেই সবার আগে পুলিশকে তার কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই সতর্কবাণী শুনিয়ে দিতে চাই। পুলিশ যদি আইনের মাত্রা লঙ্ঘন করে, তবে সেটাও রাজদ্রোহ বলে গণ্য করতে গবর্ণমেণ্ট বাধ্য হবে, তার শাস্তিও আছে।"

বক্তৃতার সময় সকলেই একটা তীব্র কৌতূহল ও ঐতিহাসিক প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে ডি-এস-পি রায়বাহাদুর জানকী প্রসাদের দিকে তাকিয়ে দেখছিল। পুলিশ-প্রধান জানকীপ্রসাদের মুখে কিন্তু কোন ভাববৈকল্য দেখা দেয় নি। লড়াইয়ের ঘোড়ার মত তাঁর কপালের মোটা মোটা শিরাগুলি এক অবধারিত আশ্বাসে শান্ত গর্বে দপ্‌ দপ্‌ করছিল—যেমন নির্বিকার, তেমনি শান্ত আর তেমনি স্পষ্ট।

বিদ্যাপীঠের খেলার মাঠের মতই সেখপুরার জীবন হাসিখুসীতে চঞ্চল হয়েছিল। টেনব্রুক সাহেব রোজ না হোক্‌, সপ্তাহে তিনটি দিন অন্ততঃ খেলতে আসেন। অনাদি মাষ্টার একটা আশঙ্কা থেকে রেহাই পেয়েছেন। বলাই আর টেনব্রুক সাহেব একই সাইডে খেলে। দু'জনের মধ্যে আর সংঘর্ষের কোন অবকাশ নেই। ছেলেগুলি সত্যি সত্যি খেলার ব্যাপারে যেন টেনব্রুকের ন্যাওটো হয়ে উঠেছিল। প্রতি বৈকালে ওরা সাগ্রহ প্রতীক্ষায় সাহেবের গাড়ীর শব্দের জন্য উৎকর্ণ হয়ে থাকে।

তবু মেঘ দেখা দিল। সেখপুরা সহরকে সত্যিই যেন একটা ঝড়ের আবেগ চারদিক থেকে ঘিরে ধরেছে। লোকাল বোর্ডের একুশ জন সদস্য ইস্তফা দিল। তিনটে দিন হরতাল হলো। রাজগঞ্জ কোলিয়ারিতে সুরু হলো ধর্ম্মঘট। জৈন ধর্ম্মশালার আঙিনায় একটা জনসভাও হয়ে গেল। একটা হাজার-মানুষের শোভাযাত্রা স্বরাজ পতাকা নিয়ে সহর প্রদক্ষিণ করে গেল।

মিষ্টার টেনব্রুক অবিচল ছিলেন। একটিও লোক গ্রেপ্তার হলো না, একশো চুয়াল্লিশ জারি ক'রে কোন ঢোলের শব্দ বাজলো না। পুলিশ শুধু সেজেগুজে কোতোয়ালীতে বসে থাকে। বাইরে যাবার কোন প্রয়োজন হয় না—টেনব্রুকের কড়া নির্দ্দেশ।

সূর্য্যকুণ্ডের জলের মত সেখপুরা যেন তিনটি মাস ধরে উত্তেজনায় ফুটতে লাগলো। তার মধ্যে মিষ্টার টেনব্রুক শুধু একটি কাজ করলেন। দিকে দিকে ইস্তাহার ছড়িয়ে দিলেন—"আমার প্রিয় সেখপুরার পাব্লিকের কাছে এই আবেদন করতে চাই যে, যে

কোন বিবাদ বা প্রতিবাদ হোক্, আলোচনা করে তার নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। সভ্যতার চরম উন্নতি হলো ডেমোক্রেসী, ডেমোক্রেসীর প্রাণ হলো ডিসিপ্লিন। সেই ডিসিপ্লিন যেন নষ্ট না হয়!"

ঘটনাগুলি যেন নিজের উত্তেজনাতে অবসন্ন হয়ে ক্রমে থিতিয়ে এল। কোথাও প্রতিহত হলো না বলেই বোধ হয় ফুরিয়ে গেল। টেনব্রুক তাঁর নৈতিক এক্সপেরিমেণ্টের এই অভাবিত সাফল্যে খুসীতে বিভোর হয়ে রইলেন। সহরের নানা সম্প্রদায়ের দশজন বেসরকারী এবং পাঁচজন সরকারী প্রধানকে ডেকে নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করলেন। কে যেন পরামর্শ দিল, ডি-এস-পি'কে কমিটির মধ্যে গ্রহণ করা হোক্। শুদ্ধাদর্শী টেনব্রুক শুচিবাতিকের মত নাক কুঁচকে আপত্তি জানালেন—না, কোনমতেই নয়।

শুধু থামছে না প্রভাত ফেরীর গান। ঝড়টা যেন পালিয়ে গেছে শুধু ভৈরবী সুরের একটা আক্রোশ রেখে দিয়ে! সেথপুবার নিথর সুপ্তির মধ্যে প্রতিদিন শেষ রাত্রে কারা যেন পথে পথে গান গেয়ে চলে যায়। টেনব্রুক দিন গুনছিলেন, এই চৌর-চপলতাও ক্রমে শান্ত হয়ে আসবে।

অনেকদিন গোনা হয়ে গেল। টেনব্রুক তবু ধৈর্যে ও বিশ্বাসে অটল ছিলেন। শান্তি কমিটি কত গোপন খবর এনে দিল, তবু প্রভাতফেরীর রহস্যটা আজও ঘুচলো না। কেউ বলতে পারে না, কারা গান গায়, কোথা থেকে আসে এবং কোথায় চলে যায়? মাঝ রাত্রে সহরের সব পাড়ার কত ছেলেবুড়ো উঠে বসে থাকে। প্রতীক্ষায় নিঝুম মুহূর্তগুলি পার হতে থাকে। হতাশ হয়ে ভাবে—আজ বুঝি আর গানটা এল না। সেই আনমনা অবকাশের মধ্যে চকিতে বাইরের পথে গানের শব্দ উতরোল হয়ে ওঠে। দরজা খুলে বাইরে আসতে আসতেই মিলিয়ে যায়—কাউকে দেখা যায় না।

এ গান কখনও বন্ধ হবে না। সহরে একটা কাহিনী ছড়িয়ে পড়েছে। —এই গয়ারোড ধরে যদি মাইল খানেক পশ্চিমে এগিয়ে যাও, তবে প্রথমে পড়বে ডুমরিচকের ডাকবাংলা। সেখান থেকে ডাইনে বেঁকে আরও পাঁচ ক্রোশ। পুরনো কারবালা পার হয়ে একটা বহেড়ার জঙ্গল, তার উত্তর ঘেঁসে একটা নদী। নদীর এক পাশে একটা প্রকাণ্ড পিপুল গাছ হেলে আছে। অন্য পাশে পি-ডব্লু-ডির সড়ক।

—হাঁ আছে। সবাই জানে, সার্ভিস বাসগুলি গিরিডির পথে মোড় ফেরবার আগে এইখানে একটু জিরিয়ে নেয়, রেডিয়েটারে নতুন জল ঢালে। একটা চৌকীদারী ফাঁড়ি আছে সেখানে। পিপুলতলার একটা গাঁথুনির ওপর দ্রাঘিমার নম্বর চিহ্নিত আছে।

শোকাবহ বেদনায় কাহিনীটা আরো করুণ হয়ে ছড়িয়ে পড়ে।—সেই সব সাতান্নর

গদরে ঠিক ঐ জায়গাটিতে একশো জন ছত্রী সেপাইয়ের প্রাণ গিয়েছিল। এক কার্ণাইল সাহেব ঐ পিপুলতলায় তোপ বসিয়ে বন্দী ছত্রীদের উড়িয়ে দিয়েছিলেন।

আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে কাহিনীটা সবার কানে কানে চুপি চুপি ফিসফিস্ করে যায়।—গানটা সত্যিই তো মানুষের গলার গান নয়—প্রভাতফেরীটেরী নয়। একটা শব্দ-মরীচিকা মাত্র। গয়ারোডের দিক থেকেই শব্দটা প্রথমে শোনা যায়। সারারাত ধরে এগিয়ে আসে, তারপর সহরে ঢোকে এবং ভোর হতে না হতেই সরে পড়ে।

মিষ্টার টেনব্রুকও কাহিনীটা শুনলেন। বিভ্রান্ত ও সন্ত্রস্ত শান্তি কমিটিকে তিনিই আশ্বাস দিয়ে জানালেন—ঘাব্ড়াবার কিছু নেই। এইসব প্রেতরাগিণী আর কিম্বদন্তীর সঙ্গে লড়বার কায়দাও আমি জানি।

অগ্রাণের রাত্রি ভোর হয়ে আসে। মোড়ের মাথায় মিউনিসিপাল ল্যাম্পপোষ্টের মাথাটা তখনো জ্বলছে। শিশির-ভেজা সড়কটা নেতিয়ে পড়ে আছে অলসভাবে। শালের ডালপালাগুলি এক একটা কুয়াসার স্তবক আঁকড়ে নিঝুম হয়ে আছে। সেই ফিকে অন্ধকার আর মূক নিসর্গের মাঝখানে কাছারী রোডের ধারে একটি গাছতলায় মিষ্টার টেনব্রুক যেন গা-ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন—এক অবাস্তব দেশের সেনাবারিকে সতর্ক শান্ত্রীর মত।

এতক্ষণে শুনতে পাওয়া গেল। মন্থর বাতাসের গায়ে দূরাগত সেই অদ্ভুত সুরের শিহর এসে লাগছে। গানের ভাষা স্পষ্ট কিছু বোঝা যায় না। ছোট ছোট শব্দময় স্রোত একসঙ্গে মিশে গিয়ে যেন এক সুরপ্রপাত সৃষ্টি করেছে। তারা এগিয়ে আসছে।

—নয়া জমানার সূর্য্য উঠেছে! জাগো আমার হিন্দুস্থানী ভাই আর বহিন। জেগে উঠে এই নতুন রশ্মি সাগ্রহে পান কর।

গাইতে গাইতে প্রভাতফেরীর দলটা সামনে এসে পড়লো। ছোট ছোট কতগুলি গীতপ্রাণ অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি। চেনবার জো নেই। মিষ্টার টেনব্রুক স্তব্ধ হয়ে নিশ্বাস রুখে শুনছিলেন। কতগুলি কচি কিশোর মানুষের মিলিত কণ্ঠস্বর—তার হর্ষ উল্লাস আক্ষেপের প্রত্যেকটি ধ্বনি তাঁর অতি পরিচিত। টেনব্রুকের চোয়াল দু'টো রুদ্ধ উত্তেজনায় নিঃশব্দে কঠিন হয়ে উঠতে লাগলো।

আরও কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনলেন টেনব্রুক। পরিশ্রান্ত গানের সুরটা যেন এপাড়া-ওপাড়া এলোপাথাড়ি দৌড়ে চলে যাচ্ছে। মাঠের কাছাকাছি গিয়ে গানটা আর একবার বিজয় প্রণাদের মত উদ্দাম হয়ে উঠলো। তারপরেই আকস্মিক একটা বিরাম।

কিছুই শোনা যায় না। অনেকক্ষণ পরে আবার গুম্‌রে উঠলো—একেবারে অন্যদিকে। বোধ হয় পশ্চিমের ধানক্ষেতের ওপর দিয়ে রেললাইন ডিঙিয়ে দর্জিপাড়ার দিকে ছুটে চলেছে। চটুল ঘূর্ণি বাতাসের মত গানটা যেন উড়ে যাচ্ছে।

গল্প আছে, আওরঙজেব অক্ষয় বটের শেকড় তুলে ফেলে তাতে গরম সীসা ঢেলে দিয়েছিলেন যেন ভবিষ্যতে কোন দিন আর চারা গজিয়ে না ওঠে। একেই বোধ হয় আমূল চিকিৎসা বলে।

টেনব্রুক বোধহয় গল্পটা জানতেন। বিকালে বিদ্যাপীঠের ছুটির পর ছাত্রেরা কেউ বাড়ী যেতে পারেনি। স্বয়ং টেনব্রুক উপস্থিত থেকে ছাত্রদের একটা শোভাযাত্রা রওনা করিয়ে দিলেন। রাত দশটা পর্যন্ত সহরের সর্ব্বত্র এই শোভাযাত্রা ঘুরবে। ফিরে বিদ্যাপীঠে এসেই শেষ হবে, তারপর খাওয়া দাওয়া হবে। টেনব্রুক জিলিপি কেনবার জন্য দশটি টাকা দিলেন।

প্রায় একশো ছাত্রের পুরোভাগে অগ্রনায়কের মত একটু এগিয়ে দাঁড়িয়েছিল বলাই। তাকেই শোভাযাত্রা চালিয়ে আর গাইয়ে নিয়ে যাবার ভার দেওয়া হয়েছে। টেনব্রুক সাহেবের নির্দ্দেশ।

বলাইয়ের মাথাটা সামনের দিকে ভাঙা গাছের ডালের মত ঝুঁকেছিল। মাটির দিকে একটা উদ্দেশ্যহীন দৃষ্টি নিয়ে দেখছিল বলাই। ওর সমস্ত দুরন্তপনা এক চরম অপমানের আঘাতে যেন অসাড় হয়ে গেছে। আসন্ন মূর্চ্ছার সময় রোগীকে যেন জোর করে দাঁড় করিয়ে রাখা হয়েছে।

গানটা টেনব্রুকের রচনা। নাম্‌তা পড়াবার ভঙ্গীতে বলাই সুর করে গানের প্রথম পদটি গাইলো —আমি যীশুর ছোট মেষ।

শোভাযাত্রী ছেলেরা বিষণ্ণ পাখির ঝাঁকের মত কিচির মিচির করে ধুয়া ধরে গাইলো —আমি যীশুর ছোট মেষ।

যেন জিভে কামড় পড়েছে, বলাই হঠাৎ আরও জোরে বিকৃত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো। —প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ—

ছেলেদের দল প্রতিধ্বনি করলো।—প্রতিদিন মোর সুখ অশেষ।

শোভাযাত্রা রওনা হলো। হিতৈষী অভিভাবকের মত মনের স্নেহ মনেই গোপন রেখে, শাসনের দোর্দণ্ড বিগ্রহের ভঙ্গীতে যেন টেনব্রুক কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে দেখলেন, বাংলোয় চলে গেলেন। তিনি জানতেন, রাত্রি দশটা পর্যন্ত এইভাবে সুপথে চলে চলে ছেলেগুলি ক্লান্ত হয়ে পড়বে, বিপথে যাবার উৎসাহও নিভে যাবে।

তা'ছাড়া দশটাকার ঘুমপাড়ানী মিষ্টির ব্যবস্থাও করে দিয়েছেন। আর ভাবনা নেই। টেনব্রুক নিশ্চিন্ত হলেন।

সন্ধ্যে হয়েছে। ডিষ্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারখানা টেবিলের ওপর রাখা ছিল। ইণ্ডোলজিস্ট টেনব্রুক আজ সেখপুরার প্রত্নরহস্যের বুক চিরে খানাতল্লাসী করবেন।- ঐ প্রতি-হিংসাপরায়ণ কিম্বদন্তীটা ভয়াবহ ব্যাধির মত সারা সেখপুরার নাগরিক বুদ্ধি বিষাক্ত করে তুলেছে। এর পেছনে কোন সত্যের ভিত্তি আছে কি ?

গেজেটীয়ার হাতড়ে হাতড়ে টেনব্রুক এক জায়গায় এসে বিস্ময়ে চম্‌কে উঠলেন। সত্যিই যে লেখা আছে ছাপার অক্ষরে—ডুমরিচকের ডাকবাংলো থেকে এগার মাইল দূরে যে পিপুল গাছের তলায় স্থানীয় দ্রাঘিমারেখার পরিচয় লেখা আছে, সেখানে একদিন কোম্পানীর ফৌজের কামানের বেদী ছিল। স্থানীয় লোকেরা বলে, মিউটিনির সময় ঐখানে সেপাই বন্দীদের প্রাণদণ্ড হয়েছিল।

প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের কোন্ গবেট সার্ভেয়ার এই ষাঁড়-মোরগ গল্পটি সরকারী গ্রন্থের পাতায় ফেঁদে গেছেন! মিষ্টার টেনব্রুক মনে মনে সেই মূঢ় পণ্ডিতের বুদ্ধিকে লিঞ্চ করলেন। ধিক্কার দিলেন—এইসব রন্ধ্র দিয়েই একদিন শনি ঢোকে এবং হয়েছেও তাই। জন কোম্পানীর বেণেবুদ্ধি দিয়ে বিংশ শতাব্দীর কলোনি শাসন চলে না। চাই আমূল চিকিৎসা। ইণ্ডোলজিস্ট টেনব্রুক তাঁর প্রতিভার ছুরিকে দু'ঘণ্টা ভেবে ভেবে শানিয়ে নিলেন।

নতুন করে প্যারা লিখলেন টেনব্রুক।---'ডুমরিচক ডাকবাংলা থেকে এগার মাইল দূরে, নদীর ধারে, পিপুলগাছের তলায় যেখানে দ্রাঘিমারেখার পরিচয় লেখা রয়েছে, সেখানে (প্রথম পৌরাণিক যুগে—খৃষ্ট মৃত্যুর পরে পঞ্চম শতকে) ব্রহ্মদত্ত নামে এক ঋষির আশ্রম ছিল······।

হঠাৎ একবার কলম থামালেন টেনব্রুক। ভাবতে ভাবতে ভুরু দুটো কেঁচোর মত পাকিয়ে উঠলো। কদর্য্য একটা কুহক যেন ছোট ছায়ামূর্ত্তি ধরে তাঁর দৃষ্টিপথ জুড়ে নেচে বেড়াচ্ছে। এই মূর্ত্তিটাকে চিনতে পারা যায়—গান্ধী গান্ধী গান্ধী। সবাই তাকে বলে গান্ধী। কে এই গান্ধী ? এই অশান্ত অবাধ্য দুষ্টু ফকীর গান্ধী ? কী ভেবেছে সে ?

দাঁতে দাঁত চেপে শক্ত করে কলমটা আবার তুলে ধরলেন টেনব্রুক। যেন একটা প্রেরণার আবেশে লিখে ফেললেন।—'এক দুর্দান্ত পাপী কিরাতের দৌরাত্ম্যে রাজ্যের সুখ ও শান্তি নষ্ট হতে বসেছিল। ক্ষত্রিয় রাজা দেবপ্রিয়োর সেবায় ও প্রার্থনায় তুষ্ট হয়ে ঋষি ব্রহ্মদত্ত সেই কিরাতকে অভিশাপ দিয়ে ভস্ম করে ফেলেন।'

টাইপ রাইটার মেসিনটাকে সাগ্রহে বুকের কাছে টেনে নিলেন টেনব্রুক। নতুন একটি কাগজের স্লিপের ওপর এই ঐতিহাসিক সত্যটিকে টাইপ করে সাজালেন। পুরনো প্যারাগ্রাফের ওপর খাপে খাপে মিলিয়ে আঠা দিয়ে সেঁটে দিলেন। চেপে চেপে বসিয়ে দিলেন, চার পাশ থেকে দেখলেন, যেন কোথাও কোন ফাঁক না থাকে।

এই সামান্য কাজটুকু করতেই হাঁপিয়ে উঠেছিলেন টেনব্রুক। ক্ষণে ক্ষণে উত্তেজিত হয়ে পড়ছিলেন। একটা বাচাল ঝর্ণার মুখে যেন পাথর চাপা দিচ্ছেন। আশ্বস্ত হলেন, আর কোন ফাঁক নেই।

বাকী রইল আজকের রাতটা। তখন সন্ধ্যে পার হয়ে গেছে। এক পেয়ালা কফি খেয়ে পরিশ্রান্ত টেনব্রুক ঘরের ভেতর কিছুক্ষণ পাইচারী করে নিলেন। তারপর ল্যাম্পের ওপর নীলকাঁচের ঘেরাটোপ টেনে নিয়ে পড়তে বসলেন। সার্থক আনন্দের আরামের সোফার ওপর শরীর এলিয়ে দিলেন।

বাইরের শব্দহীন অন্ধকারটা তখন জমাট বেঁধে গেছে, একটা শোকাচ্ছন্ন রাত্রির হৃদপিণ্ডের মত। আমবাগানের ভেতর দিয়ে ছাত্রদের শোভাযাত্রা ফিরছে এতক্ষণে। একশত ক্লান্ত ভাঙা-গলার একটা বিকৃত গানের শব্দ আসছে। ঠিক শব্দ নয়—শব্দের রুষ্ট নিঃশ্বাস। একটা আহত সর্পযূথ যেন বিষদাঁত নতুন করে ঘসে নেবার জন্য আড়াল দিয়ে সরে পড়ছে।

হঠাৎ শিউরে উঠলেন টেনব্রুক। ভারতের আত্মার ছবিটা টেনব্রুকের মনের ভেতর হঠাৎ ঘোলা হয়ে গেল—কাঞ্চনজঙ্ঘার চিরধবল চূড়ার মত নয়, বলাইয়ের মুখটার মত বর্ণচোরা হিংসুক ও ভীরু।

টেনব্রুক খোলা জানালাটার দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মত কিছুক্ষণ নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে রইলেন। একটা নিষ্ঠুর নৈরাশ্য চিন্তার শিরায় শিরায় শিউরে উঠতে লাগলো।—না, ওরা মানবে না। আবার ওরা আসবে। আজই রাত্রিশেষে সেই বায়ুভূত নিরালম্ব ছোট ছোট মসীমূর্ত্তি—সয়তানী আনন্দে অপমৃত্যুর কোরাস গাইতে গাইতে আবার আসবে—দল বেঁধে—কাতারে কাতারে।

রাজগীরের ধূপদানের বুকটা তখন প্রবলভাবে পুড়ে চলেছে। কুণ্ডলী কুণ্ডলী ধোঁয়া জানালার গরাদের ফাঁক দিয়ে অবলীল স্বাচ্ছন্দ্যে বাইরে উড়ে যাচ্ছে। টেনব্রুকের মাথার ভেতর একটা বোবা বিভীষিকা ছটপট করতে লাগলো।

অসহ উদ্বেগে টেনব্রুক টেবিলের ওপর ঘণ্টি ঠুকতে লাগলেন। বেয়ারাটা তন্দ্রা ছেড়ে ব্যস্ত হয়ে দৌড়ে এসে ডাকলো—হুজুর!

টেনব্রুকের সারা মুখে একটা রক্তাভ জ্বালার দীপ্তি। মাত্রা ছাড়িয়ে অস্বাভাবিক রকম স্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন—জলদি দৌড়ে যাও, ডি-এস-পি সাহেবকে সেলাম দাও। সুবেদার মেজরকে বোলাও। জলদি কর। আজ রাত্রে ইষ্টার্ণ রাইফেলস্ ঘুমোতে পারবে না। সহরটাকে কর্ডন দিতে হবে। সমস্ত রাত পাহারা দিতে হবে। শিকারীর মত তাড়া করে আজ ওদের ধরে ফেলতে হবে। চরম শিক্ষা শিখিয়ে দিতে হবে আজ।

ডেমোক্রেসীর এই সঙ্কটের শেষ ঘটনা হলো সম্রাট বনাম বলাইয়ের মোকদ্দমা। তার বিবরণ জানবার উপায় নেই। কে ঢুকবে আদালত এলাকায়? যে-ভয়ানক লাঠি আর লালপাগড়ীর আস্ফালন! বন্দীবাহী মোটর লরিটা থেকে নামবার সময় দূর থেকে বলাইকে চকিতে একটুখানি দেখতে পাওয়া যায়। মাথায় ব্যাণ্ডেজ, কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া। ডি-এস-পি জানকী প্রসাদের মূর্ত্তিটাই সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে চোখে পড়ে। আদালতের উঁচু বারান্দার ওপর টান হয়ে দাঁড়িয়ে বেল্টের ওপর হাত বোলান, কপালের ওপর মোটা মোটা শিরাগুলি অশান্ত গর্বে দপ্ দপ্ করে ফুলে ওঠে, আর ফটকের বাইরে ভীড়ের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ গর্জন করে ওঠেন—ডিসপার্স।

তারপরেই ফটকের পুলিশ পিকেটের দিকে তাকিয়ে থাবা তুলে অর্ডার হাঁকেন—চার্জ!

বারবধূ

বাইরের বারান্দায় অনেকগুলি পায়ের শব্দ শোনা যায় ; তার সঙ্গে একদল মেয়ে ও পুরুষের হাসিখুসী ও আলাপের কলবর। কারা যেন এসেছে। এইবার কড়া নাড়ছে।

—শুনছেন ! এক ভদ্রলোকের গলার স্বর শোনা গেল।

ঘরের ভেতর বসে চমকে উঠলো প্রসাদ। চেয়ারটা ছেড়ে চকিতে উঠে দাঁড়ালো। ঘরের অবস্থা যেমন অসম্বৃত, তার বুদ্ধিও তখনকার মত তেমনি অপ্রস্তুত। ফাঁপরে পড়লো প্রসাদ। চাপা গলায় আস্তে আস্তে বললো —যা ভয় করেছিলাম, শেষে তাই হলো লতা। শীগগির ওঠ।

লতা বিরক্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বললো —আমাকে মিছে ভোগাও কেন ? আমি ওসবের কি ধার ধারি ?

তাকিয়ার ওপর এলিয়ে শুয়ে লতা তেমনি নিবিষ্টমনে সিগারেট টেনে চললো। পাশে টেবিলের ওপর একটা বীয়ারের বোতল আর চাবি ; তখনো ছিপি খোলা হয়নি। একটা রেশমী সাড়ী লুঙ্গির মত লতার কোমরে জড়ানো। সন্ধ্যাপ্রদীপের সঙ্গে সঙ্গে সবেমাত্র বৈঠক বসেছে।

—অন্যায় করছো লতা। ওঠ লক্ষীটি। তাড়াতাড়ি ঘরটা গুছিয়ে ফেল। এতে শুধু আমারই মান বাঁচবে তা নয়, তোমারও। একটা ভদ্রতা রক্ষা কবে চলতে দোষ কি ? ওঠ, কিছুক্ষণের জন্য একটু কষ্ট কর ; অনেকক্ষণ ওরা বাইরে দাঁড়িয়ে আছে।

লতা উঠলো। প্রসাদ তাড়াতাড়ি বীয়ারের বোতলটা আলমারীতে তুলে বন্ধ করলো। ঘরের দেয়ালে টাঙানো দুটো বড় বড় ছবি নামিয়ে খাটের তলায় লুকিয়ে রাখলো। যতদূর সম্ভব ঘরের মূর্ত্তিটাকে দু'চোখ দিয়ে পরীক্ষা করে দেখলো প্রসাদ—কোথাও কোন অপরুচির ইঙ্গিত সব সতর্কতাকে ফাঁকি দিয়ে যেন লুকিয়ে না থাকে। হাঁ, ঐ পর্দাটা—জরির কাজ করা এক জোড়া বিলিতী নগ্নিকা হাওয়া লেগে কুৎসিতভাবে ঢলে পড়ছে তখনো। প্রসাদ পর্দাটাকে এক থাবা দিয়ে ধরে, কুঁচকে পাকিয়ে, খাটের তলায় ছুঁড়ে দিল।

প্রসাদ —এইবার তুমি একটু তাড়াতাড়ি···

লতা —নাঃ আর পারি না। কি দায় পড়েছে আমার ? এই নিয়ে তিন বার

বাইরের লোকের কাছে আমায় ঢঙ করতে হলো। সারাটা দিন তো তোমার মানের ভয়ে চাকর বাকরের সামনে একটু জোরে হাসতে কাশতেও পারি না। এতই যদি পারি, তবে তোমার কাছে বাঁধা থাকবো কেন? থিয়েটারে খাটলে দুদশ'শো হতো।

প্রসাদ যত ব্যস্ত হয়ে ওঠে, লতার উৎসাহ যেন ততই এক নির্বিকার হৃদয়হীনতায় শ্লথ হয়ে পড়ে থাকে। প্রসাদ অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে রইল। তার মুখের চেহারা শুধু বলছে —জোর করছি না, দয়া করে উদ্ধার কর।

শেষে লতা ফিক করে হেসে ফেলে। প্রসাদের থুতনিটা নেড়ে দিয়ে বললো — ডুডু খাবে খোকা? বুকের পাটা নেই, মেয়েমানুষ রাখতে সখ কেন? শ্যাম রাখি কুল রাখি দুইই একসঙ্গে হয় না।

লতা একটা তোয়ালে আর সাড়ী আল্না থেকে তুলে নিয়ে স্নানের ঘরে চলে যায়। প্রসাদের বুক থেকে বদ্ধ নিশ্বাসটা মুক্তি পায়। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে বাইরের ঘরের দরজা খুলে দেয়। জন চারেক প্রৌঢ় বৃদ্ধ ও যুবক, ছ'সাতজন প্রৌঢ়া ও তরুণী, আর গোটা দশেক ছোট ছোট ছেলে মেয়ে হুড়মুড় করে ঘরের ভেতর ঢুকে পড়ে।

হিলতোলা জুতো আর স্যাণ্ডেলের শব্দ। একপাল ছেলের উল্লম্ফ দৌড়ের হুটোপুটি, সাড়ী আর আঁচলের খস খস্ শব্দ চুড়ির নিক্কন, পাউডার ও এসেন্সের সুবাস —বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চুরুটের ধোঁয়া আর হাতছড়ির ঠুকঠাক্—বাহিরের পৃথিবী থেকে একটা প্রীতি ও সজ্জনতার উচ্ছ্বাস যেন প্রসাদের ঘরের দরজা খোলা পেয়ে ভেতরে এসে ছড়িয়ে পড়লো। প্রসাদ হাসিমুখে নমস্কার জানালো।—আসুন।

বেশ লোক এঁরা। ব্যবহারে কোন জড়তা নেই। কেতাদুরস্তী ভদ্রয়ানার বালাই নেই—অপরিচয়ের সঙ্কোচ নেই। বৃদ্ধ রাখাল বাবু গা থেকে আলোয়ানের স্তূপ নামিয়ে খাটের ওপরেই তাকিয়া টেনে বসে পড়লেন। যে যার ইচ্ছামত চেয়ার টেনে নিল। মেয়েরা ব্র্যাকেট থেকে একটা গোটানো সুতির গালিচা নিজেরাই নামিয়ে নিয়ে, পেতে বসে পড়লো।

রাখাল বাবু বললেন —এইবার তোমার অভিযোগ শুনিয়ে দাও রণজিৎ।

রণজিৎ প্রসাদের দিকে তাকালো —সত্যি মশাই। আপনার বিরুদ্ধে আমাদের অনেক বলবার আছে। আমরাও আপনার মতই এখানে চেঞ্জে এসেছি। এই তো ক'ঘর মাত্র আমরা; এ ছাড়া আর কোন বাঙালীর মুখ দেখতে পাই না। আমরা খুঁজছি কি'করে দল ভারি করি, আর আপনি বেমালুম ডুব দিয়ে আছেন।

প্রসাদ সলজ্জভাবে স্বীকার ক'রে নিল—হাঁ, এটা অন্যায় হয়েছে।

মেয়েদের দল থেকে প্রথম কথা বললো আভা, রণজিতের বোন।

—বড়দা, তোমরা তো এরই মধ্যে নিজেদের দল ভারি করে ফেললে। আমরা কি করি? ভেতর থেকে তো কারও কোন সাড়াশব্দ পাচ্ছি না।

প্রসাদ তেমনি লজ্জিতভাবে হেসে হেসে বললো—একটু অপেক্ষা করুন, এক্ষুণি আসছেন।

পর্দ্দা ঠেলে ঘরে ঢুকলো লতা। চওড়া-পাড একটা তাঁতের সাড়ী পরেছে। সামনেই বুড়ো রাখালবাবুকে দেখতে পেয়ে লতা থম্‌কে দাঁড়িয়ে মাথার কাপড়টা আরও একটু সামনে টেনে নামিয়ে দিল। সিঁথিতে লম্বা সিঁদুরের টান, পায়ে জুতো নেই, তাই দেখা যায় সরু আলতার রেখা।

লতাকে দেখবার পর প্রসাদের মুখের ওপর থেকে এতক্ষণে ভীরু কাতরতার ক্ষীণ ছায়াটুকু সরে গেল। কথাবার্ত্তায় সহজ স্ফূর্ত্তি ফিরে পেল প্রসাদ।

আভা লতাকে হাত ধরে গালিচার উপর বসাবার জন্য একবার টানলো। লতা বললো—ভেতরে চলুন।

বাইরের ঘরে ও ভেতরের ঘরে অনেকক্ষণ অবাধ গল্প, তর্ক ও হাসির পালা গড়িয়ে চললো। ছেলেপিলেরা দু'বার মারামারি বাধালো। তাদের থামাতে গিয়ে বুড়োরা গোলমাল করলো আরও বেশী। আজ দেড়মাসের মধ্যে বরাকর কলোনীর একান্তে এই নিরালা বাংলো বাড়ীটার কোন সন্ধ্যা এত প্রাণময় হয়ে ওঠেনি।

লতা অভ্যাগত সকলকেই আপ্যায়ন করার জন্য খাবার তৈরী করবার উদ্যোগ করছিল। মেয়েরা সবাই মিলে প্রতিবাদ করে থামিয়েছে—শুধু চা হলেই হবে।

লতা বললো—কিন্তু ছেলেরা কি খাবে? শুধু চা? তা হতে পারে না।

লতা প্রায় রাগ করে বসলো।—দেখছেন তো, ওদিকে মশাই কেমন নিশ্চিন্ত মনে শুধু কথা দিয়ে চিঁড়ে ভেজাচ্ছেন। এদিকে কোন হুঁস নেই, খোঁজখবর নেই।

মেয়েরা হেসে উঠলো সবাই। তা আপনি হিংসে করছেন কেন?

আভা হঠাৎ নিজের খেয়ালেই বাইরের ঘরে এসে বসলো।—বৌদি রাগ করছেন। ভেতরে কত কাজ রয়েছে, আর আপনি সব ভুলে গল্পে ডুবে আছেন।

প্রসাদ—কেন কি ব্যাপার?

আভা—স্বয়ং এসে খোঁজ নিন।

লতাও সঙ্গে সঙ্গে এসেছিল। দরজার আড়ালে ভেতরের দাওয়ায় অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিল। প্রসাদ ভেতরে আসতেই ফিস্ ফিস্ করে লতা বললো—চা না হয় হলো, কিন্তু ছেলেপিলেদের কি দেব? তুমি একবার বাজার ঘুরে এস, কিছু মিষ্টি টিষ্টি......।

আভা এবং আরও দু'টি তরুণী একটু দূরে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে প্রতিবাদ করলো — বৌদি বড় বাড়াবাড়ি করছেন।

প্রসাদ বললো —বিস্কুটের টিনটা খুললে হয় না? নইলে বাজারে অবশ্য যেতে হয়।

লতা বললো —তাইতো, মনে ছিল না। যাক্ ওতেই হবে।

মেলামেশার পাট ক্ষান্ত হলো রাত্রি দশটায়। তার আগে প্রসাদকে গাইতে হলো, ঘরের কোণে শালুর খোলে ঢাকা এস্রাজটা গুণী প্রসাদের পরিচয় জাহির করে দিয়েছিল।

রাখালবাবু আলোয়ানটা তুলে নিয়ে গায়ে জড়ালেন আবার। রাখাল বাবুর স্ত্রী, মেয়েরা এঁকে মাসীমা বলে ডাকছিল, পায়ের মোজাটা টেনেটুনে ঠিক করলেন। ফোলা ফোলা পা দুটোতে বেরিবেরির নিদর্শন স্পষ্ট। তারকবাবু নতুন চুরুট ধরিয়ে হাতছড়িটা আবার ঠুকলেন—একা আভা ছাড়া তিনটি মেয়েই তাঁর ভাগ্নী, ভাইঝি আর শ্যালিকা। ছেলেপিলেদের মধ্যে চারজন রাখালবাবুর নাতি—বাকী সবকটি হরিশবাবুর। হরিশ দম্পতি আজ অনুপস্থিত—তাঁরা বাতের প্রকোপে এখন শয্যা আশ্রয় করে আছেন।

রাখালবাবু বললেন —তা হ'লে এইবার তোমায় মুক্তি দেব প্রসাদবাবু। রাত হলো অনেক। আমরা উঠি।

বিদায় প্রসঙ্গে আর একবার আলাপ বার্ত্তার কলগুঞ্জন মুখর হয়ে উঠলো। প্রসাদ ফটক পর্যন্ত লণ্ঠন হাতে এগিয়ে এল। লতা সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে রইল ছায়ার মত।

—আঃ বাঁচা গেল! বীয়ারের বোতলটা আবার টেবিলের ওপর নামালো প্রসাদ। শরীরটা যেন ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল লতার—তাই বিছানার ওপর একটা বালিশ আঁকড়ে চুপ করে শুয়ে রইল।

কিন্তু প্রসাদের গলার স্বরে স্ফূর্ত্তি চড়ে উঠেছে।—এ কি? উঠে বসো। এসময় বে-রসিকতা করো না মাইরি!

লতা কোন সাড়া না দিয়ে তেমনি নিঝুম হয়ে শুয়ে রইল। প্রসাদ হাত ধরে টানাটানি করতেই উঠে বসে রুক্ষস্বরে বললো —যখন তখন অসভ্যতা করো না।

প্রসাদ —বেশ বেশ, করবো না। যাও এবার চট্‌পট্ এই আল্‌তা ফাল্‌তা সাজসজ্জা বদলে এস। এক পাত্র চড়িয়ে নিয়ে বসা যাক্ জুৎ করে।

লতা —এরকম ক্যাংলাপনা করছো কেন? কিছু ফুরিয়ে যাচ্ছে না।

পাশের ঘরে চলে গেল লতা। তাঁতের সাড়ী ছাড়লো, আলতা সিঁদুর মুছে

ফেললো। আম্বিক একটি সন্ধ্যার কপট বধূবৃত্তির নির্মোক ঘুচিয়ে, পায়জামা পরে চটি পায়ে দিয়ে এসে আবার ঘরে ঢুকলো।

প্রসাদ খুসীতে আটখানা হয়ে গেল।—বাঃ, সত্যিই তোমাকে ফাইন মানিয়েছে এইবার।

লতার কানে যেন কথাটা গেল না; ধীরে সুস্থে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো লতা। দূরে বরাকরের পুলের ওপরে একটা আলোর সারি মিট মিট করছে। আর কিছুই দেখা যায় না। একটা কর্কগাছের তলায় স্তূপীকৃত বাসি ফুলের পচাটে উগ্র গন্ধ বাতাসে ভেসে আসে। লতা লম্বা লম্বা টান দিয়ে সিগারেটের ধোঁয়ায় মুখ ভরে নেয়—আস্তে আস্তে ছাড়ে।

কিছুক্ষণ পরে প্রসাদের যেন চমক্ ভাঙলো। দ্বিতীয় বীয়ারের বোতলটা শেষ হয়েছে। লতা তখনও জানালার কাছে দাঁড়িয়ে। প্রসাদ ঘাড় ফিরিয়ে একবার তাকালো। তার পর বকে চললো নিজের মনে, স্বর জড়িয়ে যাচ্ছে।—বেশ, বেশ! ঐখানে দাঁড়িয়ে থাক। দূরের বন্ধু দূরেতে রহ। কিন্তু তুমি বাবা পাকা খেলোয়াড়, এতগুলি ভদ্র নরনারীকে দিনে তারা দেখিয়ে দিলে বাবা। তবু থ্যাঙ্ক ইউ ভেরি মাচ্। আমার মান বাঁচিয়েছ। তোমাকে বখশিস দেব। আসছে বছর কাশ্মীর। কিন্তু······ কিন্তু তুমি আমাকে এই মাত্র অসভ্য বলেছ। ইউ ভ্রষ্টা—মুড়িওয়ালীর বাচ্চী। আমি তোমাকে জুতিয়ে··· ··· ।

টেবিলটা একটা ঠেলা মেরে উল্টে দিয়ে সরোষে দাঁত ঘসে প্রসাদ একটা হুমকি দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

লতা এইবার মুখ ফিরিয়ে দেখলো। কিন্তু কোন চাঞ্চল্য দেখা গেল না। শান্ত ও সহজ অথচ দৃঢ় স্বরে বললো।—হঠাৎ এত মেজাজ জেগে উঠলো কেন? বসো বলছি।

এগিয়ে এসে আলমারী থেকে আর একটা বীয়ার বার করে গ্লাস ভর্ত্তি করে প্রসাদের সামনে ধরলো লতা। প্রসাদ ঢক ঢক করে খেয়ে চোখ বুঁজে অলসভাবে হাত বাড়ালো সিগারেটের জন্য।

প্রসাদের মেজাজ কুলকাঠের আগুনের মত তবু যেন থেকে থেকে সশব্দে ছিটকে পড়ছিল। লতা খুব ভাল করেই এ-রোগের ওষুধ জানে। এখনি প্রসাদের কোলের ওপর পা দুটো চড়িয়ে দিয়ে যদি একটু ফষ্টি করা যায়—দুটো ছড়া গেয়ে ওঠে, ঐ মেজাজের আগুন ঠাণ্ডা ছাই হয়ে উড়ে যেতে কতক্ষণ?

প্রসাদ লতার মুখের দিকে তাকিয়ে, বড় বড় চোখ করে, একটা দৃপ্ত ভঙ্গী এনে বললো—যেমন রেখেছি তেমনি থাকবে!

লতা—বলেছি তো, তাই থাকবো।

প্রসাদ —তবে এত পোজ করছো কেন ? তুমি তো বাঁধা মেয়েমানুষ মাত্র।

লতা —তা তো জানিই।

প্রসাদ —তুমি আভাব চাকরাণী হবারও যোগ্য নও।

হঠাৎ আগুনের ঝাপটা লেগে যেন লতা ছটফট করে উঠলো। এতক্ষণ প্রসাদের এই বকাবকিকে নেশাড়ি মানুষের মূঢ়তা মনে করেই চুপ করেছিল। কিন্তু এই কথাগুলির ভেতর দিয়ে একটা অতি সূক্ষ্ম সত্যের ইঙ্গিত যেন ঝিলিক দিয়ে গেল। প্রসাদের কাছে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারের হাতলটা ধরে তার মুখের ওপর কঠোরভাবে তাকিয়ে রইল লতা। কিন্তু লতার ক্ষোভ শুধু ফণা তুলে দাঁড়াল মাত্র। ছোবল আর পড়লো না। লতা সরে এসে আস্তে আস্তে পাশের ঘরে গিয়ে খিল এঁটে দিল। শুধু বলল—তোমার কাছে বাঁধা থাকতে আমার কোন গরজ নেই। আমি কালই ফিরে যাব তারকেশ্বরে।

অনেক রাত্রে একটানা স্তব্ধতার পর লতার ঘরের কড়া বেজে উঠলো আবার। নেশা কেটে যাবার পর প্রসাদের মনের অবসাদের মধ্যে সেই ভালমানুষী ভীরুতা যেন সতর্ক হয়ে উঠলো। লতাকে সে ভাল করেই চেনে। এসব মানুষকে চটিয়ে লাভ নেই। জীবনের চোরাঘরে ওরা পাপের সঙ্গে চুক্তি করে চলে। বাইরের আঙিনা, যেখানে আত্মীয়তার মেলা, সেটা ওদের কাছে বিদেশের মত দুর্বোধ্য। তার মর্য্যাদা দেবার মত কোন দরদ ওদের নেই। লোকসমাজে প্রসাদের মান মর্য্যাদার জন্য কতটুকু মাথাব্যথা লতার ? কাল সকালেই যাবার আগে হয়তো বরাকর কলোনীর প্রতিটি প্রাণীকে জানিয়ে দিয়ে যাবে নিজের পরিচয়, আর সেই সঙ্গে প্রসাদের এত যত্নে গড়া সুনামের সামাজিক স্বাক্ষরে কালি ঢেলে দিয়ে যাবে।

প্রসাদ বাইরে দাঁড়িয়ে মিনতি করে বললো —লতা বল তুমি রাগ করনি, তবে আমি ঘুমোতে যাব। তুমি আমাকে ছেড়ে যেতে পারবে না। বল তা না হলে আমি এখান থেকে নড়বো না।

প্রসাদ বারবার কড়া নাড়তে লাগলো। ঘরের ভেতর থেকে লতার শান্ত কণ্ঠস্বরের জবাব এল —না, আমি যাব না। তুমি খেয়ে নিয়ে শুয়ে পড়।

—চাচিজী !

বারান্দা থেকে ডাকছে বিক্রম। সুবেদার বাবুর ছোট ছেলেটা। মেজের ওপর বিক্রমের লাট্টু মাঝে মাঝে খর্ খর্ করে চক্কর দিচ্ছে শোনা যায়। ঘুম ভাঙতে প্রসাদ বুঝলো ভোর হয়ে গেছে।

কদিন থেকে রোজ প্রত্যুষ্যে ছেলেটা আসে। লতার সঙ্গে চা পাউরুটী খায়।

তারপর কিছুক্ষণ পেঁপে গাছটার নীচে মাটি দিয়ে কেল্লা তৈরী করে, পেঁপে ডাঁটার তোপ দিয়েই শেষে উড়িয়ে দিয়ে বাড়ী চলে যায়।

গত রাত্রির ঘটনাগুলি ভাঙা স্বপ্নের মত আবার চেতনায় জোড়া লেগে সমস্ত ইতিহাসটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে প্রসাদ বুঝতে পারছিল, পাশের ঘরে লতা জেগে উঠেছে, কাপড়চোপড় ছাড়ছে। এইবার বাইরের ঘরের খিল খুলছে লতা। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। লতা বলছে—এস বিক্রম।

বিক্রম যেন অনুযোগ করে বললো—কিত্‌না নিঁদ যাতে হো চাচিজী!

প্রসাদ শুয়ে শুয়ে সবই অনুমান করে নিতে পারছিল। মহাবীর চাকরটাও বোধ-হয় এসে গেছে। ঝাড়ু দেবার শব্দ শোনা যায়। তারপর? তারপর মহাবীর চা নিয়ে আসবে। বিছানা ছেড়ে উঠতে হবে। তারপর আরও দেখতে হবে—লতা সুগৃহিণীর মত সারা দুপুর মহাবীরের কাজ তদারক করছে। ভাঁড়ার খুলে হিসেব করে ঘি-ময়দা বার করছে। তারপর খাওয়া। লতা তখন স্নান সেরে মহাবীরের সঙ্গে ধর্ম্মশালার মন্দিরে প্রসাদ আনতে যাবে। এক কৃত্রিম সংসারের শিবিরে, সমস্ত দিন ধরে এই নিয়মিত কর্ত্তব্যের সাধনা। প্রেরণা নেই, তবু যেন নিজের দমেই চলে। প্রসাদের মন যেন ক্লিষ্ট যাত্রীর মত এই খাপছাড়া মুহূর্তগুলির চাকার ওপর দিয়ে ধৈর্য্য ধরে গড়িয়ে চলে যতক্ষণ না সন্ধ্যে হয়, গন্তব্যে এসে পৌঁছে। তখনি শুধু লতাকে কাছে পাওয়া যায় আর চিনতে পারা যায়। তার আগে, এতক্ষণ সে বাংলো বাড়ীর হাওয়া থেকে উপে যায়।

বিক্রম যায়, যেতে না যেতে হয়তো লালাবাবুর স্ত্রী এসে বিশ্বসংসারের কাহিনী নিয়ে বসেন। লালাবাবুর জামাইটির চাকরী নেই—মেয়েটি দুঃখে আছে। কাহিনী শুনে লতার মন ম্লান হয়ে যায়। মনে হয়, দুঃখটা যেন ওরই সবচেয়ে বেশী।

সমস্ত ঘটনাগুলিই প্রসাদের কাছে আজ কেমন গর্হিত মনে হয়। এত বড় একটা ফাঁকি সত্যের সাজ সেজে থাকবে—আলো অন্ধকারের তফাৎটুকুও যে মিথ্যে হয়ে ওঠে।

রাখালবাবুর বেয়ারা একটা চিঠি নিয়ে এল—প্রসাদবাবু লতাকে আজ বিকেলে একবার পাঠিয়ে দিও। আজ রাত্রে এখানেই দুটো ডালভাত খেয়ে ফিরবে। ইতি—মেশোমশায়।

আজকের সকালে লতার মনটা কেমন অস্বস্তিতে ভরে আছে। মাঝে মাঝে অকারণে ভয় করছে, কিসের জন্য এবং কেন, লতা ঠিক বুঝে উঠতে পারছে না। এ রকম কোনদিন হয়নি। নইলে তাকে গালাগালি দিয়ে সেরে যাবে, এমন কোন

জমিদারের বেটা আজও সে দেখেনি। কিন্তু নিজের মনের দিকেই চেয়ে সে আশ্চর্য্য হলো, কালকের রাত্রির ঘটনা নিয়ে বিতণ্ডা করার মত উৎসাহ যেন সেখানে আর নেই।

লতার বুঝতে দেরী হলো না—এটা ভয় নয়, দুর্ব্বলতা। কিন্তু দুর্ব্বলতাই বা কেন?

এই এলোমেলো ভাবনার মধ্যেই লতার মন ধীরে ধীরে আবার হিংস্র হয়ে ওঠে। তাড়িয়ে দেবে? দিক্ না, তাতে ক্ষতি কি? সেই মাড়োয়ারী বেণিয়াটা এখনও আছে, তু করে ডাকলেই চলে আসবে। কিন্তু যাবার আগে এই ভালমানুষের ছেলেকে এমন শিক্ষা দিয়ে যেতে হবে, জীবনে আর বেশ্যার সঙ্গে বেয়াদবী করার দুঃসাহস হবে না।

—লতা!

প্রসাদের ডাক শুনে লতার বুকটা তবু আশঙ্কায় ছমছম করে উঠলো।

প্রসাদ এগিয়ে এল। লতা মাথা নিচু করে মসলা বেছে চললো।

—রাখালবাবুর বাড়ীতে তোমার নেমন্তন্ন। যাবে?

চোখ তুলে তাকালো লতা। আশঙ্কার ঝপসা পর্দ্দাটা সরে গেল। বললো—যাব।

—যাও, কিন্তু কোন বেয়াড়াপনা যেন টের না পায়।

নাটকের সীন পাল্টে গেছে। নতুন দৃশ্যের আরম্ভ—এ যেমন অদ্ভুত তেমনি জটিল। শুধু লতা নয়, প্রসাদও তার সংগুপ্ত জীবনের পরিধি অতিক্রম করে বহু মানুষের মেলামেশার প্রাঙ্গনে এসে দাঁড়িয়েছে। সন্ধ্যেগুলি প্রসাদের বেশীর ভাগ আভাদের বাড়ীতে কেটে যায়। লতা যায় রাখালবাবু, তারকবাবু ও হরিশবাবুর বাড়ী। তাছাড়া সুবেদার ও লালাজীর বাড়ীও আছে, শুধু আজ পর্যন্ত আভাদের বাড়ী লতার যাওয়া হয়ে ওঠেনি। বার বার দু'বার নেমন্তন্ন এসেছে—কিন্তু দুদিনই হঠাৎ কেন জানি লতার শরীর অসুস্থ হয়ে পড়ে। একদিন জ্বর আর একদিন মাথাধরা।

প্রসাদ খুব খুসী হয়ে বললো—সত্যিই তোমার বাহাদুরী বলতে হবে। যেখানে যাই, সবারই মুখে তোমার প্রশংসা আর ধরে না দেখছি। কি চালই চেলেছ লতা।

উত্তরে লতা চুপ করে দাঁড়িয়ে হাসতে থাকে।

প্রসাদ আবার বললো—দেখো যেন বেশী বাড়িয়ে তুলো না।

লতা—বাড়িয়ে তুললে, তোমারই মান বাড়বে।

প্রসাদ হেসে ফেললো—সত্যিই কি যে কাণ্ড হচ্ছে! এক এক সময় যা ভয় করে আমার! যদি একবার ধরা পড়ে যাও লতা, কি ব্যাপার হবে বলো তো?

লতা—আমার আর কি ছাই খোয়া যাবে? বনের পাখি বনে ফিরে যাবো, বাস্।

প্রসাদ হঠাৎ বিমর্ষ হয়ে পড়লো। অন্যমনস্কের মত বলতে বলতে চলে গেল—হ্যাঁ, তোমার কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু……

আভা আরও দু'তিন দিন প্রসাদের বাড়ীতে বেড়াতে এসেছিল। কথা বলেছে লতার সঙ্গে, কিন্তু প্রথম দিনের সেই সহজ স্বচ্ছতা তার মধ্যে ছিল না। পরিচয় যত পুরনো হয়েছে—ব্যবধান বেড়ে গেছে তত। লতাও ঠিক সহজভাবে মিশতে পারেনি। কথা বলেছে লতা, কিন্তু তাল কেটে গেছে বারবার। চা এনে আভার সামনে ধরেছে—আভা আপত্তি করলেও সাধাসাধি করতে পারেনি লতা। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গেছে।

প্রসাদ আর লতা। যখন এরা দুজন শুধু থাকে, তখনই এদের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। কথাবার্ত্তা বিরল থেকে বিরলতর হয়ে এসেছে। লতা বেরিয়ে এসে দেখে—প্রসাদ তখন ফেরেনি। প্রসাদ বাইরে থেকে মাঝে মাঝে ফিরে এসে দেখে—লতা ঘুমিয়ে পড়েছে, তার ঘরের দরজা বন্ধ।

ভদ্রলোকদের বাড়ীতে মেয়েদের গল্পের আসরে লতার প্রসঙ্গ এক একবার ওঠে। মাসীমা বলেন—মেয়েটা বড় শান্ত।

তারকবাবুর মেয়েরা—নিভা প্রভা ও মমতা একসঙ্গে সায় দিয়ে বলে—লতাবৌদি বেচারা সত্যি ভালমানুষ। আভা মিছামিছি ওর নিন্দে করে।

মাসীমা আভা কি বলেছে?

মমতা—লতাবৌদি নাকি লেখাপড়া জানে না। একেবারে গেঁয়ো, গাঁয়ের মেয়ে।

মাসীমা চটে উঠলেন—আভা নিজেকে কি মনে করে? ভয়ঙ্কর বিদুষী? মর ছুঁড়ি, বিয়ের ছ'মাস না যেতে স্বামী হারিয়েছিস—বিদ্যে নিয়ে ধেই ধেই করছিস। লজ্জাও করে না।

নিভা প্রভা হেসে উঠলো। আভার ওপর মাসীমার আক্রমণের একটা অর্থ হতে পারে—মাসীমাও গাঁয়ের মেয়ে।

লালাজীর স্ত্রী এসেছেন। লতা তার সঙ্গে বসে গল্প করছে। আর বাইরের ঘরে গল্প করছে আভা প্রসাদের সঙ্গে।

প্রসাদ বেশ জোরে জোরে যেসব কথা বলে, শুনে আভার মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে যায়। ঘন ঘন দরজার দিকে তাকায়। ভুরু কুঁচকে ভর্ৎসনার সুরে বলে—আপনার কোন ভয়ডর নেই প্রসাদবাবু।

একটু পরেই বোঝা গেল, আভা ও প্রসাদ বেড়াতে বার হয়ে যাচ্ছে। লালাজীর স্ত্রী বোকার মত লতার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন—ও ছোক্‌রি কে লতা?

ওর চালচলন ভাল মনে হচ্ছে না। তুমি একটু কড়া হও লতা।

লতা বললো—আমি ঠিক থাকলে সব ঠিক থাকবে, আমার স্বামীও ঠিক থাকবে। কেউ কেড়ে নিতে পারবে না।

লালাজীর স্ত্রী যেন অনিচ্ছাসত্ত্বেও বললেন -তা বটে।

কিন্তু লতার নিজের কথার প্রতিধ্বনি তার অন্তরের ভেতর প্রচণ্ড বিদ্রূপের মত বেজে উঠলো! হাসছিল লতা।

প্রভার স্বামী এসেছে—প্রভাকে নিয়ে যেতে। তারকবাবুর বাড়ীতে তাই আজ লতা ও প্রসাদের নিমন্ত্রণ ছিল। সব মেয়েদের মত লতাও জামাইয়ের সঙ্গে গান গল্প ও ঠাট্টা নিয়ে আড্ডা জমিয়ে বসলো। বিদায় নেবার সময় প্রসাদ দেখলো, প্রভার স্বামী লতাকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করছে। প্রসাদের সারা মনটা একটা অপঘাতে যেন ছিঁড়ে পড়লো।

পথে আসতে লতাকে গম্ভীরভাবে প্রসাদ বললো—সত্যিই বড় বাড়াবাড়ি হচ্ছে।

লতা উত্তর দিল না।

প্রসাদ বললো—এই পাপ আমার লাগছে। তোমার কিছু হবে না।

প্রসাদের কথায় বিশ্বাস করতে পারলে খুসী হতে পারতো লতা। সব পাপ প্রসাদের জীবনের অভিশাপ বড় করে তুলুক, লতা তাহলে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়। কিন্তু এতটা সৌভাগ্য বিশ্বাস হচ্ছিল না লতার। তাই লতার বুকের ভেতরটা সংশয়ে শিউরে উঠছিল। এই প্রথম নিজেকে অপরাধি ও অশুচি মনে করলো লতা। প্রসাদের অনুমান সত্য হলে আশ্বস্ত হওয়া যেত। কিন্তু সত্যিই কি তাই? নিরীহ নির্দোষ মানুষের হৃদয়ের প্রীতিকে এত বড় ফাঁকি দেওয়া পাপ বৈকি। সে পাপের ভাগী কি সে নিজেও নয়? কিন্তু কোন্ স্বার্থের খাতিরে? প্রসাদের মানের জন্য?

লতা মনে মনে নিজেকে ধিক্কার দিয়েও হেসে ওঠে। আরও বেশী করে হাসি পায় প্রসাদের ভাগ্যবিপাক দেখে।

ঘরে ফিরে প্রসাদ আবার কথা পাড়লো। কথার খাপছাড়া ভঙ্গিতে বোঝা যায়, অনেক কিছু সে বলতে চায়; কিন্তু বলতে পারছে না, সে সাহস তার নেই।

প্রসাদ বললো—আজকাল দেখছি ঘরের ভেতরেও বড় শুদ্ধাচার চালিয়েছ। এখানে তো তোমায় কেউ দেখতে আসছে না। তবে এখানেও কনে বউটি সেজে থাক কেন?

লতা—কই, তুমি তো আজকাল কাছে ডাক না।

প্রসাদ—আমি না ডাকলে তোমার তাতে কি আসে যায়? প্রয়োজন থাকলেই ডাকবো। কিন্তু তুমি সিগারেট ছেড়ে দিলে কেন? তুমি যেমন ছিলে তেমনি থাকবে।

তোমার এত কষ্ট করার প্রয়োজন নেই।

লতা—তোমাকেও কোন উপদেশ দিতে হবে না। যেমন ইচ্ছে তেমনি থাকবো।

লতার এই উদ্ধত উক্তি প্রসাদকে অপমান করল ঠিকই কিন্তু তার বিভ্রান্ত ও অসহায় চিত্তের অলিগলি ঢুঁড়ে সে এমন কোন মুক্ত আশ্রয় পেল না, যেখানে এসে লতাকে উপেক্ষা করা যায়। তার সম্ভ্রমভীরু মনুষ্যত্বের চাবিকাঠিটুকু যেন লতা হাত করে ফেলেছে।

লতা সত্যিই বেপরোয়া হয়ে গেছে। আভার কথা মনে পড়লে হেসে ফেলে। তার একটা মেকি আধুলি চুরি করে আভার যদি কিছু লাভ হয়, হোক। তার কিছুই হারাচ্ছে না। কেউ তার কিছু কেড়ে নিতে পারবে না। এমন কি প্রসাদেরও সে ক্ষমতা নেই। লতার নামের দাবী সবাকার স্বীকৃতির জোরে সব ছাপিয়ে গেছে।

এমনি করেই যায় যদি দিন যাক্ না। বাহির যার এত বিচিত্র, অন্তর শূন্য থাকলে ক্ষতি কি? লতার দিনগুলি এই আশ্বাসে ভরে উঠেছিল। চোরাবালির ওপর কত বড় দালান তোলা যায়, প্রসাদ ও লতার সংসার তার প্রমাণ।

আভার জ্বরের খবর শুনে প্রসাদ সেই যে সকালবেলা বার হয়েছিল, ফিরে এল এই সন্ধ্যায়। আভার জ্বরের সঙ্গে হিষ্টিরিয়ার মত আর একটা উপসর্গ দেখা দিয়েছে—শুধু অকারণ কান্না। রণজিৎ বলেছে, আভার জ্বর আগেও হয়েছে, কিন্তু এসব উপসর্গ কখনও ছিল না।

লতা সবেমাত্র বেরিয়ে ফিরেছে। প্রসাদ ঘরের ভেতর একা ঘুরে বেড়াতে লাগলো। চারিদিক থেকে একটা বিকৃত বিভীষিকা তাকে যেন চেপে ধরেছে।

অনেকদিন পরে প্রসাদ কথা বললো—তুমি বড় বেশী বাড়াবাড়ি করছো। আভার নামে নিন্দে রটাবার সাহস পেলে কোথায়?

লতা—নিন্দে? আমি আভার নামে কোথাও কিছু বলিনি।

প্রসাদ—সেটাও একরকমের নিন্দে ও অপমান করাই হলো।

প্রসাদের কথাগুলির মধ্যে উত্তেজনা ছিল না, মেজাজও আগের মত দপ করে জ্বলে ওঠে না। বিচারকের রায়ের মত অবিচল সিদ্ধান্তে তীক্ষ্ণ ও শান্ত।

লতা—বল, কি করবো?

প্রসাদ—না, তোমাকে দিয়ে আর বেশী নাটুকে খেলা করাতে চাই না। অনেক করেছ, বেশ ভালভাবেই করেছ। কিন্তু তোমার দিক থেকেই ভেবে দেখ—চিরকালই তো এমনিভাবে চলতে পারে না; তাতে তোমারই বা কি লাভ?

প্রসাদ আরও প্রস্তুত হয়ে নিল। তারপর, আজ যদি ঘুণাক্ষরেও কেউ টের পায়,

তুমি কি বস্তু? তাহলে আমি কোথায় থাকি? তুমি আমার মানমর্য্যাদার চাবিকাঠি আগলে বসে থাকবে, তা হয় না। তোমাকে ভয় করে চলতে হবে—তোমার মেজাজ মরজির দিকে সব সময় সশঙ্কভাবে চেয়ে থাকতে হবে তা হয় না।

লতা টেবিল ল্যাম্পটার দিকে তেমনি একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে তাকিয়েছিল। কথা বলতে সেও জানে—কিন্তু এই অভিযোগ খণ্ডন করার মত যুক্তি তার নেই—তার সে শিক্ষাদীক্ষা নেই। সে প্রয়োজনও কখনো হয়নি।

প্রসাদ বললো তোমার চলে যাওয়া উচিত।

লতার শরীর পাথরের মূর্তির মত তেমনি স্তব্ধ হয়ে রইল।

—তোমার যা পাওনা হয়েছে, সব মিটিয়ে দিচ্ছি, আরও কিছু দেব।

লতা অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। আস্তে আস্তে বললো—কিন্তু তারপর আমার চলবে কি করে?

প্রসাদ এইবার মেজাজ হারালো। সেটাও কি আমার ভাবনা? ভুলে গেছ, এখানে এসে প্রথম দিন তোমায় রাঁধতে হয়েছিল বলে কি কাণ্ড করেছিলে? বাক্সপেটরা নিয়ে ষ্টেশন পর্যন্ত চলে গিয়েছিলে। কত সাধতে হয়েছিল মনে আছে—তোমার মত একটা…

প্রসাদের কথার মধ্যে এক তিল মিথ্যা নেই। প্রতিবাদের কোন অবকাশ নেই। নিছক নিরেট সব সত্য কথা। কাহিনী নয়—ঘটনায় গড়া ইতিহাস।

প্রসাদ তখুনি আবার শান্ত হয়ে এল।—তুমি যেজন্য এসেছিলে, সে প্রয়োজন আমার আর নেই। সে রুচি আমার আর নেই। তুমি এখানে মিছামিছি পড়ে আছ। প্রসাদের গলার স্বর আরও নরম হয়ে এল।—সত্যিই আমি এভাবে টিকঁতে পারছি না লতা। তোমার বোঝা উচিত।

এক পীড়িত মানুষের কাতরোক্তির মত, নিঃসহায়ের আবেদনের মত শোনালো কথাগুলি।

লতা বললো—সত্যি বলছো, আমায় যেতে হবে?

প্রসাদ—হাঁ। শুধু ভাবছি, কার সঙ্গে যাবে।

লতা উঠে দাঁড়ালো। প্রায় চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললো—তার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি একাই যাব। কেউ জিজ্ঞেসা করলে বলে দিও কিছু—মামা-কাকা কেউ এসে নিয়ে গেছে। কাল ভোরেই যাচ্ছি।

লতা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

মাত্র আজ রাত্রিটা। জেগে থাকলেও কেটে যাবে, ঘুমিয়ে পড়লেও কাটবে।

তবু খুব ভোরেই উঠতে হবে—বিক্রম আসবার আগেই। কিন্তু প্রতিশোধ নিয়ে যেতে হবে!

লতা ভেতরের বারান্দায় অন্ধকারে মেজের ওপর নিঝুম হয়ে বসেছিল। উঠোনে তখনো থালায় সাজানো ডালের বড়িগুলি হিমে ভিজ্‌ছে—আচারের বয়ম দুটো রয়েছে। এখনো উঠিয়ে রাখা হয়নি—আর প্রয়োজন নেই।

লতা একবার নিজের মনে হেসে ফেললো। ভদ্রলোক ভয় পেয়েছে। যদি কেউ টের পেয়ে যায়, এই ভয়। আজ যদি মাসীমা বুঝতে পারেন, তারকবাবু হরিশবাবু শুনতে পান যে, আমি লতা নই, আমি তারকেশ্বরের পক্ষীবিবি? আমিই যদি ফাঁস করে দিই? কিন্তু তা কি করে হয়? সে যে অসম্ভব! ওভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। বহুজনের স্মরণে ও সমাদরে তার এই ছদ্মনামের শঙ্খ বাজতে থাকুক চিরকাল।

আহা! বুড়ো মানুষ রাখালবাবু—মেসোমশাই। ঠাকুর দেবতার মত শুদ্ধ। মাথা ছুঁয়ে কতবার আশীর্বাদ করেছেন! সব পাপ আমার লাগুক্! মেসোমশাই চিরদিন এমনি সুখী থাকুন, মাসীমার বেরিবেরি সেরে যাক্।

এক বছর দু বছর পরে, এ বাড়ীর ভবিষ্যতে এই রকম একটি রাত্রি লুকানো আছে। তখন হয়তো লোকে শুধু জানবে—লতা মরে গেছে। বিধবা আভার মাথায় নতুন করে সিঁদুরের দাগ পড়বে—এই বাড়ির ঘরে ঘরে ওর সংসারপণার চুড়ি-শাঁখা বাজবে ঠুং ঠুং মিষ্টি শব্দ করে।

উনি কি করছেন? লতার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো। দাঁতে দাঁত ঘসে গেল। ঘরে এখনো আলো জ্বলছে। বোধ হয় বই পড়ছেন। মতি গতি ফিরে গেছে? একবার যাচিয়ে দেখলে হয়। রেশমী পায়জামাটা পরে, বেণী দুলিয়ে, চোখে সুর্মা লেপে, এক পাত্র হুইস্কি নিয়ে যদি কোলের ওপর গিয়ে চড়ে বসি, চরিত্রবানের মুরোদটা দেখি একবার।

কিন্তু তা করতে পারলেও যে ভাল ছিল। এভাবে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। লোকটাকে কুষ্ঠরোগীর মত অস্পৃশ্য মনে হচ্ছে আজ। জীবনে কোন লুচ্চাকে ছোঁবার আগে এত ঘৃণা হয়নি কখনো। কড়া করে এক পেয়ালা মদ গিলে নিলে বোধ হয় এ ঘেন্না ভেঙে যাবে। কিন্তু মদ? মনে হতেই বুকটা দুর্‌ দুর্‌ করে উঠলো লতার।

তার সব সামর্থ্য যেন খসে পড়ে গেছে, সব দিক দিয়ে অসহায় হয়ে গেছে। চোখ দুটো আঁচল দিয়ে মুছে নিল লতা। যাত্রাগানের পালায় রাণীগুলো বনবাসে যাবার আগে বোধ হয় এই রকম কাঁদে।

নিস্তব্ধ রাত্রির শূন্যতার মধ্যে একটি প্রতিশোধের মুহূর্তকে শুধু মনে মনে জপছিল লতা। উঁচুদরের প্রেমে রঙীন ঐ ভদ্র রক্তবীজের পাপমুক্ত পৌরুষের ওপর শেষবারের মত পক্ষীবিবির ভাষায় থুতু ছিটিয়ে দিয়ে চলে যেতে হবে! ভদ্রয়ানার শিকলে বাঁধা জমিদার প্রসাদ রায় শুধু অপমানের যন্ত্রনায় ছটপট করবে, সহ্য করবে আর নীরবে তাকিয়ে থাকবে। একটু জোরে চেঁচিয়ে প্রতিবাদ করার সাহস পর্যন্ত হবে না। বাইরের মান বাঁচাতে গিয়ে বেশ্যার গালি চুপ ক'রে সহ্য করতে হবে। এইটুকু প্রতিশোধের তৃপ্তি নিয়ে চলে যাবে লতা।

ঘরের ভেতর হঠাৎ পড়া বন্ধ করে প্রসাদ চিন্তিত হয়ে পড়লো।

আহত সাপ পালিয়ে গেলেও কোন না কোন দিন ফিরে এসে কামড়ায়। প্রসাদের মন হঠাৎ এই ধরণের একটা শঙ্কায় ভরে ওঠলো। রাগানো উচিত নয়, বরং বেশি খুশি করে ভুলিয়ে ভালিয়ে বিদায় দেওয়া উচিত।

একতাড়া নোট ড্রয়ার থেকে বার করে, প্রসাদ লতার কাছে আলো হাতে নিয়ে এসে দাঁড়ালো।

—এই নাও। আমার ওপর মনে মনে রাগ পুষে রাখলে না তো লতা? আমি তো তোমাকে কখনো ঠকাইনি—ক্ষতি করিনি।

লতা শুধু হাত পেতে নোটগুলি নিল। প্রসাদ আবার বললো—কি চুপ করে রইলে যে!

আলোর ধাঁধাঁনি থেকে দৃষ্টিটাকে আড়াল করার জন্যেই বোধ হয় হেঁটমুখ হয়ে মাথার ওপর কাপড়টা বড় করে টেনে দিয়ে লতা বললো—না, তুমি ক্ষতি করবে কেন, আভাঠাকুরঝি আমার এ সর্বনাশটা করলে।

কাঞ্চনসংসর্গাৎ

অটলনাথ চৌধুরীর জীবনী লিখবে কান্তিকুমার !

রামগড়ের যাদের বয়স আজ ত্রিশ বছরের কম নয়, তারা প্রত্যেকেই অটলবাবুর সাবেকী চেহারাটা স্মরণ করতে পারে। বাঙালীর মতই ধুতি আর কোট পরতেন, কিন্তু মাথায় ছিল প্রকাণ্ড একটা পাগড়ী আর বগলে একটা তালিমারা ছাতা। মাসের পঁচিশটা দিন কেটে যেত কোন জংলী পরগণার ডিহিতে—কোন মাহাতোর বাড়িতে খড়ের মাচানের ওপরে শুয়ে—ছাতু খেয়ে। দু'পয়সা কমিশনের লোভে গিরমিটিয়া কুলি রিক্রুট করে ফিরতেন অটলবাবু। শেষে বাড়ী আসাই প্রায় ছেড়ে দিলেন।

আটলবাবুর স্ত্রী মণিমালা বলেছিলেন—ছেড়ে দাও এ কাজ। দিন একরকম চলেই যাচ্ছে। ঘরে থেকে যদি পার, কিছু রোজগার কর; না পার দুঃখ নেই—আমি একরকম করে চালিয়ে নেবই।

অটলবাবু বলতেন—মানুষের পিঁজরা পোল নেই মণি। বুড়ো বয়সে যাতে উপোষ করে না মরতে হয়, সেই ভাবনাই ভাবছি। কুকুর বেড়ালেরও একরকম চলেই যায়। চলে যাওয়াটা কোন কথা নয়; কথা হচ্ছে ভবিষ্যৎ। ভবিষ্যতের জন্য কিছু জমাতেই হবে।

গোঁসাইপাড়ার শেষপ্রান্তে দুটি ছোট ছোট মেয়ে নিয়ে চার টাকা ভাড়ার একটা মেটে বাড়িতে মণিমালা থাকতেন। মেয়ে স্কুলে হিন্দি দিদিমণির কাজটা পেয়েছিলেন, তাই পনরটা টাকা মাসে মাসে আসতো। নিজের হাতে মাটি কুপিয়ে উঠোনে লাউ কুমড়ো ফলাতেন মণিমালা। সব্জীওয়ালা ডেকে দরদস্তুর করে নিজেই বেচতেন। তাঁর হাতের কাঁটা কুরুশ কখনো থামতো না। রান্নাঘরেই হোক বা বিছানায় বসেই হোক, মাঝরাত্রি পর্যন্ত ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে লেস বুনতেন। পুজোর সময় নতুন পোষাক তৈরীর মরসুম লাগতো ঘরে ঘরে—মণিমালার এই পরিশ্রমের পণ্য বিকিয়ে যেত সবই।

এইভাবেই বছরের পর বছর পার হলো। জনা ও প্রীতি—দুটি মেয়েই বড় হলো। দুজনেরই বিয়ে দিলেন মণিমালা। গরীব গেরস্থ ঘরের দুটি ভাল ছেলেকেই পাত্র পেয়েছিলেন। বিয়ের খরচ যোগাতে দেনা করতে হয়েছিল। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, নিত্য অনটনের পূর্ণগ্রাস থেকে যেন একটু একটু করে চাদির কণিকা বাঁচিয়ে সেই দেনাও তিনি শোধ করে দিলেন। তিনি কারও ধার ধারেননি।

মেয়েদের বিয়ের সময় অটলবাবু তবু দুটো দিন উঁকি দিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু মণিমালার অসুখের খবর পেয়েও সহসা চলে আসতে পারলেন না। রোগটাও খারাপ ছিল। ডাক্তারেরা বললেন—হয় এনিমিয়া, নয় টি-বি। তা'নাহলে বোধ হয় হলদে জ্বর—ভারতবর্ষের এই ফাস্ট কেস। কাজেই কিভাবে যে ট্রিটমেণ্ট হবে, কিছু বোঝা যাচ্ছে না।

মোট কথা রামগড়ের সকলেই বুঝতে পারলেন, বিশ বছরের কাজের খাঁচায় পোষা একটি ঠুনকো বাঙালী নারীর প্রাণ এইবার ভেঙে পড়ছে।

অনেক খোঁজ তল্লাসী করে অটলনাথের হদিস পাওয়া গেল। অনেক অনুরোধ করে তাঁকে বাড়ী ফেরানো হলো। প্রতিবেশী কীর্তিবাসবাবুকে এর জন্য অফিস কামাই করতে হলো চারটে দিন। তিনি এক গাঁ থেকে অন্য গায়ে শিকারী কুকুরের মত ঘুরেছেন—শুধু অটলনাথকে পাকড়াও করতে।

গোঁসাই পাড়ার প্রতিবেশীরা একটু বেশী রাগ করেছিল, মণিমালার অন্তিম অভিমান হয়তো একটু বেশী করে মনে বেজেছিল—কিন্তু ভুল হচ্ছিল সবারই জীবনে যে মানুষ অন্ততঃ হাজারটি গেরস্থকে গিরিমিটিয়া করে ছেড়েছে, সে-মানুষের মনে ঘরের ধর্ম যে কবেই মিথ্যে হয়ে গেছে তা সে নিজেই জানে না, পরের ধারণাতেও আসে না। কত ঘরের পুরুষকে ঘরছাড়া করেছে দালাল অটলনাথ—ফিজির রবার গাছের গোড়ায় পচে সার হয়ে গেচে তারা। কত ঘরের শুধু ভিটে পড়ে আছে, কত ঘরের মেয়ে জাতের বার হয়েছে। কত শিশু ভিখিরি হয়েছে। দালালির কমিশনে থলি ভরে উঠছে অটলনাথের। মণিমালা মরবেন, অটলনাথের ঘরের প্রদীপটি নিভে যাবে, এর মধ্যেও আজ বিচলিত হবার কোন আঘাত পায় না অটলনাথ।

প্রতিবেশীরা একের পর এক এসে অটলনাথকে শুনিয়ে দিয়ে গেলেন।—খুব দেখালেন মশাই! এবার যদি ভাল চান তো ওঁর সুচিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

জনা আর প্রীতি মেয়ে দুটো ঠিক এই সন্ধিক্ষণে শ্বশুরবাড়ী থেকে ছুটি নিয়ে বাড়ীতে এসে জুটলো। কান্নাকাটি ডাক্তার ডাকাডাকি, লম্বাচওড়া ওষুধের প্রেসক্রিপসন, ফুড আর ফলের ফর্দ—চারদিক থেকে একটা দাবীর ঝড় যেন ষড়যন্ত্র করে অটলনাথের টাকার থলিটা লোপাট করার জন্যে দাপাদাপি সুরু করলো।

অটলনাথকে বাঁচিয়ে দিল কান্তিকুমার। টাকার থলিটা কান্তিকুমারের কাছে সঁপে দিয়ে অটলনাথ প্রায় কেঁদে ফেললেন।—কান্তি, তুমি আমার বন্ধুর ছেলে। এ'সহরে তুমি ছাড়া আর কাউকে বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার গায়ের রক্ত-জল করা এই সামান্য পুঁজি। তোমার মণিমাসী তো ফাঁকি দিয়ে আমার আগেই চললেন। শুধু কুটোর মত আমি একাই সংসারে ভেসে রইলাম। নেহাৎ প্রাণের

দায়ে না পড়লে এই জঞ্জাল আর তোমার কাছে ফিরে চাইতে আসবো না। ওসব তোমারই হবে। তুমি এটা রেখে দাও তোমার কাছে।

মণিমালা বেশী দেরি করেননি। সপ্তাহের মধ্যেই মারা গেলেন। অটলনাথের থলিভরা ভবিষ্যৎ অটুট হয়ে কান্তিকুমারের কাছেই রইল। এই কান্তিকুমার লিখবে অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী।

রামগড়ের বাতাসে একটা গোপন খবর ফিসফিস করে—কান্তিকুমার আর জয়া, জয়া আর কান্তিকুমার।

প্রতাপবাবুর মত একটি পিতৃদেব ছাড়া আপন বলতে জয়ার আর কেউ নেই। আজ ওর বয়স সাতাশ বছর। আপন করে নেবার মত কোন নতুনজনের ডাক আজও আসেনি, জীবনে আর আসবে কি না কে জানে! দেখতে সুন্দর হলেও, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অভিমানে সেই স্তোকনম্র তারুণ্য যেন বয়সের ভারে এক কমনীয় আলস্যে আরও ভারী হয়ে ঝুঁকে পড়ছে। সময় এসে পড়লে মধুবল্লীও কাঁটাগাছ জড়িয়ে ধরে। যার সময় পার হতে চলেছে, তার কাছে কান্তিকুমার তো সোনার তরুস্থার চেয়েও বেশী। এত ভাল ছেলে কান্তিকুমার।

জয়ার বাবা প্রতাপবাবু বলতে গেলে কিছুই রোজগার করেন না, অথচ চলে যায় বেশ। কান্তিকুমার প্রতাপবাবুর কেউ নয়: দুবেলা ছেলে পড়িয়ে, আট ঘণ্টা হাজারিমলের অটোমোবিল স্টোরে কলম পিষে, কান্তিকুমার যা রোজগার করে, তার উত্তমাংশ সবই প্রতাপবাবুর সংসারে শত রকম দাবির যোগান দিতেই ফুরিয়ে যায়। কৃচ্ছ্র উপার্জনের মাত্রা এতটা টান সইতে পারে না। তাই মাঝে মাঝে ধার করতে হয় কান্তিকুমারকে। ধার শোধের সংস্থান করতে গিয়ে হয়তো তৃতীয় একটা ধুতি কেনা আপাতত স্থগিত রাখতে হয়। বর্ষার মেঘের মতই কান্তিকুমারের মনটা পরের জন্য সমবেদনায় গলে পড়ছে—নিজেকে শেষ করে দিচ্ছে।

প্রতাপবাবুর নাকি এককালে খুব ভাল অবস্থা ছিল। প্রবাদ আছে—সোনার ছিপে মাছ ধরতেন। কথাটা একেবারে মিথ্যা নয়। ছিপটা বাঁশেরই ছিল, হুইলটা ছিল সোনার তৈরী। এখন অবশ্য মাঝে মাঝে মুনসেফ আদালতের বারান্দার এক কোণে দোয়াত কলম নিয়ে বসেন। দু'-একটা দরখাস্ত লেখার কাজ পেয়ে যান। আট দশ আনা যা চলে আসে তাই লাভ।

এক একদিন ধারের ফিকিরে বার হয়ে হয়তো অনেক রাত্রে ঘরে ফেরেন প্রতাপ বাবু। জয়া জেগে বসে থাকে। খেতে বসে গম্ভীর হয়ে বলেন—কীর্ত্তিবাস আজ আমার অপমান করেছে জয়া।

জয়া—কেন ?

—কিছুই কারণ নেই। গায়ে পড়ে উপদেশ দিল, কান্তির সঙ্গে তোর বিয়ে দেবার জন্ত।

জয়া চুপ করে থাকে। কীর্ত্তিবাসবাবু উপদেশের মধ্যে অপমানের প্রমাণ খুঁজে বার করার চেষ্টা করে, মনে মনে হেসে ফেলে।

প্রতাপবাবু নিজের মনেই বলে যান—কান্তি ছেলেটির হৃদয় খুব মহৎ সন্দেহ নেই। নিজে দারুণ অভাবে থেকেও দরকারের সময় চাইতেই দু'চার টাকা ধার দিয়ে দেয়। তবে সবই তো শোধ করে দেব একদিন। তাই বলে ওর সঙ্গে প্রতাপ রায়ের মেয়ের বিয়ে! কী যে বলে! কীর্তিবাসটা একটা ষ্টুপিড।

খাওয়া শেষ হলে, হাত মুখ ধুয়ে, পান চিবিয়ে একটা ছেঁড়া কৌচের ওপর নতুন আলোয়ান গায়ে জড়িয়ে বসে থাকেন প্রতাপবাবু। সিগারেটের নতুন টিনটা খোলেন। সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে আর একটা মিঠে-পচা গন্ধ থেকে থেকে ঘরের বাতাসে ভুরভুর করে ওঠে। জয়া বুঝতে পারে, প্রতাপবাবু আজ মদ খেয়েছেন। ঐ নতুন আলোয়ান আর একটিন সিগারেট আজই কেনা হয়েছে। আজই সকালে কান্তির কাছে কুড়িটা টাকা চেয়ে নিয়ে এসেছেন প্রতাপবাবু। জয়া সব খবর রাখে।

পরের দিন জয়ার সঙ্গে কান্তির একবার দেখা হয়। প্রতাপবাবু বাড়িতে নেই। জয়া হেসে হেসে বলল—কান্তিদা তুমি শীগগির বড়লোক হও। নইলে শেষে বড় অপমানের ব্যাপার হবে।

—কেন বলতো ?

—বাবাকে তুমি এতদিন ভুল বুঝেছ, আমিও ভুল বুঝেছি। তিনি শুধু তোমার টাকা ধার নিচ্ছেন, শোধও করে দেবেন একদিন। আর কোনভাবে তোমাকে আমল দিতে বাবা রাজি নন।

হঠাৎ জয়ার চোখ ফেটে জল দেখা দেয়। তবু দায়ে পড়ে আজ ওকে শক্ত হতে হয়। অভিমানিনী নায়িকার মত চুপ করে থাকার উপায় ওর নেই। তাই জয়াকে বলতে হলো—তুমি আমাকে চারদিকের এই দুর্নামের ঘেন্না থেকে বাঁচাও কান্তিদা। তুমি নিজে বড় হও, অবস্থা ভাল করে নাও। যারা আজ তোমাকে আড়ালে বদমাস বলে গালি দিয়ে বেড়ায়, তখন তারাই তোমাকে প্রেমিক বলে বাখান করবে।

যেন কৌতুক করার জন্তই মুখে হাসি টেনে কান্তিকুমার বললো—আমার কাছে নগদ দশটি হাজার টাকা আছে, তোমার বাবা সে-খবর জানেন ?

জয়া—আমার জন্ত বলবার কেউ নেই, তাই প্রাণের দায়ে বেহায়ার মত তোমাকে

নিজের মুখে সব বলতে হচ্ছে। এর ওপর তুমি আর বৃথা ঠাট্টা অপমান করো না।

—বিশ্বাস কর জয়া। প্রীতির বাবা অটলবাবু তাঁর সব টাকা আমার কাছে জমা রেখে গেছেন। আবার চাইতে এলে ফেরত দিতে হবে।

দৃষ্টিটা আরও গভীর করে নিয়ে কান্তিকুমারের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে, দুর্মদ একটা আগ্রহে জয়া হঠাৎ অনুরোধ করে বসলো—ফেরত দিওনা কান্তিদা।

—ছিঃ ওকথা বলো না।

—পরে না হয় শোধ করে দিও, এখন টাকাটা দিয়ে একটা কারবার শুরু করে দাও কান্তিদা।

সেটাও অন্যায় হয়। কারবার যদি ফেল পড়ে, তখন পাপের ভাগী হবে কে?

—আমি হব। আমার জন্য তুমি এইটুকু সাহস কর কান্তিদা।

—থাম জয়া। সৎপথে থেকে কি টাকা রোজগার হয় না?

—সৎপথে থেকে তো শুধু দুর্নাম রোজগার করছো, আর দিন দিন রোগা হচ্ছো। অটলবাবুর মত নরপিশাচের টাকা—তুলে নিয়ে দামোদরের জলে ফেলে দিলেও পুণ্যি হবে।

—এত ঘাবড়ে গেলে কেন জয়া? আমাদের ভালবাসা ঠিক থাকলে কেউ আমাদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করতে পারবে না। ধৈর্য্য হারিও না। তোমার বাবার মন বদলাতে কতক্ষণ।

জয়ার মুখ আবার করুণ হয়ে উঠলো—তুমি আমার দুঃখ বুঝতে পারলে না কান্তিদা। বড় বেশী ভালমানুষ তুমি। ধৈর্য, সৎপথ, ভালবাসা ঠিক রাখতে হবে, বাবার মন বদলাবে—এতগুলি ছুতো মানতে গিয়েই তোমার দফা শেষ হবে, দিন ফুরিয়ে যাবে। তারপর…তারপর আর কোন কিছুর মানে হয় না।

অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে চুপ করে গেল জয়া। জয়ার মন থেকে এই অলীক দুশ্চিন্তা আর সংশয়ের স্পর্শটুকু মুছে দেবার জন্য দুটো বেশী কথা বলে সান্ত্বনা দেবার সময়ও আর ছিল না। এখনি আবার কাজে যেতে হবে। যাবার জন্য উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার।

এই কান্তিকুমার লিখবে অটলনাথের জীবনী।

অটলবাবু বললেন—কন্ট্রাক্টটা পাওয়া গেলে সেটা তোমারও একরকম পাওয়া হল কান্তি। যদি একটু খেটেখুটে দাও, তবে তোমারও কিছু লাভের পাওনা হবে নিশ্চয়ই। যে ভাবেই হোক, গুপ্ত ব্রাদার্সকে পথ থেকে সরাতে হবে, ওদের সঙ্গে রেট নিয়ে কম্পিটিশনে এঁটে ওঠা মুস্কিল! আজ কালের মধ্যে ওরা টেণ্ডার দাখিল করে দেবে। তার আগে একটা ব্যবস্থা করতেই হয় কান্তি।

বিরক্তি চাপতে গিয়ে ভ্রূকুঞ্চিত করলো কান্তিকুমার।—

লোভ দেখাবেন না অটলবাবু। আপনার সঙ্গে কারবার করে বড় মানুষ হবার কোন মোহ নেই আমার।

মুহূর্তের মধ্যে নিজের হঠকারিতার নিদারুণ ভুলটুকু বুঝতে পেরে যেন অটলবাবুর কথাগুলি অনুতাপে পুড়তে লাগলো।—সত্যি, বড় লজ্জা দিলে কান্তি। এই অধম কুলি বুড়োর ভাষাটা মাপ করো, কিছু মনে করো না। তুমি আমার বন্ধুর ছেলে, তোমার কাছে যদি একটু উপকার আশা না করি, তবে আর কার কাছে…।

প্রত্যুত্তরে কান্তিকুমারের কথাগুলি সঙ্গে সঙ্গে শীতল হয়ে পড়লো। উপকারের কথা যদি বলেন, তবে অবশ্য আমি প্রতিবাদ করতে চাই না। কিন্তু আমার এমন কী সামর্থ আছে যে …।

অটলনাথ—আছে আছে, একমাত্র তোমারই সামর্থ্য আছে কান্তি। তোমার এত চরিত্র আর বিদ্যেবুদ্ধি—যা ছোঁবে তাই সোনা হয়ে যাবে। নইলে আমার মত গবেটের কি সাধ্য আছে যে বিজিনেস্ করতে পারি? না কান্তি, আমাকে উপকারটুকু তোমায় করতেই হবে।

কান্তিকুমার চুপ করেছিল! ভদ্রলোকের ছেলে কান্তিকুমার, মনের মাটিটা তাই খুব নরম। সামান্য বর্ষাতেই ভিজে কাদা হয়ে যায়। অটলনাথের আবেদনটাও এইবার তাই ঠিক জায়গা বুঝে আঝোরে ঝরে পড়লো।—এটা আমার বুড়ো বয়সের একটা সখ, একটা ব্যামো মাত্র কান্তি—কারবার করবো। তুমি শুধু আমার সামনে দাঁড়িয়ে থেকে একটু পথ দেখিয়ে দেবে, শুধু দুটো পরামর্শ এক আবটা পলিসি, একটুখানি প্যাচ, আর একটু…।

একটা প্রসন্নতার উচ্ছ্বাস চাপতে না পেরে হেসে ফেলল কান্তিকুমার। অটলনাথ বললেন—এর জন্য তোমাকে কোন দক্ষিণা দিয়ে তুষ্ট করার দুঃসাহস আমার নেই। তবে হ্যাঁ, যদি কোন দিন তোমাকে সম্মানী হিসাবে কিছু দিতে চাই, হাত তুলে তোমাকে নিতে হবে কান্তি। জেন, সেটা আমার আশীর্বাদ, আমার দেওয়া উপহার মাত্র। যদি সর্বস্ব দিয়ে ফেলি, তা'ও তোমায় নিতে হবে। প্রত্যাখ্যান করতে পারবে না কান্তি, তুমি আমার বন্ধুর ছেলে।

কান্তিকুমার বললো—আপনি এত বিচলিত হচ্ছেন কেন?

কথাগুলির মধ্যে প্রচ্ছন্ন একটা আশ্বাসের স্নিগ্ধতা ছিল।

আশ্বাসটা সর্ব্বসংশয়ের কুহেলিকা ঘুচিয়ে প্রখর ভাবে জলে উঠলো ক'টি মাসের মধ্যেই। কণ্ট্রাক্টর অটলনাথ ছোট একটি অফিস খুলেছেন। একটি দারোয়ান আছে আর আছে কান্তিকুমার। কান্তিকুমার শুধু পাপকে ঘৃণা করে, পাপীকে ঘৃণা করে না।

উপকারের সুগ্রীব কান্তিকুমার সহায় হয়েছে অটলনাথের।

সূর্য্যপুরা থেকে চৌধুরীঘাট, নতুন সড়ক তৈরীর কণ্ট্রাক্ট। কম করে ত্রিশটি হাজার টাকা মুনফা থাকবেই।

অটলনাথ বললেন—ওয়ার্কস অফিসের হেড কেরাণীটিকে আগে বাগাতে হবে। কান্তিকুমার এক সন্ধ্যায় হেড কেরাণীকে ঘুস পৌঁছে দিয়ে এল—সাতশো টাকার নোটের একটি তাড়া।

অটলনাথ বললেন—গুপ্ত ব্রাদার্সের মেজ গুপ্তকে বিগড়ে দিতে হবে। কান্তিকুমার দুবোতল হুইস্কি নিয়ে মেজ গুপ্তকে নয়াবাজারের গলিতে একটা ঘর চিনিয়ে দিয়ে এল।

অটলনাথ হঠাৎ অফিস ঘরের জানালা দিয়ে বাইরের দিকে সভয়ে তাকিয়ে, পরমূহূর্তে পাশের ঘরে লুকিয়ে পড়েন। পাওনাদার আসছে। কান্তিকুমার নীলকণ্ঠের মত পাওনাদারের যত কটুক্তি আর অপমানের বিষ হজম করে। নিঃসঙ্কোচে বলে দেয়—অটলবাবু নেই, কলকাতা গেছেন।

এইসব দুষ্কৃতির কলুষ কান্তিকুমারকে স্পর্শ করতে পারে না। সে যেন তার বিবেককে আলগোছে সরিয়ে রাখতে পারে। কান্তিকুমার জানে, এই কারবারের অধিকর্ত্তা অটলনাথ, সে নিজে উপদেষ্টা মাত্র। অটলনাথের কারবারী অভিযানের সকল কূটকীর্তির দূত মাত্র কান্তিকুমার। শুধু দৌত্যের সম্মানীটুকুই তার প্রাপ্য এবং তাতেই সে তৃপ্ত। এর ওপর তার কোন দাবী নেই। বিবেকে বাধে।

কিন্তু অটলনাথ প্রতি মাসে কান্তিকুমারকে অতি নিয়মিতভাবে পনরটি করে টাকা সম্মান দিতে ভুল করেন না। এই সম্মানীটা কিন্তু মজুরীর চেয়ে নিয়মিত ও নির্দিষ্ট। একটা খট্‌কা লাগে মনে, কিন্তু পরমূহূর্তে কান্তিকুমারের নীতিদিগ্ধ মনের সব সংশয়ের ভার একটি যুক্তির আঘাতে লঘু হয়ে যায়—হলোই বা মজুরি। চাকরী বললেও ক্ষতি কি? যে মাঝি ডাকাতকে খেয়া পার করে দেয়, তার কী দোষ? মাঝি শুধু খাটুনির মজুরী পায়, লুটের ভাগ পায় না।

প্রতাপবাবু নামছেন, আর অটলনাথ উঠছেন। এ দুয়ের মাঝখানে শুদ্ধাচলে স্থির হয়ে আছে একটি ভদ্রলোকের এককথার মূর্ত্তি—কান্তিকুমার।

এই কান্তিকুমার লিখবে অটলনাথ বসু চৌধুরীর জীবনী।

জয়া বললো—প্রীতির বাবার কারবারে তুমি নাকি চাকরি করছো?

কান্তি—হ্যাঁ, ওখানে চাকরি করাই ভাল। যা সব কেলেঙ্কারী আরম্ভ করেছে আটলবাবু, ওর মধ্যে আমি জড়িয়ে পড়তে চাই না।

জয়া—আশ্চর্য করলে তুমি। চাকরী করলে কি জড়ানো হলো না?

—না, আমি তো কারবারের ভাগীদার নই। কাজেই পাপের ভাগীদারও হব না। তা ছাড়া, কখন্ হাতকড়া পরবার ডাক এসে যাবে কে জানে? তার ভাগীদারও আমি হতে চাই না।

—আমি যদি আজ কান্তি হতাম, তা হলে অটলনাথকে ডুবিয়ে দিয়ে কারবারটা নিজে বাগিয়ে নিতাম। আমার কাছে সেটাই একমাত্র পুণ্য কাজ মনে হতো।

জয়ার মুখের ভাব কঠোর হয়ে উঠলো। কান্তির দিকে তাকিয়ে হঠাৎ জয়ার চোখ দুটো এক অসহ ক্ষোভের জ্বালায় ফুটতে লাগলো।—আচ্ছা, অটল বুড়োকে ঠকাতে না পার, আর এক বুড়োকে পারবে?

—কাকে?

—আমার বাবাকে।

—সে কি কথা? তোমার বাবাকে ঠকাবো কেন?

—হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে চল। আমি এখানে আর থাকতে চাই না। চল, কাউকে না বলেই আমরা অন্য কোথাও চলে যাই।

মরমে মরে গিয়ে যেন কান্তিকুমার বললো—নিজেকে এত ছোট করে ফেলছে কেন জয়া? ভুল করো না। অধীর হওয়াটাই ভালবাসার প্রমাণ নয়। প্রতীক্ষার শক্তিতেই ভালবাসা বড় হয়। তুমি আমার কথাটা একবার ভেবে দেখছো না? দেখছো না, কত দুঃখ দুর্নাম পরিশ্রম বরণ করে, দিনের পর দিন শুধু তোমারই জন্য...।

—দোহাই তোমার, একবারটি তুমি পুরুষের মত আমার কাছে এস। আমাকে নিয়ে চলো। তোমার দুঃখ পরিশ্রমের সার্টিফিকেট আমি খুঁজছি না, আমি তোমাকেই খুঁজছি। আমাকে আর অপমান করো না কান্তিদা।

—একটু ধৈর্য ধর জয়া।

ঘন সীসু গাছের আড়ালে অটলনাথ বসু চৌধুরীর বাড়ীটাকে দূর থেকে কোন বাদশাহী মহল বলে মনে হয়। শুধু ফটকের থামে লেখা 'মরকতকুঞ্জ' নামটাই সে ভুল ভাঙিয়ে দেয়। আজকের কুলিরাও কত অল্পদিনের মধ্যে সেই ছাতুখেকো অটলনাথকে ভুলে গেছে, নইলে মরকত কুঞ্জকে তারা কখনই 'রাজাবাবুর বাড়ী' বলতো না। এই বৈভবের ছবি মণিমালার স্বপ্নের দুরাশায় কখনো উঁকি দেয়নি। মণিমালা ফুরিয়ে গেছেন অনেকদিন, তাঁর সঙ্গে সঙ্গে সে-সংসারের দুঃখী নটে গাছটিও কবে মুড়ে গেছে। এখন আরম্ভ হয়েছে একেবারে নতুন করে। হলঘরে গজদন্তের ফ্রেমে বাঁধানো অয়েল পেন্টিংয়ের মণিমালা নিস্পলক চোখে এই কাঞ্চন পুরীর সীমাহীন

প্রাচুর্য্যের দিকে তাকিয়ে যেন স্তম্ভিত হয়ে রয়েছেন।

লোকে কতভাবে জল্পনা-কল্পনা করেছে, কিন্তু আজও কেউ কিছু ঠাউরে উঠতে পারে না—কি করে অটলবাবু হঠাৎ এত ফেঁপে উঠলেন? কাঠুরিয়ার মাণিক কুড়িয়ে পাওয়ার গল্পকেও বিস্ময়ে ছাপিয়ে উঠেছে। শতবাহু বিস্তার করে এগিয়ে চলেছে আটলবাবুর প্রতিভা। মানসম্পদের আকাশে যতগুলি চাঁদ-সুরুজ-তারা আছে সবই যেন তিনি লুফে নেবেন। এরই মধ্যে দশটা জয়েণ্ট ষ্টক কারবারের ম্যানেজিং এজেন্সীর টুপি তাঁরই মাথায় এসে ভীড় করেছে—আরও আসছে। গালা রেশম অভ্র চা আর টিম্বার—এই পাঁচটি পণ্যের পাঁচটি রপ্তানী কারবারের ষোল আনা মালিকানা অটলবাবুকে প্রায় চাঁদসাগর করে ফেলেছে। অটলনাথ স্বয়ং একটি রাষ্ট্র—একহাজার কুলি কেরানী ও কারিগরের অন্নের আশ্রয়।

শিবাজী উৎসবে একহাজার লোকের সভায় মঞ্চে দাঁড়িয়ে নির্ভীক জনহিতৈষী অটলনাথ বক্তৃতা করতে তিলমাত্র দ্বিধা করেন না—বাণিজ্যে বসতে মুক্তি! দেশবাসীর কাছে আমার এই একমাত্র বাণী। মহারাজা শিবাজীর আদর্শকে যদি আজ সার্থক করতে চাই, তবে বাণিজ্যের গেরুয়া ঝাণ্ডা আবার তুলে ধরতে হবে। জয়তু শিবাজী!

করতালির শব্দে সভায় উল্লাস চিড়বিড় করে ফুটতে থাকে। দেশের কল্যাণের জন্য ঘুম হয় না, এই রকম দুটো খবরের কাগজে একহাত লম্বা শিরোনামা ফলিয়ে অটলনাথের ভাষণ ছাপা হয়।

কান্তিকুমার প্রত্যহ অটলবাবুর লাইব্রেরী ঘরে একবার হাজিরা দিয়ে যায়। অটলবাবুর লাইব্রেরী? কথাটা শুনতে আজ আর কারও কানে খট্‌কা লাগে না। সেদিন আর নেই। অটলবাবু ল্যাটিন ভাষায় কবিতা লিখছেন—একথা বললেও সহসা কেউ অবিশ্বাস করে ফেলতে পারবে না। ভাগ্যের ছাপ্পর ফুঁড়ে রূপোবৃষ্টি হবার আগে, জীবনের পঁয়তাল্লিশটি বছর যে মানুষ শুধু কথামালা কাকচরিত্র আর পঞ্জিকা ছাড়া কোন পুঁথির পাতা উল্টে দেখেনি, তাঁরই প্রাসাদের এক প্রশস্ত কক্ষে সারি সারি মেহগনির তাক আর মরক্কো বাঁধাই বই। একটি জ্ঞানকুসুমের ভরা মালঞ্চ—তারই মালাকর হলেন অটলনাথ।

বাইরের লোকে জানে—কান্তিকুমার হলো অটলনাথের প্রাইভেট সেক্রেটারী। অটলনাথও তাই বলেন। এটা হলো কান্তিকুমারের পোষাকী পরিচয়। ঘরে যখন কেউ থাকে না, শুধু দু'জনে মুখোমুখি বসে, তখন অটলনাথ বেশ সমীহ করে, বেশ একটু অন্তরঙ্গতার সুরে সেই আটপৌরে নাম ধরেই ডাকেন।—তা হ'লে বলতে হয় কান্তিমাষ্টার···।

এই সেক্রেটারীগিরি তথা মাষ্টারীগিরির জন্য মাসিক বিশটি টাকা দক্ষিণা পায় কান্তিকুমার।

সকাল সাড়ে ন'টা থেকে হাজারিমলের অটোমোবিল ষ্টোরে হিসেব কষে কষে সন্ধ্যে ছটার সময় যখন কান্তিকুমারের মাথার ভেতর পিষ্টনগুলি ক্ষয়ে গিয়ে ঝিমঝিম করতে থাকে, ঘাড়ের কাছে স্নায়ুর গিঁটগুলিতে স্পার্কের শক্ লাগে, বুকের ভেতর ফ্যানবেল্ট ছিঁড়ে গিয়ে দম ফুরিয়ে আসে—তখন ছুটি হয়। ঘরে ফিরে হাত মুখ ধুয়ে, দুটো রুটি চিবিয়ে এক গ্লাস জল খায়—নিস্তেজ মনুষ্যত্বের ইঞ্জিনটা তখন বোধ হয় একটু চাঙ্গা হয়ে ওঠে। তারপরেই এক অভিনব মাস্টারীর পালা—প্রায় রাত্রি দশটা পর্যন্ত।

লাইব্রেরী ঘর। টেবিলের মুখোমুখি দু'জনে বসেন। অটলনাথ বললেন—কিছু একটা পড়ে শোনাও দেখি মাস্টার।

হাত বাড়িয়ে যে বইটা পেল এবং খুলতেই যে পৃষ্ঠা দেখা দিল, গ্রামোফোনের মত সেখান থেকেই পড়া সুরু করে দিল কান্তিকুমার।—জন স্টুয়ার্ট মিল বলিয়াছেন যে স্ত্রীজাতি সর্ব্বতোভাবে পুরুষের তুল্য, অতএব…।

পড়া সামান্য অগ্রসর হয়েছে, অটলনাথ মাথা দোলাতে লাগলেন। বোঝা গেল এটা আপত্তির সঙ্কেত।—উঁহু হলো না। এ যে কিছুই বাগিয়ে বলতে পারছে না মাস্টার। গোড়াতেই ভুল করে ফেললো।

কান্তি—আজ্ঞে হ্যাঁ স্যার। এই বইটা রেখে দিই, কি বলেন?

—কী নাম বইটার?

—বিবিধ প্রবন্ধ।

—কে লিখেছে?

—বঙ্কিমচন্দ্র।

—কী আফশোষের কথা! শেষে কিনা বঙ্কিম চাটুয্যে পর্যন্ত এই সাদা কথাটা ধরতে পারলে না মাস্টার?

অটলনাথ কাঁচাপাকা রোমশ ভুরু দুটো টান করে সত্যিই আফশোষ করলেন।—না মাস্টার, অন্য একটা ধর। একটু ইতিহাস শোনাও।

কান্তিকুমার ইতিহাসের বই নিয়ে বসলো। পড়া আরম্ভের আগেই অটলনাথ অন্য প্রসঙ্গ এনে ফেললেন।—বঙ্কিম চাটুয্যে কি রকম ইয়ে জমিয়ে ছিল, কিছু খবর রাখ মাস্টার?

—বুঝলাম না স্যার।

—ক্যাশ হে ক্যাশ, যাকে বলে নগদ নারায়ণ।

—আজ্ঞে না, সে খবর ঠিক জানি না।

—এগার লক্ষ তেত্রিশ হাজারের বেশী হবে কি ?

—এত নগদ টাকা কোথায় পাবেন বঙ্কিম চাটুয্যে ?

—তাহলেই বোঝ মাস্টার! এত বিদ্যেসিদ্যে নামডাক পসার, সব বৃথা হলো নাকি ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—তুমি এখন বুঝতে পারছো, বিদ্যে জিনিসটা বই ঘেটে পাওয়া যায় না ? ভগবান যাকে পাইয়ে দেন সেই পায়। কি বল ?

—ঠিক কথা। আকবর বাদসাহ ক-খ জানতেন না, কিন্তু এদিকে···।

—ভগবানের বিশেষ অনুগ্রহ না থাকলে, ধর আমারই কথা, এতখানি বিদ্যে এমনি এমনি পেতাম কি ?

—আপনার কথায় কোন ভুল নেই স্যার।

সত্যি কথা, অটলনাথের কোথাও কোন ভুল হয়নি। গোরক্ষা সমিতি থেকে সুরু করে আদিভারত প্রত্নশালা পর্যন্ত, সর্ব ঘটে তিনি বিরাজ করছেন—কোথাও সদস্যরূপে কোথাও সচিব রূপে এবং কোথাও কোথাও প্রেসিডেন্ট ও পেট্রনরূপে। গত পয়লা বৈশাখেও সুরাপান নিবারণী সভার বার্ষিক বিতরণ তিনিই পড়েছেন, সভাপতিরূপে।

কিন্তু জয়নগরের ডিষ্টিলারিটার ডাক হবে আসছে মাসেই। বদলী হয়ে নতুন এক আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টও এসেছে। অটলনাথ বললেন—ইতিহাস পড়া এখন রেখে দাও মাস্টার। আবগারী সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে একটি জলসা দিতে হবে। বেশ গুছিয়ে একখানা অভিনন্দন লিখে ফেল দেখি।

অটলনাথের বোধ হয় ভুল হচ্ছে, অথবা অন্য কাউকে অভিনন্দন জানাতে চান। আন্দাজে বুঝে নিয়ে কান্তিকুমার তাই বললো—আবগারী সুপারকে আপনি অভিনন্দন জানাবেন কেন ?

—জয়নগর ডিষ্টিলারির ডাক হবে হে মাস্টার। এই বছরটার জন্য আমিই ডেকে নিতে চাই। এক বছরে কত প্রফিট জান ?

—কিন্তু স্যার, লোকে যে আড়ালে নিন্দে ক'রে বলবে—শেষে কিনা অটলনাথের মত জনহিতৈষী মদের ভাঁটির ঠিকে নিল ?

—আমার বদলে যদি রায় সাহেব বৃদ্ধিচাঁদ ডিষ্টিলারিটা ডেকে নেয়, তাহলেই বুঝি খুব জনমঙ্গল হবে ? বছরে ছিয়াত্তর হাজার টাকার প্রফিট অবাঙালীর হাতে গিয়ে পড়ুক, তোমরা বুঝি তাই দেখে খুসী হও ?

অটলনাথ চোখ পাকিয়ে কথাগুলি বললেন। কান্তিকুমারের আর কিছু উত্তর

দেবার মত তথ্য ছিল না। অটলনাথের বাণিজ্যসাধনার পুঞ্জ পুঞ্জ মুনাফা বাঙালীর জাতীয় রাজকোষ ফাঁপিয়ে তুলছে, চুপ করে কলমের নিব খুঁটে খুঁটে এই বিশ্বাসটা বোধ হয় খতিয়ে দেখছিল কান্তিকুমার।

ঘড়ির কাঁটার মুখে বর্ষার রাত্রি বারটার দিকে ঠেলে ওঠে। কান্তি হাই তোলে, চোখের পাতা শিথিল হয়ে আসে, পেটের নাড়ীতে ক্ষুধার ইসারা মোচড় দেয়। তবু কান খাড়া করে থাকতে হয়, অটলনাথের কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে যেন ভুল না হয়।

অটলনাথ স্মরণ করিয়ে দিলেন—কই, তুমি কথার কোন উত্তর দিচ্ছ না কেন?

কান্তি মাষ্টার যেন তার ভুল বুঝতে পেরে অনুতাপে একেবারে গলে পড়লো।—মাপ করতে আজ্ঞা হয় স্যার। আমি আপনার মত ওভাবে তলিয়ে দেখিনি। তিন বছরের জন্য ডিষ্টিলারিটা নিলে হতো না স্যার?

—আপাততঃ, হুঁ। অটলনাথ ঢেঁকুর তুলে থেমে গেলেন।

অটলনাথের মুখের চেহারা থেকে ক্ষণিকের রুষ্ট অন্ধকার আবার ফর্সা হয়ে গেল। কান্তিকুমারও নিশ্চিন্ত হয়ে ছাতাটা তুলে নিয়ে উঠলো।

অটলনাথ বললেন—আর একটা কথা আছে মাষ্টার। চিঠিপত্রে বিজ্ঞাপনে নোটিশে বা রিপোর্টে, আমার নামটা আর ওভাবে লিখবে না। এবার থেকে নামের আগে 'বাণিজ্যবীর' কথাটা বসিয়ে দেবে। শুধু, বাণিজ্যবীর অটলনাথ, বুঝলে? ভুল হয় না যেন।

—যে আজ্ঞে।

কান্তিকুমার দরজার দিকে এগিয়ে গেল। অটলনাথও উঠে দাঁড়িয়ে আর একটা কর্ত্তব্য স্মরণ করিয়ে দিলেন।—জীবনীটা এইবার লিখতে শুরু করে দাও মাষ্টার। জিনিসটা যেন ভাল হয়, তা হ'লে তোমাকেও খুসী করে দেব। মাইনের ওপর একটা এক্স্টা কিছু নিশ্চয় দেব!

ক'দিন থেকে জয়ার জ্বর হয়েছে। প্রতাপবাবু দিনে দু'বার করে কান্তিকুমারের কাছে টাকার তাগাদায় আসছেন। টাকা নিয়ে যাচ্ছেন। একদিন দুদিন—তৃতীয় দিন। প্রতাপবাবুকে খালি হাতে ফিরে আসতে হলো সেদিন। কান্তিকুমারের অর্থের সঙ্গতি একটি চাপেই খতম হয়ে গেছে। ধার করারও আর কোন নতুন আশ্রয় নেই।

জীবনে এই প্রথম কান্তিকুমারের পায়ের তলার মাটি চোরা বালির মত নরম হয়ে গেল। তার সকল আশ্বাস যেন এই একটি ঘটনায় নির্ভর হারিয়ে ফেলেছে।

জয়াকে শুধু উপকারের ডোরে বেঁধে রেখেছিল কান্তিকুমার। যদি সেই বাঁধন একবার ছেঁড়ে তবে ছিঁড়েই গেল বোধ হয়।

জয়ার কাছে মুখ দেখাবে কি করে? কল্পনায় এক অমোঘ সুসময়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জয়ার ভালবাসার অধৈর্য্যকে এতদিন স্তব্ধ করে রেখেছে কান্তিকুমার। আজ এসেছে দৈবের উৎপাত। টাকার অভাবে জয়ার চিকিৎসা হবে না। জ্বরের ঘোরে জয়া হেসে উঠবে। তার ভালবাসার মুরোদ ধরা পড়ে যাবে জয়ার কাছে।

টাকা চাই। রাত জেগে অটলনাথের জীবনী লিখছে কান্তিকুমার। অন্তঃসার আর নেই বোধ হয়, মেরুদণ্ডটা ধনুকের মত বেঁকে যায়। দুটো নিদ্রাহীন আতঙ্কিত চোখ খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ে থাকে। একটা নির্লজ্জ কলম ক্লান্তিহীন মোসাহেবী আনন্দে পাতা ভরে শুধু এক বিচিত্র সততার অভ্যুদয়ের ইতিহাস লিখে যায় —অটল নাথের জীবনী এছাড়া আর কোন্ পথ আছে কান্তিকুমারের?

টেবিলের দু'পাশে দু'জনে মুখোমুখি বসে। অটলনাথ বললেন—মেয়ে স্কুলের প্রাইজের বক্তৃতাটা একটু ফলিয়ে লেখ মাষ্টার। আজকাল প্রগতির কথা যাসব শুনছি, সেসব কিছু কিছু দিও। বেশ একটু আর্ট করে লিখবে রবিঠাকুরের মত।

কান্তিকুমার আরও কিছু স্পষ্টভাবে নির্দেশ পাবার জন্য উৎসুকভাবে অটলনাথের দিকে তাকিয়ে রইল। অটলনাথ বললেন—বিয়ে ছাড়া মেয়েদের অন্য কোন পথ নেই। এই কথাটা জোর দিয়ে বলতে হবে। সেই সঙ্গে বেশ কড়া করে নিন্দে করতে হবে—লোকে কেন ঘরে ঘরে ধিড়িঙ্গে আইবুড়ো মেয়ে পুষে রাখে? এটা অধর্ম্ম, এ'তে জাতিলোপ হবার আশঙ্কা আছে।

কান্তি—যে আজ্ঞে।

অটলনাথ—হ্যাঁ, আর একটি কথা লিখবে। পুরুষ অভিভাবক ছাড়া মেয়েদের গতি নেই। সেই অভিভাবক বাপই হোক্ বা স্বামীই হোক্ বা…বা যেই হোক্।

তেমনি নিবিষ্ট মনে লিখে চলেছিল কান্তিকুমার। অটলনাথ আবার বললেন—ভাষাটার দিকে একটু নজর রেখে লিখবে মাষ্টার। খারাপ করো না। অবিশ্যি, তোমার ভাষা যতই খারাপ হোক, আমি তো পড়ার গুণেই মাৎ করে দিই।

কান্তি—যে আজ্ঞে।

অটলনাথ একবার পাশের ঘরে উঠে গেলেন। মিনিট পনর সেখানেই কাটলো। ফিরে এলেন যখন—তখন মুখের চেহারা বদলে গেছে। লালচে হয়ে গেছে, আগুনের আঁচ লাগলে যেমন হয়। চেয়ারে বসে ছেলেমানুষের মত উসখুস করতে লাগলেন অটলনাথ। কান্তিকুমারের কাছে এই দৃশ্য একেবারে নতুন নয়। এক পাত্র স্কচ হুইস্কি পেটে পড়লে অটলনাথের হাবভাব এই পরিণত বয়সেও একটু দুরন্ত হয়ে ওঠে।

—কই, বক্তৃতাটা কিরকম লিখলে দেখি মাষ্টার ? একবার পড়ে শোনাও।

অটলনাথ সোফার ওপর শরীর এলিয়ে বসলেন। একটা সিগারেট ধরিয়ে ডিবেটা কান্তিকুমারের দিকে এগিয়ে দিলেন।—একটা তুলে নাও মাষ্টার, লজ্জা করো না। আমেরিকার ক্রোড়পতি মালিকও চাকরানীর সঙ্গে নাচতে দ্বিধা করে না ; আমি তো তোমাকে বিশুদ্ধ একটি সিগারেট দিচ্ছি। নাও, নিয়ে ফেল !

কান্তিকুমার একটা সিগারেট তুলে নিয়ে খাতাপত্রের একপাশে রেখে দিয়ে লেখাটা পড়ে শোনায়।—আজ তোমরা ছাত্রী—কুমারী। কাল তোমরা গৃহিনী হইবে—মাতা হইবে। সেইতো জীবনের চরম সার্থকতা। তোমরা সেই জগন্মাতার অংশ, যাহার করুনার স্তন্যক্ষীরধারায় নিখিল বিশ্বের জীব লালিত হইতেছে…বন্দে মাতরম্।

দু'ঠোঁটে লঘু লঘু হাসি। ঝুঁকে পড়া মাথাটা সোজা করে তুলে ধরলেন অটলনাথ। বাঃ, খুব কায়দা করে বেড়ে সব দেহতত্ত্ব ঢুকিয়ে দিয়েছ মাষ্টার ! চমৎকার হয়েছে।

আহ্লাদে আপ্লুত স্বরে কথাগুলি বললেন অটলনাথ। কান্তিকুমার হাবা ছেলের মত হাঁ করে তাকিয়ে তার মর্ম বোঝার জন্য বৃথা চেষ্টা করলেন। চোখ বুঁজেই অটলনাথ আবার ডাকলেন—মাষ্টার !

কান্তি—আজ্ঞে ?

—প্রতাপের বড় মেয়েটা বেশ বয়স্থা নয় কি ?

— আজ্ঞে হ্যাঁ।

—প্রতাপের তো এমনিতেই পেট চলে না, মেয়ের বিয়ে দেবার সাধ্য ওর নেই। নয় কি ?

—আজ্ঞে হাঁ।

আমাদের রাঁচী অফিসে প্রতাপকে একটা কাজ দিয়ে ওকে নিশ্চিন্ত করে দিলাম। গালার স্টোরের মুন্সীটাকে বিদায় করে দেব, প্রতাপকে বসিয়ে দেব তার জায়গায়।

— মন্দ নয় স্যার !

—প্রতাপ তো রাঁচী চললো। কথা হচ্ছে মেয়েটা ! মেয়েটা কোথায় থাকবে ? আপাততঃ আমার এখানেই থাকবে। কি বল মাষ্টার ?

উদ্দাম কাশির মধ্যেই ফিক্ করে হেসে ফেললেন অটলনাথ !

—আর একটা সিগারেট নাও মাষ্টার। ডিবেটা সাগ্রহে কান্তিকুমারের দিকে এগিয়ে দিয়ে অটলনাথ আবার বললেন—প্রতাপটা যেন ঝড়ের আগে এঁটো পাতা। বলা মাত্র রাজী হয়ে গেছে। কালই কাজে জয়েন করতে চায়।

বলতে বলতে অটলনাথের গলার স্বর স্খলিত হয়ে উঠতে থাকে।—মেয়েটাই বা কি কম যায়? এর মধ্যে চারটে চিঠি ছেড়েছে—তার সঙ্গে ডাক্তারখানার ওষুধের বিল, বকেয়া বাড়ী ভাড়ার হিসাব, কাপড়ওয়ালার বিল; স্যাকরার পাওনা…। চুকিয়ে দিয়েছি সব। অসুখ সারানো থেকে সুরু করে গয়না পর্যন্ত দিলাম! ব্যাস্। মেয়েটা কিন্তু বাপের মত ততটা তোখোড় নয়।

আহত জানোয়ারের মত আচম্কা হিংস্র মূর্তি ধরে, একটা লাফ দিয়ে ছাতাটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো কান্তিকুমার। সামনের সোফার ওপড় পড়ে এক বৃদ্ধ অজগর যেন কুণ্ডলি পাকিয়ে লালসায় কাতরাচ্ছে। মাথার ওপর প্রচণ্ড একটি আঘাত দিয়ে এই অজগরের জীবনীর শেষ অধ্যায় এখুনি লিখে দিতে পারা যায়। কান্তিকুমারের মূর্তিটা দেখে তাই ভাবতে ইচ্ছে করে। খুনী যেন ছুরি বাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে আছে। কিন্তু এই মূর্ত্তিতে কান্তিকুমারকে কেমন একটু বিসদৃশ মনে হয়—ছদ্মবেশের মত দেখায়।

অটলনাথ বললেন—উঠো না মাষ্টার, কথা আছে।

কান্তিকুমারের উদ্ধত মূর্ত্তিটা এই সামান্য একটি হুকুমের শব্দেই যেন ধীরে ধীরে চুপ্‌সে যেতে লাগল। সতত সৎপথে চলা, কৃতজ্ঞতায় বাধা, পরোপকারে ডগমগ ও পুরস্কারপ্রীত একটি অতিভদ্রের পরবশ আত্মা ঘাড় গুঁজে চেয়ারের ওপর আবার স্থির হয়ে বসে পড়লো। এখন তবু কান্তিকুমারকে বেশ স্বাভাবিক মনে হয়।

অটলনাথ বললেন—প্রতাপ প্রথমে একটু চালাকি চেলেছিল। বলে কিনা—তার মেয়েকে বিয়ে কর, আমি নাকি সাক্ষাৎ শিব। আমি বললাম—তা হয় না। অন্নদাতা হিসেবে তার মেয়েকে রাখতে পারি, বিয়ে করতে পারি না। আচ্ছা এবার তুমি উঠতে পার মাষ্টার।

নির্দেশমাত্র কান্তিকুমার যেন সুবাধ্য টাট্টু ঘোড়ার মত তাড়া খেয়ে, খুট খাট্ খুরের শব্দ করে দরজার দিকে পা চালিয়ে চললো। অটলনাথ ডাক দিলেন আবার—আর একটা কথা আছে মাষ্টার।

কান্তিকুমার দাঁড়ালো।

অটলনাথ বললেন—বাণিজ্যবীর নামটা সুবিধের নয় মাষ্টার। আর ভাল লাগে না। ওটা বদলে দাও। এবার থেকে শুধু লিখবে—বাণিজ্য ঋষি।

মা হিংসীঃ

"অজস্র প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে যে, আসামী গিরধারী গোপ বর্তমান মামলার বহুদিন আগে থেকেই হিংস্র হয়ে উঠেছিল। বর্তমান মামলা আসামীর সেই বিকৃত জীবন ও স্বভাবের চরম পরিণাম। পৃথিবীতে পত্নী নির্যাতক নামে এক ধরনের লোক দেখা যায়, আসামী গিরধারী বোধ হয় নিষ্ঠুরতায় সেই অপমানবদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীর অন্যতম। প্রতিদিন ও প্রতিকথায় সে তার স্ত্রীকে অকথ্য প্রহার অত্যাচার ও নির্যাতন করতো।"

চারজন অ্যাসেসর অবিচল আগ্রহ নিয়ে ছোট ছোট বিষণ্ণ পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে বসেছিল, দায়রা জজের রায় শুনছিল।

রায় পড়তে পড়তে দু'তিন মিনিট পর পর দায়রা জজ যেন ঢোঁক গিলবার জন্য থেমে যাচ্ছিলেন। রুদ্ধ শ্বাসবায়ু মুক্ত করে দিয়ে নতুন বাতাসে দম ভরে নিচ্ছিলেন।

একটা শব্দহীন ভীড় আদালত কক্ষে জমাট হয়েছিল। প্রাণের ধুকপুক শব্দগুলি যেন প্রত্যেকের বুকের কোটরে আড়ষ্ট হয়ে আছে। প্রত্যেকের নিশ্বাস থেকে, প্রত্যেকের চোখের দৃষ্টি থেকে কিছুক্ষণের জন্য সকল চঞ্চলতার ধর্ম নির্বাসিত। একটু নড়ে উঠলেই যেন এই মুহূর্তের শোকাক্রান্ত ছন্দের লয় ক্ষুণ্ণ হবে। শুধু ব্যস্ত হয়েছিল পাংখাকুলি—মেঝের ওপর প্রায় চীৎপাত হয়ে শুয়ে, যেন আক্রোশের সঙ্গে অবিরাম পাখার দড়ি টেনে চলেছে। এজলাসের মাথার ওপর পাখার ঝালর একঘেয়ে শব্দ করে চলেছে—ঝট্‌পট্, ঝট্‌পট্, ঝট্‌পট্। আজকের কাহিনীর সকল যন্ত্রণাকে যেন ঠাণ্ডা হওয়ার ঝাপটে তাড়াতাড়ি বিদায় করে দিতে চায়।

এক একটা বিরামের পর, রায় পড়তে গিয়ে দায়রা জজের গলাটা অস্পষ্টভাবে ঘড়ঘড় করে, পরমুহূর্তেই বেশ স্পষ্ট ও তীব্র হয়ে ওঠে।

"আসামী গিরধারী গোপের এই হিংস্রতার পিছনে একটা ইতিহাস আছে। আসামী ইচ্ছে করেই নিজেকে হিংস্র করেছিল, বেশ ভেবেচিন্তে সে এই পথ ধরেছিল, তার মনের ভেতর একটি সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিল। আসামী গিরধারী তার প্রতিবেশী সহদেব গোপের তরুণী পত্নী শনিচরীর প্রতি আকৃষ্ট ছিল। হাবেভাবে, ইঙ্গিতে এবং স্পষ্ট ভাষায় সে বহুবার শনিচরীর প্রতি প্রণয় প্রস্তাব করেছে। গিরধারীর ধারণা হয় যে, তার নিজ বিবাহিত পত্নী রাধিয়া যতদিন তার ঘরে আছে, ততদিন তার অভিলাস

সফল হবার আশা নেই। রাধিয়া তার পথের কাঁটা। রাধিয়ার উপর আসামীর সকল অত্যাচারের রহস্য হলো, পথের কাঁটাকে সে দূরে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল।

"আসামী বলেছে যে, সে তার স্ত্রী রাধিয়ার চরিত্রে সন্দেহ করতো। আসামীর সব সময় আশঙ্কা ছিল যে, রাধিয়া তাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টায় আছে। সেই হেতু আসামী তাকে মারধোর করেছে, তাড়িয়ে দিতে চেয়েছে। আসামীর স্ত্রী রাধিয়া জেরার উত্তরে বলেছে যে, আসামী তাকে কখনো মারধর করেনি। এই দুই উক্তিই অবিশ্বাস্য।"

মুখ তুলে তাকাল গিরধারী। কাঠের খাঁচার মত আসামীর ডক, তার মধ্যে গুটিসুটি হয়ে সম্মুখের ঘটনার স্পর্শ থেকে নিজেকে আড়াল করে চুপ করে বসেছিল গিরধারী গোপ। জজ সাহেবের বর্ণিত কাহিনীর সঙ্গে একমাত্র ওরই যেন এতক্ষণ কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু হঠাৎ মুখতুলে তাকিয়েছে গিরধারী। ওর দু'চোখে একটা অদ্ভুত রকমের কৌতুহল ফুটে উঠেছে। তার সমগ্র জীবনের এলোমেলো অর্থহীন ভাঙাটুকরা ভাষাগুলি সুন্দর একটা কাহিনী হয়ে গেছে। হোক্ না ইংরেজী ভাষা, প্রত্যেকটি ধ্বনিতে একটা নতুনত্ব আছে। রাধিয়া! রাধিয়া! জজসাহেব উচ্চারণ করছেন—এই নামটার কোন ইংরেজি করা যায় না। ঐ নামটাকে বদলানো যায় না।

"শেষ পর্যন্ত রাধিয়া টিঁকে থাকতে পারেনি। আসামীর হাতে নিগ্রহ অসহ্য হওয়ায় সে বাপের বাড়ী চলে যায়। তারপর একমাসের মধ্যেই ঘটনা অন্যদিকে মোড় ফেরে।

"আসামীর প্রস্তাবে শনিচরী রাজী হয় নি। গত অক্টোবরের পয়লা তারিখে, ভোরবেলার কুয়াশার মধ্যে শনিচরী জল আনবার জন্য কলসী হাতে গ্রামের বড় ইঁদারার দিকে চলেছিল। পথের পাশে আখের ক্ষেতের ভেতর আসামী গিরধারী একটা হেসো নিয়ে অপেক্ষায় ছিল। ঠিক হিংস্র প্যান্থারের মত গিরধারী আখের ক্ষেত থেকে লাফ দিয়ে বের হয়, শনিচরীর গলার ওপর হেসো দিয়ে তিনটে পোঁচ দেয়। শনিচরী সেইখানে দাঁড়িয়ে একবার চীৎকার করে, তারপরেই প্রাণহীন হয়ে পড়ে যায়।

"গিরধারী গোপ যখন এই কাজ করছিল, গ্রামের তিনজন চাষী তাকে দেখতে পায় ও চিনতে পারে। আসামী পালিয়ে গিয়ে ফেরার হয়। পাঁচদিন পরে কাটিহার বাজারে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।

"আসামী তিনবার অপরাধ স্বীকার করেছে, তিনবার অপরাধ অস্বীকার করেছে। সকল সাক্ষ্যপ্রমাণ ও তদন্তের হিসাব নিলে এ বিষয়ে তিলমাত্র সংশয় থাকে না এবং

সিদ্ধান্ত করতে হয় যে গিরধারী গোপ শনিচরীকে প্রতিহিংসাবসে খুন করেছে।

"এক্ষেত্রে আসামীর প্রতি সুবিচার করার জন্যই আমি তাকে চরম দণ্ড—প্রাণদণ্ড দিলাম।"

ঝটপট, ঝটপট, ঝটপট—ঝালর লাগানো প্রকাণ্ড পাখাটা সশব্দে দুলছিল। আদালত ঘরে আর কোন শব্দ ছিল না। জনতা শুধু নিষ্পলক চোখে তাকিয়েছিল গিরধারী গোপের মূর্তিটার দিকে। পঁচিশ-ছাব্বিশ বছর বয়স, রোগা চেহারার গিরধারী। চোখের কোন দুটো কালো, যেন বেশ মোটা করে সুর্মা লেপে দেওয়া হয়েছে। দুহাতে হাঁটু দুটোকে বুকের সঙ্গে জড়িয়ে পা দোলাচ্ছিল গিরধারী।

জজসাহেবের গলা ঘড়ঘড় করে উঠলো, হিন্দী ভাষায় বললেন—"আসামী গিরধারী গোপ, তোমার অপরাধ সবুদ হয়েছে, তুমি মুসাম্মত শনিচরীকে খুন করেছ। মহামান্য সরকারের ফৌজদারী দণ্ডবিধির ৩০২ ধারার নির্দেশমত আমি তোমাকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দিলাম। তোমাকে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে দেওয়া হবে, যতক্ষণ না তোমার প্রাণ শেষ হয়ে যায়।"

—বহুৎ আচ্ছা।

গিরধারী উত্তর দিল। শানিত বিদ্রূপের হিংসামাখা একটা ক্ষুদ্র প্রতিধ্বনি ক্ষণিকের জন্য যেন আদালত ঘরের স্তব্ধতাকে খান্ খান্ করে দিল। ডকের চারদিকে পুলিসেরা উঠে দাঁড়ালো। উকিল মোক্তারের দল একে একে আসন ছেড়ে বাইরে চলে গেল। জনতা টলমল করে একবার ডকের দিকে কৌতূহলের আবেগে ঝুঁকে পড়লো। পুলিশ বাধা দিয়ে জনতা সরিয়ে দিতে লাগলো—আগে চলো! আগে চলো! রাস্তা ছাড়ো, খবরদার!

কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া, গিরধারী গোপ আদালত ঘর ছেড়ে হেঁটে চললো। তার আগুপিছু দু'দিকে প্রহরী। দুপাশে তিন তিনজন করে বন্দুকধারী পুলিস। গিরধারীর প্রতিটি পদক্ষেপ শান্ত ও নির্ভুল। প্রহরীদের উৎকণ্ঠা ও ব্যস্ততার সীমা ছিল না। আদালতের সিঁড়ি থেকে অপেক্ষমান হাজতগামী পুলিশ লরীটা পর্যন্ত বড় জোড় দেড়শো গজ পথ। এইটুকু পথ পার হতে হাবিলদার তিনবার অ্যাটেনসন আর দশবার লেফট্ রাইট হাঁক দিল। ধুপ্ ধাপ বুট ঠোকাঠুকি চললো। তবু এতদিনের প্যারেডে অভ্যস্ত পায়ের কদম বার বার ভুল হয়ে যায়! এদিকে দু'জন হুমড়ি খেয়ে এগিয়ে যায় তো ওদিকে একজন হোঁচট খেয়ে পেছনে পড়ে থাকে। গিরধারীর কোমরের দড়ির এক প্রান্ত শক্ত করে মুঠোয় ধরে এমন জোয়ান চেহারার সিপাহীটাও মিছামিছি হাঁপায়। হাবিলদারের হাতের ছড়ির ইঙ্গিতের তালে তালে বন্দুকধারীরা শরীর দুলিয়ে এক ঢঙে কদম ফেলার চেষ্টা করে। স্বেদাক্ত কপালের রগ

দপ্ দপ্ করে কাঁপে। বড় বেশী উৎকণ্ঠা, বড় বেশী উদ্বেগ, ভয়ানক রকমের দায়িত্ব। সাধারণ আসামী নয়। এক জঘন্য খুনের আসামী, তার পরমায়ু নীলামে বিকিয়ে গেছে। তাই তার আজ এত দাম। তাই এত সাবধানতা। রোগা গিরধারী গোপের ছোট ফুসফুসটাকে লোহার আবরণ দিয়ে ঘিরে নিয়ে যেতে পারলেই ভাল ছিল। ওর গায়ে যেন এক-কণা ধুলো না লাগে, ওর কানে যেন পাখির ডাকের শব্দ না পৌছয়। কে জানে কোথা থেকে কোন্ ফাঁকে কোন বে-আইনী সূর্যের রক্তমাখা আলোক ওর চোখের দৃষ্টিকে উতলা করে দেবে? হয়তো থমকে দাঁড়াবে, আকাশের দিকে তাকাবে, নড়তে চাইবে না। গিরধারীর জীবনে আজ এই পৃথিবীর রূপ-রস গন্ধ-স্পর্শ অবান্তর হয়ে গেছে। আলগোছে সরিয়ে নিয়ে যেতে হবে গিরধারীকে। ফাঁসীর আসামির বুক যেন আনন্দে দুলে না ওঠে—ছিঁড়ে যেতে পারে। যেন চমকে না ওঠে—ফেটে পড়তে পারে। এত বড় মামলার ঘটা, আইন দুরস্ত পৃথিবীর এত বন্দোবস্ত, সব ভেস্তে যাবে। কোন রোগীকে, কোন মুমূর্ষুকে, কোন আহতকে এত সতর্ক সমাদরে কোন দিন তারা বহন করেনি।

পুলিশ লরীর ভেতর পা দিয়েই গিরধারী একবার বাইরের দিকে উঁকি দিয়ে দেখবার চেষ্টা করলো। কাউকে যেন সে খুঁজছে।

হাবিলদার ব্যস্তভাবে বললো—উঁহু, বসে পড়। দেখবার মত কিছু নেই।

গিরধারী হেসে ফেললো—আপনি ঠিক বলেছেন হাবিলদার সাহেব! আর দেখবার কিছু নেই, কেউ আসেনি।

আদালত এলাকার সীমা ছাড়িয়ে পুলিশ লরী দ্রুতবেগে দৌড়ে চলেছিল। প্রহরীরা যেন একটু স্বস্তি ফিরে পেয়েছে। আসামী লোক ভাল। কোন দৌরাত্ম্য করলো না। আসামী একেবারেই ছিঁচকাঁদুনে নয়, একবারও একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়েনি, হাহুতাশ করেনি। এই ধরণের আসামীর হেপাজত নিতে বেশ ভাল লাগে। কোন হাঙ্গামা সইতে হয় না।

মাথার পাগড়ী খুলে পাশে রাখল সেপাইরা। কপালের ঘাম মুছলো। গিরধারীর দিকে একটু করুণাভরা কৃতজ্ঞতার সঙ্গে তারা বার বার তাকিয়ে দেখছিল। লোকটার প্রাণ বেশ পোক্ত ধাতুতে তৈরী। একটুও ঘাবড়ায়নি।

অর্জুন সিং বলে—শেষ পর্যন্ত এই রকম দেমাক নিয়ে টিকতে পারলে ভাল। কোন কষ্ট পাবে না।

হাবিলদার সন্দিগ্ধভাবে উত্তর দেয়—হু:

ভগীরথ পাণ্ডে হাতের চেটোয় এক টিপ খৈনি নিয়ে জোরে জোরে টিপতে আরম্ভ

করে। প্রসঙ্গে যোগ দেয়—হাঁ, আর ঘাবড়ে গিয়ে লাভ কি? জোরসে রাম নাম কর, সখসে ঝুলে পড়। ভয় করার কিছু নেই।

ঠোঁট কুচকে গিরধারী আর একবার হাসলো। সেপাইদের দিকে তাকিয়ে যেন একটু তাচ্ছিল্য করেই বললো—আপনারা কেন এত মাথা ঘামাচ্ছেন? মনে হচ্ছে, আপনারাই ঘাবড়ে গেছেন। বড় বেশী প্রেম দেখাচ্ছেন। কিন্তু জেনে রাখুন, আমি ফাঁসি যাব না।

সিপাহীরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে শুকনোভাবে হাসতে থাকে—মাপ কর ভাইয়া। বেশ, তোমার কথাই সত্যি। তোমার সঙ্গে তর্ক করাব ইচ্ছে নেই আমাদের।

হাবিলদার গিরধারীর মুখের দিকে কিছুক্ষণ তীব্র একটা দৃষ্টি তুলে তাকিয়ে রইল। তার পরেই পাশের সেপাইয়ের কানের কাছে ফিস্ ফিস্ করে বললো—দেখছো তো, ওষুধ ধরে গেছে। এরই মধ্যে মাথার গোলমাল সুরু হলো। হতেই হবে, মানুষ তো আর লোহার তৈরি নয়।

কনেষ্টবল সাকির আলি বলে—বোধ হয় আপীল করবে বলে ঠিক করছে।

হাবিলদার ঠাট্টা করে—হুঁ, আপীল করবে! ওর সংসার বিক্রি করলে দশটা টাকাও হবে না। এক নম্বরের দরিদ্দর, আপীল করবে কোথা থেকে?

অর্জুন সিং—তবে ও কি বলতে চায়?

হাবিলদার—বলছে ওর মাথা আর মুণ্ড। বুদ্ধি বিগড়ে যাচ্ছে, আর কদিনের মধ্যেই…

গিরধারী এক টিপ খৈনি চায়। হাবিলদার একটু সহৃদয়ভাবেই আপত্তি করে—মাপ কর বাবা।

গিরধারী আবার ঠাট্টা করে—দিয়ে ফেলুন সিপাহিজী, আমি এখনি মরছি না। কোন ভয় নেই আপনাদের, হাজত পর্যন্ত বেঁচে বেঁচেই পৌছে যাব। আপনার মাথার পাথর নেমে যাবে।

সেপাইরা সবাই চুপ করে থাকে। হাবিলদার বলে—আমাদের কাছে মেহেরবাণী করে কিছু চেয়ো না গিরধারী। এই তো আর কিছুক্ষণের মধ্যে হাজত পৌছে যাবে। জেলরবাবুর কাছে আর্জি করো, যা চাইবে সব পাবে।

গিরধারী অহংকারের সুরে উত্তর দিল—কিছু আমি চাইব না। কিছু দরকার নেই। আমি সব পেয়ে গেছি। বড় খুসী লাগছে সিপাহিজী।

প্রহরী পুলিশদের মধ্যে কানাকানি আলোচনা হয়—এত টনটনে জ্ঞান ভাল নয়। এরাই শেষ পর্যন্ত ভেঙে পড়ে। এখন তো শুধু জেদের জোরে ফরফর করছে—লম্বা লম্বা বুলি ঝাড়ছে। আর দুটো দিন পার হোক, অন্ধ মোষের মত গরাদে মাথা ঠুকবে, আর গোঁ গোঁ করবে। ফাঁসির শাস্তি, এ কি ঠাট্টার কথা রে ভাই!

গিরধারী বলে—আমি সব শুনতে পাচ্ছি সিপাইজী। যত খুসী আপশোষ করুন আপনারা। কিন্তু আমি জানি, আমার ফঁাসি হবে না।

গিরধারীর কথাবার্তায় পাগলামির কোন আভাষ নেই। কিন্তু এত জোর গলায় সে যে কথা বলছে, সেটা প্রলাপ ছাড়া আর কি হতে পারে? প্রহরীদের সংশয় আর কৌতূহল এক সঙ্গে মনের মধ্যে প্রবল হয়ে ওঠছিল। কোথা থেকে এই বিশ্বাস পেল গিরধারী?

মোটর লরি একটা চক পার হয়ে বাঁ দিকে মোড় ঘুরলো। মুখ ঘুরিয়ে ডানদিকের পথের দিকে যেন একটা তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি প্রসারিত করে গিরধারী কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। লাল কাঁকরের একটা কাঁচা সড়ক চলে গেছে এঁকে বেঁকে, দুপাশে দু'সার আম শাল আর তেঁতুলের ছায়া নিয়ে। অবাধ অবারিত মাঠের বুকের ওপর দিয়ে সড়কটা ডাইনে বাঁয়ে এক একটা ছোট ছোট গ্রাম ছুঁয়ে দিগ্বলয়ের কোণে গিয়ে যেন মিলিয়ে গেছে।

গিরধারী জিজ্ঞেস করলো—এই রাস্তা কোন্ দিকে গেছে হাবিলদার সাহেব?

হাবিলদার—অনেক দূর চলে গেছে। রফিনগরের বাজার ছাড়িয়ে, বাবুঘাট থানা পার হয়ে একেবারে মুঙ্গের জেলায় গিয়ে পড়েছে। কেন বল তো?

গিরধারী—মিঠাপুর গাঁ এই পথে পড়ে?

হাবিলদার—হঁা। কিন্তু মিঠাপুরের সঙ্গে তোমার কি সম্পর্ক?

গিরধারী—আমার শ্বশুরার ঐ গাঁয়ে।

প্রহরীর দল চাপা স্বরে এক সঙ্গে আপশোষ করলো—আর তোমার শ্বশুরার!

গিরধারী মুখ ঘুরিয়ে আবার মিঠাপুরের কাঁচা সড়কের দিকে স্থির দৃষ্টি তুলে তাকিয়েছিল। পুলিসদের কোন মন্তব্য বোধ হয় কানে শুনতে পাচ্ছিল না গিরধারী। দূর সর্পিল পথের মাটির সঙ্গে গিরধারীর সমস্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম যেন পাকে পাকে জড়িয়ে পড়েছে। ওর চোখেমুখেই সেই রকম একটা মুগ্ধ আবেশ থম্‌থম্ করছিল।

আবার সোজা হয়ে বসতেই অর্জুন সিং প্রশ্ন করলো—সত্যি কথা বলতো গিরধারী, মেয়েটাকে তুমি খুন করেছিলে?

গিরধারী—হঁা, আমি আগেই ওকে জানিয়ে দিয়েছিলাম যে, একদিন সব দেনা-পাওনার হিসাব নেব। যেদিন সুবিধা পেলাম, হিসেব নিয়ে নিলাম।

হাবিলদার—বড় ভুল করেছিলে গিরধারী।

গিরধারী যেন ভুল বুঝতে পেরেছে, তেমনি অনুশোচনার সুরে জবাব দিল—হঁা, হাবিলদার সাহেব, রাত্রিবেলায় একটু নিরালা জায়গাতেই কাজ খতম করা উচিত ছিল, কিন্তু সকাল হয়ে গেছে বুঝতে পেরেও রাগকে বোঝাতে পারলাম না। লোকে দেখে ফেললো। নইলে…।

খুন করেছে, তার জন্য কোন অনুতাপ নেই গিরধারীর মনে। এবিষয়ে সে নিজেকে আজও নির্ভুল মনে করে। শুধু ভুল—সে ধরা পড়ে গেছে। অপরাধীর দীনতা লজ্জা মর্মপীড়ার কোন চিহ্ন আবিষ্কার করা যায় না গিরধারীর কথায়।

সাকির আলি আশ্চর্য হয়ে বলে—আমি বাস্তবিক এই কথা ভেবে আশ্চর্য হই, আজ পর্যন্ত কোন ফাঁসীর আসামীকে তার কসুরের জন্য দুঃখ করতে দেখলাম না।

হাবিলদার—আর দুঃখ করার মত ওদের মন থাকে না ভাই। নিজের কসুরের কথা একদম ভুলে যায়।

অর্জুন সিং বলে—ফাঁসির হুকুম না হলে, মানুষের মত মনটা তবু থাকে। নিজেকে পাপী বলে বুঝতে পারে, এক আধটুকু আপশোস করেও। কিন্তু……

হাবিলদার একটু সম্ভ্রম ও সঙ্কোচে আমৃতা আমৃতা করে বলে -একটা প্রশ্ন করবো গিরধারী, মাপ করো ভাই।

গিরধারী—বলুন।

হাবিলদার—তোমার জেনানা বাবিয়া কি সত্যিই খারাপ হয়ে গিয়েছিল?

গিরধারীর মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো, শান্তভাবে বললো—সে খবর সে জানে আর আমি জানি। আপনাদের শুনে কি লাভ?

হাবিলদার তীক্ষ্ণ মেজাজে বেশ চড়া গলায় বিদ্রূপ করলো—আরে তুমি তো দুনিয়াকে সে খবর শুনিয়ে দিয়েছ। নিজেই আদালতে আর পুলিসের কাছে বলেছ যে…।

গিরধারীর মুখটা অসহায়ের মত করুণ ও বিষন্ন হয়ে ওঠে। অনুনয়ের সুরে প্রশ্ন করলো—হ্যাঁ, মেহেরবাণী করে বলুন তো হাবিলদার সাহেব, আমি কি বলেছি। আমার ঠিক মনে পড়ছে না।

হাবিলদার—তুমি বলেছ যে, তোমার জেনানা রাধিয়া তোমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করতো।

কথাগুলিকে যেন মনের সব আগ্রহ দিয়ে বরণ করে নিচ্ছিল গিরধারী। শুনতে শুনতে সারা মুখে এক বিচিত্র ধরণের পরিতৃপ্তির উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়েছিল। নৌকার ঘুমন্ত যাত্রী যদি হঠাৎ জেগে উঠে ঘাটের মাটি নিকটে দেখতে পায়, সকল ভরসার আনন্দে দীর্ঘ অপেক্ষার ক্লান্তি মুহূর্তে নিঃশেষ হয়ে যায়, গিরধারীর দৃষ্টি সেই রকমের। এক প্রচণ্ড অন্ধকারের স্রোতের টানে অবধারিত অস্তিমের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে, কিন্তু গিরধারীর মনে কোন শঙ্কা নেই, তার হাতের মুঠোয় যেন একটা শক্ত কাছির অবলম্বন রয়েছে, দূর তটভূমির হৃদয়ের এক কঠিন আশ্বাসের সঙ্গে বাঁধা। মাঠের পর

মাঠ পেরিয়ে আরও দূরে, মুঙ্গের রোডের এক পাশে মিঠাপুর গ্রাম। গিরধারীকে ফাঁসির অপমান ও বেদনা থেকে উদ্ধার করে নিয়ে যাবে, মিঠাপুরের এক মেটে ঘরের নিভৃতে একটা বুকভরা আকুলতা এখন প্রস্তুত হচ্ছে, উপায় খুঁজে বার করছে। সব বুঝতে পেরেছে রাধিয়া, এতখানি বুদ্ধি তার আছে।

সাকির আলি প্রশ্ন করে—কথাটা কি সত্যি?

গিরধারী প্রশ্ন শুনে চমকে ওঠে। ঘোর মিথ্যার আবরণ দিয়ে ঢাকা এই কথার অর্থটা কি ধরা পড়ে গেল? সামলে নিয়ে বেশ শান্তভাবেই গিরধারী উত্তর দেয়—সত্যি না মিথ্যে, সে খবর আমি জানি আর সে জানে।

হাবিলদার মন্তব্য করে—এটা কিন্তু একেবারে মিথ্যা কথা বলেছ গিরধারী। নিজের প্রাণ বাঁচাবার জন্য জঘন্য একটা মিথ্যা কথা বললে, কিন্তু কোন লাভ হল না। না বাঁচলো নিজের প্রাণ, না রইল নিজের স্ত্রীর ইজ্জৎ।

অর্জুন সিং কর্কশভাবে বলে—একবার ভেবে দেখলে না, কি ভাবলো তোমার বউ। বেচারী নিজের কানে তোমার ঐ কথা শুনেছে।

অনুযোগ আর ধিক্কার শুনে গিরধারী একটুও কুণ্ঠিত হয় না, তার চেহারার উৎফুল্লতা যেন নতুন বিশ্বাসে আরও সজীব হয়ে ওঠে। মনের ভেতর আদালত ঘরের ছবিটা অস্পষ্টভাবে দেখতে পায়। কালো কালো কতগুলি নরমুণ্ড তাকে ঘিরে ধরে আছে। জজ আর উকীলেরা প্রশ্ন করছে, প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে গিরধারী—রাধিয়া আমাকে বিষ খাওয়াবার চেষ্টা করতো। আমি জানি একদিন না একদিন বিষ খাওয়াবে। আমি তাই…

আদালত ঘরের এক কোণে নাকমুখ আঁচল দিয়ে ঢেকে বদরী চাচার পাশে চুপ করে বসেছিল রাধিয়া। গিরধারীর প্রলাপ শুনতে পেল। চোখ তুলে তাকালো গিরধারীর ধূর্ত মূর্তিটার দিকে। কয়েকটি মুহূর্তের মত চোখের তারা দুটো স্থির হয়ে রইল। সব বুঝতে পারে রাধিয়া। গিরধারীর শেষ কামনার নিবিড় আগ্রহ ঐ প্রলাপের আড়ালে কিসের স্পষ্ট ইসারা দিচ্ছে? রাধিয়ার হাতের কাঁচের চুড়িগুলি একবার শব্দ করে ওঠে। গিরধারার সকল উদ্বেগ এক সাফল্যের গর্বে নিশ্চিহ্ন হয়ে উড়ে যায়। ফাঁসির মৃত্যুর অসম্মান থেকে গিরধারীর অন্তরাত্মা উদ্ধার পাবার জন্য যার কাছে আপীল জানাচ্ছে, সেই আবছা ভাষার ষড়যন্ত্র পৃথিবী ধরতে না পারুক, রাধিয়া নিশ্চয় ধরেছে।

জেলের ফটক দেখা যায়। বুড়ো বটের ছায়ায় ফটকের দাঁতগুলি অস্পষ্ট হয়ে আছে। ওপারে বটের পাতার আড়ালে শত শত বাদুড় দুলছে। নীচে বন্দুক কাঁধে শান্ত্রী পাইচারী করে। ফটকের পাশে একটা কাঠের ত্রিভুজের মধ্যে পেতলের ঘণ্টা ঝুলছে।

মোটর লরি ক্রমে মন্থর হয়ে ফটকের সামনে এসে একেবারে থামলো। খপ্ খপ্ করে মাথার পাগড়ী গুঁজে, লাঠি খাতা বন্দুক আর গিরধারীকে নিয়ে প্রহরীরা বুড়ো বটের ছায়ায় দাঁড়ালো।

অর্জুন সিংয়ের মনটা একটু করুণাপ্রবণ। গিরধারীর পাশে দাঁড়িয়ে আস্তে আস্তে বললো—আর সময় নেই গিরধারী। এইবার আমাদের হেপাজাত ছেড়ে তোমাকে ভেতরে ঢুকে পড়তে হবে। ধরিত্রীকে প্রণাম করে নাও।

গিরধারী বিস্মিতভাবে অর্জুন সিংয়ের দিকে তাকালো। অর্জুন সিং বললো—সবাই করে ভাইয়া। নাও, তাড়াতাড়ি একটু ধূলো কপালে ঠেকিয়ে নাও। আর সুযোগ পাবে না।

ফটকের ছোট দরজাটা তখন কঁকিয়ে কঁকিয়ে খুলছে, গিরধারীর জীবনের রথ এসে পথের শেষে পৌঁছে গেছে। পেছনের দুনিয়ার মাটি সরে যাবে এই মুহূর্তে। গিরধারীর জীবনে আর উল্টো রথের আশা নেই, চাকা ভেঙে গেছে। লোহার গরাদের ওপারে এক গভীর সুপ্তির জলকুণ্ড লুকিয়ে আছে, সেখানে প্রণাম করার মত মাটি আর পাওয়া যাবে না। কিন্তু অর্জুন সিং দুঃখিত হয়েই দেখছিল, গিরধারী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

হাবিলদার বললো—চল।

ঢং ঢং করে পাঁচটার ঘণ্টা বাজলো। বুড়ো বটের ছায়া লম্বা হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে। পুলিশ লরির ইঞ্জিনটা স্টার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ফোঁপাচ্ছিল। ফটকের মুখ থেকে বের হয়ে এসে প্রহরীর দল অলসভাবে আবার লরির ভেতর একে একে উঠে বসলো—হাবিলদার, অর্জুন সিং, সাকির আলি। গিরধারী নেই, জ্যান্ত গিরধারীর বাসি প্রাণ জেলরের কাছে জমা দিয়ে শুধু রসিদ নিয়ে ফিরে চললো প্রহরীর দল।

মোটর লরিটা আচম্কা একবার বাস্প্ করে দ্রুত দৌড়ে চলে গেল।

পাঁচ হাত লম্বা পাঁচ হাত চওড়া নিরেট পাথর আর কংক্রীটের গাঁথুনি দিয়ে তৈরী খুপরির মধ্যে ভাগলপুরী কম্বলের ওপর শুয়ে সে রাত্রে গিরধারী কি স্বপ্ন দেখেছিল, তা কেউ জানে না। কিন্তু সূর্য ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জেলের প্রত্যেক কর্মচারী, ওয়ার্ডার, শান্ত্রী আর কয়েদী বুঝতে পারলো—এক অতি দুর্দান্ত ফাঁসির আসামীর আবিভাব হয়েছে। জেলর থেকে আরম্ভ করে ওয়ার্ডার শান্ত্রী আর ডাক্তার—সবাইকে যা খুশী টিটকারী দিয়েছে, গালাগালী দিয়েছে। একেবারে বেপরোয়া আসামী। মেথরের সঙ্গে রসিকতা করে শালা সম্পর্ক পাতিয়েছে। স্থূলাকার শান্ত্রী পাড়েজীর একটা নতুন নামকরণ করেছে—বীর বৃকোদর।

তাঁতঘরের কয়েদিরা কাজ করতে করতে তখনো শুনতে পাচ্ছিল, সেলের মধ্যে

ফাঁসীর আসামী গিরধারী গলা খুলে গান গাইছে—"নজরীয়া-লুভায় লিয়ে যায়, মন তিরছি! হাঁরে মন তিরছি!"

কে জানে কিসের স্বপ্নে মাতোয়ারা হয়ে আছে গিরধারী। সারাদিন গোলমাল করে। চীৎকার ক'রে বলে—কোন্ শালা আমার ফাঁসি দেবে দেখবো।

বিদ্রূপ ক'রে বলে—আহা! কত সখ। দড়িতে ঝুলিয়ে মারবে! পাগলা কুত্তা পেয়েছে, না?

প্রতিদিন খাবার নিয়ে হাঙ্গামা করে গিরধারী। এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই থু থু করে ফেলে দেয়।

সন্ধ্যে হতেই চেঁচামিচি আরম্ভ করে—মশারি চাই। উঃ কি ভয়ানক মশা! যেমন জেলের লোকগুলি তেমনি মশাগুলি!

শান্ত্রী পাঁড়েজী মেজাজের ধৈর্য কষ্ট করে অটুট রাখে। শান্তভাবেই বোঝাতে চেষ্টা করে—এই রকম গোলমাল করো না, সব পাবে। ঘুমোও ঘুমোও।

আরো কিছুক্ষণ দাপাদাপি করে একটু শান্ত হয় গিরধারী, ঝিমোতে থাকে, তারপর ঘুমিয়ে পড়ে। গরাদের বাইরে পাঁড়েজির একটানা প্রহরা ও বুটের শব্দ অন্ধকারে মচ মচ করে। ঘণ্টা বাজে। পাহারা বদল হয়। ঘুমন্ত গিরধারীর বুকের প্রতিটি স্পন্দনকে সযত্নে পাহারা দেবার জন্য নতুন শান্ত্রী আসে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙে উঠে বসে গিরধারী। জিজ্ঞেসা করে—কত রাত হলো?

—এগারটা। চুপ করে ঘুমোও। শান্ত্রী দিলবর মিঞা উত্তর দেয়।

গিরধারী তবু জেগে জেগে কিছুক্ষণ উসখুস করে। তারপর ঘুমিয়ে পড়ে অঘোরে। সমস্ত পৃথিবীর জীবনযন্ত্রের ছন্দের সঙ্গে নিশ্বাসে প্রশ্বাসে তাল রেখে কোটি কোটি মানুষের মত ঘুমোতে থাকে গিরধারী।

দু'মিনিট পরেই জেগে ওঠে; শান্ত্রীকে উদ্দেশ্য ক'রে বলে—খুব ভাল ঘুম হলো সিপাহীজী! আঃ!

দিল্‌বর মিঞা বলে—আবার ঘুমাও।

গিরধারী বিরক্ত হয়ে ওঠে—আর কত ঘুমোব সিপাহীজী!

লাল চিঠি এসে গেছে—হাইকোর্টের সহি এসে গেছে। ওয়ার্ডার আর শান্ত্রীরা সকলেই সে খবর রাখে। গিরধারীর আয়ুর মুহূর্তগুলির মাত্রা বাঁধা হয়ে গেছে।

ব্যারাকের রসুইঘরে রান্না করতে করতে সিপাহিরা আলোচনা করে—দুদিন থেকে গিরধারী গোপ একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। আরও ঠাণ্ডা হওয়া এখনো বাকি আছে। এখনো কিছু কিছু ইয়ার্কি করে।

—এখনো ওর বিশ্বাস যে ওর ফাঁসি হবে না।

—তাই ভাল, তাই ভাল। ঐ বিশ্বাস নিয়েই বাকি কটা দিন পার করে দিক্।

—যাই বল, গিরধারী গোপ কিন্তু বড় শক্ত খুনী। এদের যাওয়াই ভাল।

—আরে নেহি ভাই, তাতে কোন লাভ হয় না।

—সব খুনীর যদি ফাঁসি হতো, তবে না হয় বলা যেতো যে একটা নিয়ম আছে।

—যারা খুন করে ধরা পড়ে, তারই শুধু ফাঁসী হয়।

—ভেজাল খাবার খাইয়ে কত লোককে খুন করা হচ্ছে, তাদের তো কই ফাঁসী হয় না।

— উল্টে তাদের লাইসেন্স দেওয়া হয়।

—গাঁজা আফিম খেয়ে কত লোক রক্ত শুকিয়ে মরে যায়। কই, কেউ তো বাধা দেয় না, বিচার করে না?

—কত লোকে ফুর্তি করে মোটর গাড়ি চালিয়ে কত লোক মারে।

—কিন্তু জেনে শুনে তো মারে না ভাই, ভুল করে মারে!

—আরে হাঁ হাঁ। সব খুনই ভুল করে হয়। মেজাজের ভুল।

শাস্ত্রী পাঁড়েজি পাহারায় এসে দেখে, গিরধারী ধীরস্থির হয়ে বসে আছে। এই রকম দৃশ্যই পাঁড়েজি আশা করেছিল। মৃত্যুর ফাঁদে পড়ে প্রত্যেক অভিশপ্ত প্রাণ প্রথম কয়েকটা দিন যেন দুরন্ত হয়ে ওঠে, বিদ্রোহ করে। তার পরেই ধীরে ধীরে নেতিয়ে পড়ে। শত আশ্বাসে ও প্রেরণায় তখন তাকে আর ঠেলে তোলা যায় না।

পাঁড়েজি বললো—লাল চিঠি তো এসে গেছে গিরধারী।

গিরধারী—হাঁ, পাঁড়েজি।

পাঁড়েজি—বাস, ভয় করবার কিছু নেই। প্রেমসে রাম নাম কর।

গিরধারী শান্ত ভাবেই উত্তর দিল—আপনি সান্ত্বনা দেবেন না পাঁড়েজি, আমার ফাঁসি হবে না।

শাস্ত্রী পাঁড়েজি চুপ করে গেল। এখনো মুক্তির স্বপ্ন দেখছে গিরধারী। সব দিকে এত টন্‌টনে জ্ঞান, শুধু এই একটি ক্ষেত্রে একেবারে আপোগণ্ড শিশুর মত সে বোকা। এর কোন কারণ খুঁজে পায় না পাঁড়েজি। হয়তো মাথায় দোষ দেখা দিয়েছে গিরধারীর।

গিরধারী বলে—আমাকে এক টুকরো খড়ি যোগাড় করে দিতে পারেন পাঁড়েজি?

পাঁড়েজি—কেন?

গিরধারী—ছবি আঁকবো।

পাঁড়েজি—জেলর বাবুকে বলবো।

গিরধারী—জেলের গরুগুলি এত রোগা কেন পাঁড়েজি?

পাঁড়েজি—আমি জানি না।

গিরধারী—নিশ্চয় ভাল করে খাওয়ানো হয় না।

পাঁড়েজি—জানি না, আমি গয়লা নই।

গিরধারী—জেলরবাবু আসুক, আচ্ছা করে শুনিয়ে দেব।

গিরধারী কয়েকটা দিন আর গান গায়নি। শুধু বার বার প্রশ্ন করে—কটা বেজেছে সিপাহীজী আজ কত তারিখ?

ঘণ্টার পর ঘণ্টা এক এক সময় নিঝুম হয়ে থাকে গিরধারী। অন্তর্লোকের পথে যেন কারও পায়ের শব্দ শুনছে। সে আসছে, সে এতক্ষণ রওনা হয়ে গেছে। আর কত দেরী করবে! মিঠাপুর থেকে লাল কাঁকরের সড়ক ধরে হেঁটে হেঁটে শান্তিময় মৃত্যুর উপঢৌকন নিয়ে রাধিয়া আসবেই। তার ইসারা বুঝতে কি ভুল করবে রাধিয়া? অসম্ভব। খুব চালাক মেয়ে রাধিয়া। জীবনের সব কাজে রাধিয়া গিরধারীকে সাহায্য করেছে। শুধু একটি ক্ষেত্রে পারেনি। রাধিয়ার জীবনের তৃপ্তির একটি মাত্র অভিশাপ, একটি মাত্র বাধা, তাকেও হেসো দিয়ে নির্মূল করে দিয়েছে গিরধারী। তবে আর কেন? এখন তো পথে আর কোন কাঁটা নেই, স্বচ্ছন্দে রাধিয়া চলে আসতে পারে।

গিরধারীর বিশ্বাস অবিচল থাকে। রাধিয়া ঠিক সময় মত পৌছে যাবে। ফাঁসির মৃত্যু থেকে রাধিয়া তাকে মুক্তি দেবে।

কিন্তু গিরধারীর স্বপ্ন বোধ হয় মিথ্যে হতে চলেছে। জেলর ও ডাক্তার এলেন সেলের কাছে। গিরধারীর ওজন নেওয়া হলো।

কোন প্রশ্ন করার আগেই জেলর জানিয়ে দিলেন—কাল তোমার ফাঁসীর দিন, গিরধারী গোপ।

গিরধারী জবাব দিল—কিছু না।

সেলের দরজা বন্ধ হলো।

দুপুর পর্যন্ত সেলের মেজের ওপর গিরধারীর শীর্ণ মূর্তিটা কুঁকড়ে পড়েছিল। দেয়াল মেজে ছাত—সব নিরেট, কোথাও একটা ফুটো নেই যে সাপ হয়ে পালিয়ে যাওয়া যায়। কয়েদীদের খাওয়া হয়ে গেছে, কাকের ঝাঁক এঁটো খাওয়ার জন্য কলরব করে উড়ে বেড়াচ্ছে বাইরে—শব্দ শোনা যায়।

সেলের দরজা খুলে দিলবর মিঞা এসে খবর দিল—মোলাকাতে চল। তোমার জেনানা এসেছে।

না, স্বপ্ন মিথ্যে হয়নি। এক লাফে উঠে দাঁড়ালো গিরধারী। মেজের ওপর কম্বলটাকে এক লাথি মেরে পেছনে সরিয়ে দিল। গিরধারী যেন সব বন্ধন ছিন্ন করে

চলেছে। আর এখানে ফিরে আসতে হবে না।

অফিস ঘরের পাশে, একটা গরাদের ওপরে এসে বসলো গিরধারী। একজন ওয়ার্ডারের সঙ্গে রাধিয়া ঢুকলো অফিস ঘরে।

এক দৌড়ে এসে গরাদের ওপর যেন ঝাঁপিয়ে পড়লো রাধিয়া। মেজের ওপর জোরে মাথা ঠুকে ঢপ করে একটা প্রণাম করলো।

ফুপিয়ে কাঁদছিল রাধিয়া। চরম বেদনা ও হতাশার একটা প্রতিধ্বনি যেন টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়ছিল। রাধিয়া বলছিল—ছিনিয়ে নিলে গো। তোমার খাবার ছিনিয়ে নিলে।

অতি নগণ্য খাবার জিনিস, একটুখানি গুড়ের হালুয়া আর একটা পেঁড়া পাতায় মুড়ে নিয়ে এসেছিল রাধিয়া। কিন্তু সে সাধ সফল হয়নি। ফটকের শাস্ত্রির কাছে জমা রেখে আসতে হয়েছে।

জেলর রাধিয়াকে বোঝাতে চেষ্টা করলেন—এর জন্যে এত কান্না কেন? আরও ভাল খাবারের বন্দোবস্ত করে দিচ্ছি। তুমিই নাম কর, কি খাওয়াতে চাও। রসগোল্লা জিলিপী. ...।

গিরধারী তাকিয়েছিল অদ্ভুত ভাবে। একটা মৃত মানুষের মূর্তির মধ্যে চোখের কোটর দুটো যেন হাঁ করে রয়েছে। সে দৃষ্টিতে কোন অর্থ নেই, ভাষা নেই, আবেগ নেই, জ্যোতি নেই। আজ এতদিনে সত্যিকারের ফাঁসির হুকুম শুনতে পেয়েছে গিরধারী। রাধিয়ার নিজের হাতের তৈরি মধুর মৃত্যুর উপহার হাতের নাগালে পৌঁছল না। গিরধারীর মেরুদণ্ডটা কাঁপছে, বেঁকে যাচ্ছে, কট্‌কট্‌ করে বাজছে, জীবনকাঠি ভাঙছে।

ভয়ার্ত ছোট ছেলের মত হাঁউ হাঁউ ক'রে কেঁদে উঠলো গিরধারী।—বাঁচাও রে বাবা! বাঁচিয়ে দে রে বাবা!

সবাইকে আশ্চর্য করলো গিরধারী। অদ্ভুত। গিরধারীর মত এত শক্ত আসামি হঠাৎ এভাবে ভেঙে পড়ে কেন?

কেরাণীবাবু ঘড়ি দেখলেন। মোলাকাতের সময় শেষ হয়ে গেছে। দু'জন ওয়ার্ডার রাধিয়ার হাত ধরে ফটকের বাইরে টেনে নিয়ে চলে গেল।

সেদিন সমস্ত জেলের কয়েদী আশ্চর্য হয়ে শুনলো ফাঁসির আসামী গিরধারীর ব্যাকুল চীৎকার আর কান্নার শব্দ। বধ্যভূমির গন্ধ পেয়ে একটা পশু যেন সেলের ভেতর আর্তনাদ করছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে। শাস্ত্রী পাঁড়েজি পাহারায় আছে। কান্না থামিয়ে গিরধারী কম্বলের ওপর মুখগুজে শুয়ে পড়েছিল।

রাত্রি আর অন্ধকার ক্রমে ঘনিয়ে উঠলো। সব নম্বর বন্ধ হলো। দেখা যায়, কলঘর থেকে একটু দূরে খোলা মাঠের ওপর নতুন একটা বাতি জ্বলছে। ফাঁসির তক্তা পাহারা দিচ্ছে শান্ত্রী। ঠিক আছে, সব ঠিক আছে।

দড়ি পরীক্ষা হয়ে গেছে। তিন মণ ওজনের বালির বস্তা ঝুলিয়ে দড়ির শক্তি টেস্ট করা হয়েছে। পোষা অজগরের মত চর্বি-মাখানো দড়িটা এখন গুটিয়ে পাকিয়ে পড়ে আছে অফিস ঘরের একটা সিন্দুকে-তালাবদ্ধ হয়ে।

আর একটি নম্বরের কুঠুরিতে নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে জহ্লাদ বংশী দোসাদ। ফাঁসি প্রতি পাঁচ টাকা রেট। আজ রাত শেষ হয়ে সকাল হতেই বংশী দোসাদের রোজগারের হিসাবে পাঁচ টাকা জমা হবে।

জেলখানার মাথার ওপরে অন্ধকারে পাখার বাতাস দিয়ে, বুড়ো বটের পাতার ভীড় ছেড়ে মাঝে মাঝে বাদুড়ের ঝাঁক উড়ছিল। টর্চ হাতে নিয়ে জেলর আর হাবিলদার শান্ত্রী রাউণ্ড দিয়ে গেলেন। সব ঘুমিয়ে পড়েছে, প্রত্যেকটি নম্বর নিঝুম। তাঁতখানা, কলঘর, ঘানি—তারপর বাঁ দিকে ঘুরে ঘাসের ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে সেলের কাছে পৌঁছলেন।

গিরধারী উঠে বসে সেলাম জানালো।

জেলর জিজ্ঞাসা করলেন—কেমন আছ? ঘুম হয়েছে?

গিরধারী—হ্যাঁ, বাবু।

জেলর—তবিয়ৎ ভাল আছে?

গিরধারী—হাঁ বাবু।

জেলর—খেয়েছ?

গিরধারী—হাঁ বাবু।

জেলর—বেশ বেশ। এখনোও অনেক রাত আছে ঘুমোও।

জেলরবাবু চলে যাবার জন্য পা বাড়িয়েই আর একবার দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন—তোমার কিছু বলবার আছে?

গিরধারী চুপ করে রইল। তারপর বললো—না।

জেলরবাবু চলে যাচ্ছিলেন। গিরধারী ডাকলো—বাবু!

জেলর—বল।

গিরধারী—রোজ রাত্রিবেলা বাইরে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান হয় শুনতে পাই, কে গায়?

জেলর—আমার মেয়েরা গায়।

গিরধারী—আজ কিন্তু দিদিদের গান শুনতে পেলাম না বাবু।

জেলর একটু অপ্রস্তুত হয়ে কিছুক্ষণের জন্য চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে বাইরে চলে গেলেন। সেলের সামনে ডবল শাস্ত্রীর পাহারা অন্ধকার আগ্‌লে দাঁড়িয়ে রইল।

নিঃশব্দে বসে রইল গিরধারী। শাস্ত্রী পাঁড়েজি বললেন—ঘুমোবার চেষ্টা কর গিরধারী।

গিরধারী বললো—কিছু তুলসীবচন শোনাতে পারেন পাঁড়েজি।

পাঁড়েজি—রাম নাম কর গিরধারী। তুলসীবচনের সার হলো রাম নাম। কোন ভয় নেই।

সীতারাম! সীতারাম। নিশ্বাসের সঙ্গে আস্তে আস্তে নাম উচ্চারণ করলো গিরধারী।

ভোরের আব্‌ছা অন্ধকারে জেল কম্পাউণ্ডের বাইরে সড়কের ওপর গাছতলায় চুপ করে বসেছিল রাধিয়া। একটা কুপিতা নিশাচরী মূর্তি যেন সময় গুণতে গুণতে ভোর করে ফেলেছে। আর পালিয়ে যেতে পারেনি। রাধিয়ার কাপড় ধুলোয় লাল হয়ে গেছে। রুক্ষ চুলগুলি এলোমেলো হয়ে আছে। সারা রাত যেন জেলখানার প্রত্যেকটি শব্দ উৎকর্ণ হয়ে পাহারা দিয়েছে, চোখের পলক ফেলেনি। চোখ দুটো ফুলে লাল হয়ে আছে। রাধিয়ার আঁচলে কয়েকটি শ্বেতকৌড়ি আর খই পুঁটলি করে বাঁধা। পাশে একটা মেটে কলসী, জলে ভরা।

ফটকের আলো নিভ্‌লো। জেলখানার মাঝখানে একটা গাছের মাথায় সারা রাত আলোর ছটা লেগেছিল। সে আলোও নিভেছে, রাধিয়া দেখতে পায়।

ফটকের ভেতর দিয়ে লোক আসা যাওয়া করছে। ভোরের কাকের দল শব্দ করে পূব আকাশের দিকে ছুটেছে।

সীতারাম! সীতারাম! সীতারাম! মানুষের বুক থেকে একটা আর্ত্ত মন্ত্রের শব্দ ছিট্‌কে বের হয়ে জেলখানার বাতাসে ছুটোছুটি ক'রে বেড়াচ্ছে।

রাধিয়া জলের কলসী হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ফটকের দিকে এগিয়ে চললো।

সীতারাম! সীতারাম! সীতারা।...।

এক অদৃশ্য সেতারের তার হঠাৎ ছিড়ে গেল। হুম্‌ম্—হ্যাঁচকা টানে একটা ভাষাহীন বোবা যন্ত্রণা যেন নিমেষের মধ্যে পৃথিবীর বুকের ভেতর ঢুকে পড়লো।

ফটকের কাছে একটা গরুর গাড়ি দাঁড়িয়েছিল লাস নিয়ে যাবার জন্য। রাধিয়া ফটকের কাছে এসে দাঁড়াতেই শাস্ত্রী বললো—বসো, লাস আসছে।

লাস এল, কম্বলে জড়ানো গিরধারী।

রাধিয়া বললো—কম্বল সরাও। আমি ওকে একবার দেখবো।

ডোমেরা কম্বলের ঢাকা সরিয়ে দিতেই, চমকে কপালে হাত দিয়ে এক ঠায় দাঁড়িয়ে রইল রাধিয়া। গিরধারীর আধ হাত লম্বা জিভ আর দড়ির মত লিকলিকে গলাটার দিকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। কাপড়ের আঁচল দিয়ে চোখ দুটো জোরে ঘসে নিয়ে রাধিয়া যেন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আস্তে আস্তে বলে—মাপ কর, তোমাকে বাঁচাতে পারলাম না, মাপ কর।

তারপর চারদিকে তাকায় রাধিয়া। সমস্ত পৃথিবীকেই আড়চোখে একবার দেখে নিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—ছি ছি, একি চেহারা করে দিয়েছে রে। এর চেয়ে আমার বিষের হালুয়া যে ঢের ভাল ছিল রে!

বলতে বলতে কেঁদে ফেললো রাধিয়া।

কি বলছে? কি বলছে? ওয়ার্ডারেরা একে একে এসে রাধিয়াকে ঘিরে দাঁড়ালো।

এক আছাড় দিয়ে জলের কলসীটা ফটকের সামনে ফাটিয়ে দিল রাধিয়া। আঁচল থেকে শ্বেতকৌড়ি আর খই বের করে ছিটিয়ে দিল।

শেষ ব্রত সাঙ্গ হয়েছে রাধিয়ার। রাধিয়া আর ফিরে তাকালো না। ওয়ার্ডারদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চলে যাবার জন্য চেষ্টা করলো।

ওয়ার্ডারেরা ঘিরে ধরে- দাঁড়াও, পালিয়ো না।

রুষ্ট বাঘিনীর মূর্ত্তির মত হিংস্র দৃষ্টি তুলে রাধিয়া তাকায়। প্রশ্ন করে—কেন?

ওয়ার্ডার বলে—তোমাকে পুলিশের হাতে দিতে হবে।

রাধিয়া—কি দোষ ক'রলাম?

ওয়ার্ডার—তুমি আসামীকে বিষ খাইয়ে খুন করতে এসেছিলে।

রাধিয়া চীৎকার ক'রে কাঁদতে থাকে—তাতে তোদের কি রে মুখপোড়া। আমার স্বামীকে ফাঁসি থেকে বাঁচাতে এসেছিলাম রে মুখপোড়া।

শিবালয়

সম্মুখে শালের বন, পেছনে তাল আর খেজুরের ছোট ছোট কুঞ্জ, বড় সড়কটা এইখানে এসে ডানদিকে খুব জোরে বেঁকে গেছে। এই বাঁকের ওপর একটা বস্তি। বস্তির মধ্যে সব চেয়ে বড় ঘরটা হলো অনন্তরামের মুদির দোকান।

এই পথের মোড়, এই নতুন সরাই নামে ছোট বস্তিটার মধ্যেই অনন্তরামের দোকান। পথের উত্তরে ও দক্ষিণে পঁচিশ মাইলের মধ্যে এই একটি পান্থশালার ছায়া ও আলোক।

মুদির দোকান, কিন্তু শুধু চাল ডাল ছাতু আর কেরোসিন তেল নয়—জঙ্গলের পথে যত যাত্রী যায়, সবারই পক্ষে এই দোকানটি সকল প্রয়োজনের কল্পতরু। এখানে যা আছে, তা তো পাওয়া যাবেই। তা ছাড়া যা আশা করা যায় না, তা'ও পাওয়া যায়, শুধু অনন্তরামের কাছে অনুরোধ করলেই হলো।

যাত্রী বোঝাই বাস থামে। চা সরবৎ ছাতু, যা দরকার সবই পাওয়া যাবে। কেউ হয়তো জ্বরের জ্বালায় ধুঁকছেন, শুধু বিশ্বাস করে চাইলে অনন্তরামের কাছে দু'চারটে কব্‌রেজী বড়ি পাওয়া যাবে। কোন কোন সময় মোটর বাস পৌছতে অনেক দেরী হয়ে যায়। কোন নিষ্ঠাবান পাঁড়েজীর আহ্নিকের সময় পার হয়ে যেতে বসে। কিন্তু চাইলেই অনন্তরামের কাছে পূজোর উপকরণ সবই পাওয়া যায়--কোশা কুশী ঘট গঙ্গাজল।

হাঁা, পয়সা নেয় অনন্তরাম! কিন্তু পয়সা রোজগারের জন্যই সে সব সময় তৈরী হয়ে রয়েছে, একথা বিশ্বাস করা উচিত নয়। নইলে গ্রীষ্মের সময়, সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তৃষ্ণার্ত যাত্রীর জন্য কলসী ভরে এত জল সাজিয়ে রাখতো না অনন্ত। জল দিতে দিতে অনন্তরাম এত ক্লান্ত হয়ে পড়তো না। এই শ্রান্তির বিনিময়ে কিছুই সে পায় না। বরং, মাঝরাত্রে যখন ছোট প্রদীপের আলোকে সারাদিনের বিক্রীর হিসাব করতে বসে, তখনই শুধু আবিষ্কার করে অনন্ত—সারাদিন শুধু জল বিলোনই সার হয়েছে, বিক্রি ফাঁকিয়ে গেছে. পয়সার বাক্সটা ফাঁকা।

কিন্তু কে বলবে অনন্তরাম সুখী নয়? তার ছোট মুদিখানার দোকানটার মতই তার সুখের রূপ, সবই হাতের কাছে, সবই মুঠোর মধ্যে। তা ছাড়া, প্রমীলার দুটি কালো চোখের ডুবুডুবু বিস্ময় আর দুটি অভিমানভরা ঠোঁটের দিকে তাকালেই অনন্তরামের সুখী সংসারের আর একটা রূপ চোখে পড়ে। যেন মহাসাগরেরই একটি টুকরো। সীমা আছে কিন্তু বৈচিত্র্যের সীমা নেই। কত ঢেউ, কত কল্লোল! প্রমীলা যখন

অভিমান ক'রে কাঁদে, মনে হয় এ কান্না কখনো শেষ হবে না। যখন খুসী হয়ে হাসে, তখন সে হাসিরও যেন সীমা থাকে না।

আজও এইমাত্র হিসেব শেষ হয়, রাত্রি ঘনায়। প্রদীপের আলো মৃদুতর হয়। কিন্তু অনন্তরাম চুপ করে বসে থাকে। ঘরের ভেতর থেকে কোন সাড়া আসে না। প্রমীলা এতক্ষণে ঘুমিয়ে পড়েছে। ইচ্ছে ক'রে, অভিমান ক'রেই ঘুমিয়ে আছে। আজ আর কোনো সাড়া দেবে না প্রমীলা।

ঘরের ভেতর উঠে যেতে চায় না অনন্ত। পিলসুজের কাছেই হয়তো খাবারের থালাটা পড়ে আছে। একরাশ পুড়ে-মরা পোকা ছড়িয়ে আছে থালার ওপরে, চারিদিকে। এখন মনে হয় সংসার সাগরের সুখ শুধু লোনা জলের মত। অনন্তের চিন্তায় একটা অকারণ শাস্তি ও অপমানের জ্বালা যেন ধীরে ধীরে বেদনা ছড়াতে থাকে। এতদিনেও যেন প্রমীলাকে ঠিক চনতে পারা গেল না। প্রমীলা জীবনে কি চায়, কি সম্পদ সে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে, কোথায় তার শূন্যতা, কি তার না-পাওয়া আজও তার পরিচয় আবিষ্কার করে উঠতে পারেনি অনন্ত। মুখ ফুটে বলুক প্রমীলা—কি পেলে সে সুখী হবে?

কিন্তু জীবনে কোনোদিনই প্রমীলা বলবে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কত শত অচেনা নরনারী, কত যাত্রী, সাধু ও ভিখারী, অনন্তের কাছে কত জিনিস দাবী করে—কত আবদারের সুরে, কত আশীর্বাদের ভঙ্গীতে, কত কৃতজ্ঞতায়! কিন্তু প্রমীলা কিছু দাবী করে না। এক প্রমীলাই শুধু অনন্তের কাছে কিছু চাইতে পারে না।

প্রদীপের সলতে আর একটু উস্কে দেয় অনন্তরাম। গভীর রাত্রির অন্ধকারে শালবনের জংলী হিংসাগুলি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। মাঝে মাঝে একটা হালকা ঝড় ছুটছে। এক অখণ্ড স্তব্ধতার মধ্যে ক্লান্ত পৃথিবীর ফুসফুসটা হাঁসফাঁস করছে।

তুলসীদাসের রামচরিতখানা সামনে টেনে নেয় অনন্তরাম!

অজহুঁ কছু সংশয় মন মোরে
করহু কৃপা বিনাউ কর জোরে

··করজোড়ে মিনতি করি হে কৃপাময়, আজও যে আমার মনে কিছু সংশয় রয়ে গেছে।

বুঝি না. কিসের এই সংশয়? কেন মন অকারণে উদাস হয়ে যায়। এই তো মাত্র দুটি মাস. প্রমীলা হাসতে হাসতে এই সংসারে এসে দাঁড়ালো। কিন্তু কিসের এই মেঘ, অভিমানী চাঁদের মত প্রমীলা যার আড়ালে ক্ষণে ক্ষণে লুকিয়ে পড়ে? কিসের দুঃখ?

অনন্তের গলার স্বরের রেশ ধীরে ধীরে অবসন্ন হয়ে আসে, দুচোখে ঘুমের আরাম

স্বপ্নের মত নেমে আসে। ঘরের ভেতর প্রমীলার হাতের চুড়ির নিক্কন যেন আর একটা স্বপ্নের ভেতর ছট্‌ফট্‌ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে—তারই শব্দ শুনতে পায় অনন্ত।

আর একবার মনের শেষ উৎসাহ দিয়ে গলার স্বরকে সজীব করে তুলতে চায় অনন্তরাম—

রাকারজনী ভকতি তব
রামনাম সোই সোম

তোমার ভক্তি পূর্ণিমা রাতের মত; রামনামই তো চন্দ্র। না, মিথ্যা এ সংশয় অন্ধকার আসবে না, সব স্বচ্ছ উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। সব দেখতে পাবে তুমি।

এক শূন্যতার রহস্যকে ধরার জন্য, একটা আশ্বাস ও সান্ত্বনাকে অনন্তরামের মিষ্টি গলার সুর যেন চারদিকে অন্বেষণ করে বেড়ায়। শ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে। ঘুমিয়ে পড়ে অনন্ত।

সূর্য উঠবার আগেই যেন হঠাৎ একটা আলোর ধাঁধাঁয় জেগে ওঠে অনন্ত। রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে, ডাকের গাড়ী আসবার সময় হলো : পোড়া প্রদীপটা আবার নতুন শিখার আলোকে জলে উঠেছে, প্রমীলা উঠে এসেছে, অনন্তের হাত ধরে টানছে—ছি ছি, আশ্চর্য মানুষ তুমি! এভাবে আমাকে শাস্তি দিতে হয়?

একটু অপ্রস্তুত হয়েই অনন্ত উঠে বসে। কাঁচা ঘুমের নেশা তখনো চোখমুখের ওপর ছড়িয়ে রয়েছে। এলোমেলো চুল। অনন্তের মুখটা যেমন সুন্দর তেমনি করুণ দেখায়।

তার চেয়ে করুণ হয়ে ওঠে প্রমীলার মুখ। —ছি ছি তুমি কাল রাত্রে খাওনি। আমাকে এত জব্দ করে তোমার কি সুখ হয় বলতো?

অনন্তের ক্ষুব্ধ অন্ধ মনটা যেন আবার চক্ষুষ্মান হয়ে ওঠে। আবার তার ছোট সংসারের হৃদয়টার চেহারা নতুন ক'রে চোখে পড়ে। সেই ছোট সমুদ্রের মতই তো সেই নীল জল আর কত ঢেউ। প্রমীলার চোখ দুটো ছলছল করে, তবুও হাসছে, নীলজলের ওপর চাঁদের আলোর মতন। এই তো, সব চেয়ে সত্য যা, তা একেবারে মুখোমুখি দেখা যাচ্ছে।

প্রমীলা অনন্তরামের গলা জড়িয়ে ধরলো—ওঠ, ওঠ, এত রাগ করতে নেই, লোকে দুসমনের ওপরেও এত রাগ করে না।

প্রমীলার নজরে পড়লো তুলসীদাসের রামচরিতখানা সামনে পড়ে রয়েছে। বইটা খোলা। প্রমীলা বইটা বন্ধ করে দূরে সরিয়ে রাখলো! অনুযোগের সুরে বললো—এই বইটাই তো আমার দুসমন!

অনন্তরাম চমকে প্রমীলার দিকে তাকায়। প্রমীলা কিছুমাত্র অপ্রতিভ হয় না। বরং তার প্রতিবাদ আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে—আমার হাতের তৈরী খাবার খেতে তোমার

মনে পড়লো না, আমাকে একবার ডাকলে না। সারারাত তুলসীদাসের দোঁহা খেয়ে পেট ভরিয়েছ। আর এসব চলবে না বলে দিচ্ছি।

অনন্তরাম বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল—তাহলে কি হবে?

প্রমীলা—তাহলে আমিও আমার শিবালয় নিয়ে থাকবো।

অনন্তরাম আশ্চর্য হয়ে বললো—শিবালয়? কোথায় তোমার শিবালয়?

প্রমীলা—কৈলাস ভাইয়া বলেছে, আমার জন্যে ছোট একটি শিবালয় তৈরি করে দেবে। কত আর টাকা লাগবে? তুমি যদি না দাও, কৈলাস ভাইয়া দেবে।

অনন্তের মুখটা ধীরে ধীরে নিষ্প্রভ হয়ে আসতে থাকে। রহস্যটার কোন অর্থভেদ করতে পারে না। কবে এত শিবভক্ত হয়ে উঠলো প্রমীলা? কৈলাসই বা কবে থেকে এত শিবের মহিমা উপলব্ধি করে ফেললো?

প্রমীলা বললো—কথা বলছ না যে?

অনন্ত—আমার বলার কিছু নেই।

প্রমীলা—তাহলে আমার শিবালয় তৈরি করে দিচ্ছ?

অনন্ত—আমার সাধ্য নেই।

প্রমীলা—বেশ, তাহলে কৈলাস ভাইকে বলি।

অনন্ত প্রমীলার মুখের দিকে তীব্র দৃষ্টি ছড়িয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। একসঙ্গে যেন কয়েকশত প্রশ্ন সেই দৃষ্টির ভেতর সুতীক্ষ্ণ শরের মত ছুটাছুটি করছে। তবু একটু শান্তভাবেই বলে—শিবালয় চাও শিবপূজার জন্যে, না শিবকে অপমান করার জন্য?

প্রমীলা—এ কি রকম কথা হলো?

অনন্ত—বেচারা রামচন্দ্রজীর ওপর রাগ করেই কি শিবের পুজো ধরবে?

প্রমীলা চুপ করে রইল। অনন্ত বললো—এরকম ভুল করো না প্রমীলা। রামজী হোক বা শিবজী হোক, মন থেকে যাঁকে চাও, তাঁরই পুজো কর। কিন্তু আমার ওপর রাগ করে কিংবা…।

প্রমীলা—কিংবা, কি?

অনন্ত—কিংবা কৈলাস শিখিয়ে দিয়েছে বলেই তোমার শিবালয়ের সখ যদি হয়ে থাকে, তবে…

প্রমীলা একটু বেশী মাত্রায় উত্তপ্ত হয়ে উঠলো—কৈলাস ভাইয়া শিখিয়ে দিলে কি শিবজী খারাপ হয়ে গেল? কি এমন খারাপ কাজের কথা বলেছে?

অনন্ত—কিন্তু কৈলাস কি সত্যিই…।

প্রমীলা চোখ বড় বড় করে একটু বিদ্রূপের ভঙ্গীতে বললো—বুঝেছি তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না। তোমার মতে কৈলাস একটা মানুষই নয়। সে কি আর শিবভক্ত হতে পারে?

অনন্ত—কিন্তু সেদিনও তো দেখেছি কৈলাসের মুখে মদের গন্ধ।

প্রমীলা যেন দৃপ্তভাবে উত্তর দেয়—হ্যাঁ তোমার কথা সত্য! কিন্তু সে কৈলাস আর নেই। সে আর মদ খায় না।

অনন্তকে আরও আশ্চর্য করে দিয়ে প্রমীলা ঘরের ভেতর চলে গেল এবং পরমুহূর্তে কতকগুলি ছোট ছোট স্তোত্রের বই আর একটি বড় বই সশ্রদ্ধভাবে তুলে নিয়ে এসে অনন্তের সামনে রাখলো।—এই দেখ শিবসংহিতা, আর এইগুলি সব স্তোত্র আর ভজন!

ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়েছিল অনন্ত। তার সংশয়ভরা প্রশ্নের পাহাড়টা নিজের মিথ্যায় চূর্ণ হয়ে যাচ্ছে। কৈলাস আর সে-কৈলাস নয়। বোধ হয় প্রমীলা আর সে প্রমীলা নয়। সত্যি সত্যি জীবনের ধূলিকে এক নতুন বিশ্বাসে ভিজিয়ে দিয়ে ওরা শিবালয়ের পথটি তৈরি করে ফেলেছে। কৈলাসের মতন যে মানুষ দেবতার জন্য মদ ছেড়ে দিয়ে আত্মশুদ্ধি করেছে, সে-মানুষের নিষ্ঠাকে ও ত্যাগের মূল্যকে ছোট করবার মত সাহস খুঁজে পায় না অনন্ত।

অনন্তের চোখে পড়ে, প্রমীলার মাথায় বিনুনী নেই। এলোমেলো রুক্ষ চুল ছিন্ন স্তবকের মত ছড়িয়ে রয়েছে। সেই টিপ আলতা পান, গয়না আর রঙীন ওড়নার সমারোহ থেকে যেন বিদায় নিয়ে প্রমীলার মূর্তিটা রক্তশূন্য ও সাদাটে হয়ে গেছে।

তবে কি সত্যি সত্যিই যাত্রা সুরু হয়ে গেছে? তবে কি অনন্তের সংসারে রামচরিত-মানসের শুধু দোঁহাগুলিই চিরকাল গভীর স্বরে বাজতে থাকবে? ক্রীড়াচঞ্চল শিশু-রামের দুষ্টু পায়ের নুপুর এ-ঘরের আঙিনায় কখনো যে বেজে উঠবে, সে আকাঙ্ক্ষার কোন ছায়া নেই প্রমীলার মুখে। এক মহাশ্বেতার উদাস ছায়ামূর্তি প্রমীলাকে যেন অগোচর থেকে ইঙ্গিতে আহ্বান করছে। সরে যাচ্ছে প্রমীলা। ওর আত্মা শুধু উপোষ করে থাকতে চায়।

এই সাধনায় প্রমীলা একা নয়। কৈলাসের সাধকতা আর উপদেশের গুণেই এই নতুন শুচিতা লাভ করেছে প্রমীলা। ভাবতে গিয়ে সব গোলমাল হয়ে যায়; সমস্ত ঘটনাটা আরও জটিল হয়ে পড়ে। যেন তার ছোট সংসারে রামের কৃপা আর শিবের বরে এক অদ্ভুত সংঘর্ষ বেঁধেছে। কিন্তু বাধবার কথা তো নয়, শাস্ত্রেও একথা বলে না।

অনন্ত জিজ্ঞেস করে—কৈলাস কি আজ আসবে?

প্রমীলা—না, আজ তার সারাদিন উপোস। গয়া গেছে, কাল ফিরবে।

অনন্ত—কৈলাসের কারবার?

প্রমীলা—কারবারে আর মন নেই কৈলাস ভাইয়ের। ট্যাক্সিটাকে অন্য লোককর কাছে ঠিকে দিয়ে দিয়েছে।

কিছুক্ষণ যেন সমাধিস্থের মত চুপ করে বসে থাকে অনন্ত। ডাকগাড়ি পৌঁছে গেছে,

বাইরে হর্ণ বাজছে। প্রমীলা অনন্তের হাত ধরে আর একবার আগ্রহ করে টানলো—ওঠ, না খেয়ে রয়েছ। কিছু খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি কর, আমার অনেক কাজ আছে।

অনন্ত—কি কাজ তোমার?

প্রমীলা—আজ আমারও উপোস। গয়া থেকে যতক্ষণ না শিবপুজোর প্রসাদ আসবে, ততক্ষণ উপোস করে থাকতেই হবে। এরই মধ্যে পুজোর যোগাড়ও করে রাখতে হবে।

কৈলাস ভাইয়া নামে ও কাজে সত্যিই ভাই। নিকট-সম্পর্কে সে অনন্তরামের ভাই, দূর-সম্পর্কে প্রমীলারও ভাই। কিন্তু এই সম্পর্কের চেয়ে অনেক বড় তার আচরণ। কোথাও ফাঁকি নেই, নিজের সম্বন্ধে তার ধারণা রীতিমত ছোট।

জেলা বোর্ডের আঁকাবাঁকা অফুরাণ পথের পীচঢালা আবেগের মত কৈলাসের ট্যাক্সি হু হু করে দৌড়ে গড়িয়ে চলে যায়—উত্তর থেকে দক্ষিণে, দক্ষিণ থেকে উত্তরে। কখন যায় কখন আসে কোন ঠিকঠিকানা নেই। ওর স্থিরতা নেই, নিশ্চয়তা নেই। কৈলাসের জীবনটা যেন পথে পথে ছুটাছুটি করেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। বিশ্রাম নেবার মত কোন কঠিন ঠাঁই আজও সে খুঁজে পায়নি। আসুক ঝড় বা বর্ষা, মধ্যাহ্নের সূর্য জ্বলে উঠুক মাথার ওপর, শীতের হিম আর কুয়াশায় আড়ষ্ট হয়ে যাক্ সারা শালবন, কৈলাসের ট্যাক্সির কোন ভাবনা চিন্তা নেই। হঠাৎ হর্ণ বাজিয়ে, দীর্ঘ দৌড়ের মত্ততায় গোঁ গোঁ করে অরণ্যের বুক চিরে ছুটে আসে, এই পথের মোড়ে ক্ষণিকের জন্য বেগ একটু মন্দ হয়, তার পরেই আবার উধাও হয়ে যায়।

মোড়ের ওপর মাঝে মাঝে কৈলাসের ট্যাক্সি থামতো। কৈলাস কখনো গাড়ি থেকে নামতো না। গাড়ির ওপর বসে বসেই চেঁচিয়ে একটা ডাক দিত—কেমন আছ অনন্ত দাদা?

হেসে ইসারায় জবাব দিত অনন্ত—ভাল আছি।

অনন্ত জানে কৈলাস কখনো গাড়ি থেকে নেমে কাছে আসবে না। কৈলাসের গাড়ির ট্যাঙ্ক যেমন পেট্রল ভর্তি তেমনি ওর পেটে মদ আর তাড়ি টলমল করছে।

অনন্ত জানতো, ডাকলেও কাছে আসবে না কৈলাস। কৈলাস জানে, অনন্ত ডাকলেও সে তার কাছে যেতে পারে না; বড় সাদাসিধে সাত্ত্বিক মানুষ অনন্ত দাদা। ঐ ছোট দোকানের দৈনিক দু'চার টাকার বিক্রি, পিপাসার্তের জলদান আর রামচরিতমানসের আনন্দে মজে আছে অনন্ত। কেমন একটা শুদ্ধ মনুষ্যত্ব, সজ্জনতা আর শুচিতায় অনন্ত দাদা একটু অসাধারণ হয়ে আছে। মনের ঢেঁকুর তুলে এমন মানুষের কাছে এগিয়ে যেতে পারে না কৈলাস, এটা তার নিজের বিবেকেরই বাধা।

অনন্ত এক-একবার ভোরে উঠে দেখেছে, পথের ওপর গাড়ি থামিয়ে, দারুণ শীতে রাত্রিটা গাড়ির সীটের ওপরেই নিরাশ্রয় কুকুরের মত ঘুমিয়ে পার করে দিয়েছে কৈলাস, তবু অনন্তের ঘরে এসে আশ্রয় নেয়নি। অনন্ত রাগ করে ধমক দিয়েছে, অনুযোগ করেছে। কৈলাস হেসে চুপ করে থাকতো।

কৈলাসের ট্যাক্সি নতুন সরাইয়ের পথের ওপর অনেকবার থেমেছে আবার চলে গেছে! কিন্তু কিছুদিন আগে একবার থাম্‌তে গিয়ে যেন কিছুক্ষণের জন্য স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। দুপুরে এসে, চলি চলি করেও চলে যেতে অনেক দেরী হয়ে গেল। রাত্রি হয়ে গেল। অনন্তরামের ঘরেই খাওয়া দাওয়া সারলো কৈলাস। এই প্রথম।

এই প্রথম দেখলো কৈলাস, প্রমীলা বহিন আজকাল এখানেই থাকে।

তারপরেই আবার অনেক দিন কৈলাসের দেখা নেই! প্রমীলা হঠাৎ একদিন জিজ্ঞাসা করে—কৈলাস ভাইয়ার খবর কি? আর যে একদিনও এল না।

অনন্ত বলে—রোজই তো ওকে দেখতে পাই।

প্রমীলা আশ্চর্য হয়—কোথায়?

অনন্ত—এই পথেই যায়, রোজই ওর ট্যাক্সি যায়।

প্রমীলার চেহারাটা ঈষৎ বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। একটা উদাস নিশ্বাসকে লুকিয়ে ফেলবার জন্যই যেন বলে ওঠে রোজই যায়, তবুও আসে না।

অনন্ত—কি ক'রে আসবে বল? যা ভয়ানক মদ খায়! এই লজ্জাতেই আসতে পারে না। বড় দুঃখ হয় ওর জন্য। সবই তো ভাল, দেখতে শুনতে ভাল, পয়সাও ভালই রোজগার করে কিন্তু ঐ কতগুলি পাপ ঢুকেছে। একেবারে নষ্ট হয়ে যেতে বসেছে।

এত স্পষ্ট করে শুনেও প্রমীলার কাছে সমস্ত ঘটনার ঘৃণাগুলি যেন হঠাৎ একটা মমতার ছোঁয়ায় আরও হেঁয়ালি হয়ে ওঠে। আকাশের সূর্যটা যেন ক্ষণিকের দুঃখে নিভে যায়, জেলা বোর্ডের সড়কটা অন্ধকারের চাপে মুছে যায়। আর পথ দেখা যায় না। কৈলাসের আসা-যাওয়া বোধ হয় চিরদিন এই অন্ধকারের আড়ালেই দূরে সরে থাকবে।

কিন্তু অনন্ত জানে না, প্রমীলাও কল্পনা করতে পারেনি, এই আসা-যাওয়ার পথটুকু অটুট রাখার জন্যেই কৈলাস তখন যেন সবার অগোচরে সরে গিয়ে এক কঠোর তপস্যা করছে, মদ ছাড়বার চেষ্টা করছে। গয়া থেকে আসতে আসতে তিনবার মদের বোতল মুখের কাছে তুলে ধরে, তিনবার হাত কাঁপে, নিজেকে হুঁসিয়ার করে! তারপর আর মদ খেতে পারে না। বোতলটাকে ছুঁড়ে জঙ্গলের মধ্যে ফেলে দেয়।

ঝড়ের মত ট্যাক্সি নিয়ে ছুটে চলে কৈলাস। নতুন সরাই এগিয়ে আসে। গাড়ীর গতি অকারণে মন্থর হয়ে আসে। নতুন সরাই পৌছবার আগেই একবার হঠাৎ থেমে

যায়। কিছুক্ষণ ছটফট করে কৈলাস, তারপর আর সামলাতে পারে না। একটা মদের বোতল মুখের কাছে তুলে ধরে' ঢক্ ঢক্ করে খায়।

কৈলাসের প্রতি শোণিত কণায় ও স্নায়ুতে যেন নিজের দীনতার লজ্জা ও পালিয়ে যাবার নেশা চন্‌চন্ করে ওঠে। আবার স্টার্ট নিয়ে জোরে এক্সিলেটার চাপে কৈলাস। নতুন সরাইয়ের মোড়টুকু কয়েকটি মুহূর্তের মধ্যে পার হয়ে চলে যায়। অনন্ত দোকান ঘরের চৌকিতে বসে দেখতে পায়, ঐ কৈলাস চলে গেল।

নতুন সরাইয়ের ধুলোর ছোঁয়াচ বাঁচাবার জন্যই যেন কৈলাস এভাবে পালিয়ে যায়। কৈলাসের অদ্ভুত কাণ্ড কারখানা দেখলে তাই মনে হয়। কিন্তু অনন্ত জানে না, প্রমীলা জানে না, নতুন সরাইয়ের মাটিতে স্থির হয়ে দাঁড়াবার জন্য, জীবনের যত উদ্‌ভ্রান্ত পথিকতার মধ্যে এক সত্যিকারের বিশ্রান্তির গ্যারেজ খুঁজে বেড়াচ্ছে কৈলাস। একটা যোগ্যতার লাইসেন্স চাই, যেন তারই জন্য বড় কঠিন ট্রায়াল দিচ্ছে কৈলাস।

দূর গয়া রোডের ধারে, নতুন সরাইয়ের মোড়ে অনন্তের দোকান ঘরে বাতি জ্বলে। ওদিকে ধানবাদ ষ্টেশনের ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে গাড়ীর পর্দা ফেলে দিয়ে পেছনের সীটের উপর কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুমোবার চেষ্টা করে কৈলাস। মদ ছোঁয় না। নিকটেই বাজারে বীভৎস গলি-গুলির ভেতর ছোট ছোট কালিমাখা ল্যাম্পের পাশে এক একটা মেয়ে-মানুষের শরীর এখনো ফাঁদ পেতে সাগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আশা করে আছে এখুনি কৈলাস ওস্তাদ আসবে এই পথে। কিন্তু রাত গভীর হয়, ওস্তাদ কৈলাস আসে না।

গাড়ীর ভেতর উসখুস করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে কৈলাস। ভোর হয়। হাত মুখ ধুয়ে মুসাফিরখানায়, চায়ের দোকানে বসে পর পর চার কাপ চা খায় কৈলাস।

যেন রোগ থেকে সেরে উঠছে কৈলাস। এইবার যেন চোখ খুলে তাকাতে পারা যায়। তাকালেই পথ চেনা যাবে। যে'কটি যাত্রী পাওয়া যায়, ভাড়া যা-ই দিক্— এখুনি একটানা দৌড় দিয়ে সোজা পৌঁছে যাওয়া যায় নতুন সরাই। অনন্ত যদি ডাকে, সাড়া দিতে আর কোন বাধা নেই। হয়তো এইবার এগিয়ে যেতেও পারা যায়।

কৈলাসের ট্যাক্সি যাত্রী নিয়ে ছুটতে থাকে। বেলা বাড়ে, রোদ চম্‌কায়, বরাকর নদীর শুষ্ক বালিয়াড়ীতে অভ্রের রেণু ঝিক্‌ঝিক্ করে। রামভক্ত সাত্ত্বিক মানুষ অনন্ত এতক্ষণে পূজো সেরেছে, পাঠ শেষ করেছে, পথের পিপাসীদের জলছোলা খাওয়াবার প্রথম পালা শেষ করেছে। নতুন সরাই এসে পড়ে।

হঠাৎ কি ভেবে গাড়ীর স্পীড বাড়িয়ে দেয় কৈলাস। না, থামাতে পারা যাবে না। কোন লাভ নেই। অনন্তের ঘরটা বড় বেশী পবিত্র। কোন ধুলো নেই, ধোঁয়া নেই।

যেন দেবতাদের সঙ্গে বসে আছে অনন্ত। স্নান না ক'রে, শুদ্ধ না হয়ে ওখানে কোন মতেই যাওয়া উচিত নয়। তা না হলে অনন্তকে যেন অপমান করা হয়।

শুধু অনন্তকে কেন, প্রমীলাকেও অপমান করা হয়। সত্যি ওরা দু'জন যেন রাম সীতার মত। যেন ইচ্ছে করেই এই গরীবানার বনবাস গ্রহণ করেছে। অনন্তের মনটা এত নিষ্কলঙ্ক, এত সাদা--তাই তো প্রমীলা এত রঙীন। সকল মালিন্যের প্রবেশ নিষেধ এখানে।

তা ছাড়া, কৈলাস আজ বিশ্বাস করে, একা একা অনন্তের ঘরে ঢুকতে পারা যাবে না। এত শক্তি নেই তার। কোন দেবতার হাত ধরেই এগিয়ে যেতে হবে। নইলে অনন্তের ঘরের কপাট খুলবে না। খুললেও, এক মুহূর্ত টিকতে পারবে না কৈলাস।

ধুলো আর ধোঁয়ার একটি ছোট ঘূর্ণি ছুটিয়ে কৈলাসের ট্যাক্সি যেন তার সকল মালিন্যের পশরা নিয়ে পালিয়ে যায়।

অনন্ত প্রমীলাকে ডেকে আর একবার বলে -দেখলে কাণ্ড, কৈলাস আজও এল না।

প্রমীলা বলে -একটা কথা জিজ্ঞাসা করি?

অনন্ত—বল।

প্রমীলা—তুমি কি ওকে কখনো নিন্দে টিন্দে করেছ?

অনন্ত—কখনো না। নিন্দে করবো কেন? ও তো নিজের লজ্জায় নিজেই ভয়ে ভয়ে পালিয়ে বেড়ায়।

প্রমীলা—চিরকাল কি এভাবে পালিয়ে বেড়াবে?

অনন্ত—না। যেদিন রামজীর কৃপা হবে, সেদিনই সুস্থির হবে। সব ভুল বুঝতে পারবে।

রামজীর কৃপা নয়, মহাদেবের আশীর্ব্বাদ পেয়ে গেল কৈলাস। গয়া পৌঁছে ধর্মশালার আঙ্গিনায় ট্যাক্সিটাকে রেখে দিয়ে পথে বের হলো। এক জোড়া গরদের চাদর আর ধুতি কিনলো। সহরের ভীড় ছাড়িয়ে যেন একটা সঙ্কল্পের আবেগে ধীরে ধীরে পথের পর পথ পার হয়ে বিরাট ফল্গুর বালিয়াড়ীর ওপর এসে দাঁড়ালো। অস্ত যাবার আগে পশ্চিমের সূর্য ঠাণ্ডা ও লালচে হয়ে উঠেছে। বালিয়াড়ীর ওপর দিয়ে হেঁটে হেঁটে এক জায়গায় এসে থামলো কৈলাস। দু'হাত দিয়ে বালি খুঁড়ে একটা গর্ত তৈরী করলো। যেন এত দিনের ধোঁয়া আর ধুলোয় ভরা জীবনের সমাধি খুঁড়ছে কৈলাস।

সূর্য্য ডুবে গেছে। চারিদিক আবছা হয়ে গেছে। কৈলাস হাত দিয়ে ছুঁয়ে দেখলো, তার সমাধির কূপ এতক্ষণে ঠাণ্ডা জলে ভরে উঠেছে।

স্নান সেরে নিয়ে কৈলাস আবার ফিরে চললো। পথের ওপর একটা মন্দিরের সিঁড়ির কাছে আলো জ্বালিয়ে একটা লোক হরেক রকম ধর্মের বই বিক্রী করছিল। কৈলাস কিছুক্ষণ দাঁড়াল, কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলো। তারপরই একটি শিবস্তোত্রের বই কিনে ধর্মশালার দিকে ফিরে চললো।

এর পর আর কৈলাসকে ডাকতে হয়নি। কৈলাসের ট্যাক্সি এসে নতুন সরাইয়ের পথের মে ডে নিয়মমত এসে থেমে গেছে। গাড়ী থেকে নেমে সোজা অনন্তের ঘরে এসে বসেছে কৈলাস। গল্প হয়, তর্ক হয়, সন্ধ্যা পার হয়ে যায়। তবু কৈলাসকে বসে থাকতে হয়, যতক্ষণ না প্রমীলার রুটী তৈরী সারা হয়। রুটী-গুড় খেয়ে কৈলাস আবার চলে যায়।

এ পথে আসতে যেতে আর থামতে কোন বাধা নেই। এমন কি অনন্ত যখন ঘরে থাকে না, তখনো কৈলাস অনায়াসে ঘণ্টার পর ঘণ্টা এখানে এসে বসে থাকতে পারে। সব ভীরুতার সঙ্কোচ অতীতের ধুলো আর ধোঁয়ার মতই উপে গেছে। কৈলাসের বুকের ভেতর সকল শূন্যতা এক মন্ত্রধ্বনির গুঞ্জরণে ভরে আছে।

কোন ভয় নেই কৈলাসের, কোন অপরাধের কুণ্ঠা নেই তার মনে। বড় কঠিন পরীক্ষা সহ্য করে, যোগ্য হয়ে, তৈরী হয়ে, তবে সে এসেছে।

ধানবাদ ট্যাক্সি ষ্ট্যাণ্ডে আজও যাত্রীর অপেক্ষায় বসে থাকতে হয় কৈলাসকে। কিন্তু এই সময়টুকুও বৃথা যায় না। সাটের পাশে শিবস্তোত্রটি রাখা আছে। ষ্টিয়ারিংয়ের ওপর শিবস্তোত্রের গ্রন্থটি খুলে ধরে কৈলাস। মাথাটা ঝুঁকিয়ে একমনে পড়তে থাকে।

কৈলাসের বেয়ারা বিবেকটা যেন একেবারে জব্দ হয়ে গেছে। মনের এই ক্ষমাহীন দেবতাটি ভ্রূকুটি করে এখন আর একথা বলতে পারে না—অন্যায় করছো কৈলাস।

কৈলাসের অন্তর জুড়ে এক পরম আশ্বাসের বাতাস বইতে থাকে—হে স্মরহর, তুমি শ্মশানে খেলা ক'রে বেড়াও, পিশাচেরা তোমার সহচর, চিতাভস্ম তোমার অনুলেপ, নরপালসমূহ তোমার মালা। তোমার আচরণ এই রকমই অপবিত্র। কিন্তু তবুও হে বরদ শিব, যে তোমাকে স্মরণ করে তার কাছে তুমি মঙ্গল স্বরূপ!

কৈলাস আশ্চর্য হয়, এর চেয়ে আপন কোন্ দেবতা আছেন? ঘৃণিতের হাত ধরে বুকে টেনে তুলবার জন্য তিনি স্বয়ং ঘৃণার সাজ পরেছেন। তবু ইনিই তো চন্দ্রোদ্ভাসিত-শেখর, ইনিই তো গঙ্গাফেনসিতাজটা। এমন দেবতা আর কে আছেন যার নয়নে বহ্নি স্ফুরিত হয়?

চারদিকের চাঞ্চল্য ও কলরবের মধ্যেও কৈলাস যেন এক নিবিড় প্রশান্তির আস্বাদে মুগ্ধ হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে শিবভক্তের মনের আকাশে একটা নতুন গর্বের ছটা জেগে উঠতে থাকে। রামসীতার যুগলরূপের মধ্যে কি এমন বিস্ময় আছে? ভয় পাবার, বিহ্বল হবার, হিংসা করার কি আছে? এর চেয়ে বড় রূপ কি আর নেই?

কৈলাসের বুকের শোণিত হঠাৎ উষ্ণ হয়ে ওঠে। পৃথিবীর যেখানে যত যুগল মূর্তি আছে, তার সব রূপ রং আর আভরণ আজ চূর্ণ হয়ে যাক্। বড় শাস্ত, বড় নিষ্ঠুর, বেমানান আর বে-আইনী এই মূর্তিগুলি। শুধু হরগৌরী ছাড়া আর কোন মিলনের মূর্তিকে আজ পূজো করতে চায় না কৈলাস।

কোথায় তুমি হরগৌরী, পার্বতী পরমেশ্বর। সেই অঙ্গে অঙ্গে বাঁধা রূপ। অর্ধ অঙ্গে কস্তুরীচন্দন, অর্ধঅঙ্গে শ্মশানভস্ম—অর্ধাঙ্গে মন্দারমালা, অর্ধাঙ্গে করোটিমালা—অর্ধাঙ্গে দিব্যাম্বর, অপরার্ধে উলঙ্গ। অর্ধাঙ্গ স্বর্ণ চম্পকের বর্ণ, অপরার্ধ কর্পূরধবল—অর্ধাঙ্গে মেঘশ্যামল কুন্তল, অপরার্ধে বিভূতি ভূষিত জটা। শিবের অর্ধ এবং শিবার অর্ধ নিয়ে রূপের ঈশ্বর এই মূর্তিতে পূর্ণ হয়ে উঠেছেন।

প্রমীলা উপোস করেই দিনটা কাটালো। রাতটাও উপোষে কাটলো। ভোর বেলা গয়া থেকে ফিরলো কৈলাস। হাতে একটা ঠোঙায় কতকগুলি ফুল বেলপাতা আর প্রসাদ। কৈলাসের কপালে একটা ছাইয়ের টিপ, গরদের চাদর গায়। শালবনের মাথার ভীড় ঠেলে সূর্য মাত্র ওপরে উঠেছে, কৈলাসের মুখের ওপর আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

কী শাণিত পবিত্র ও ভাস্বর হয়ে উঠেছে কৈলাসের মূর্তিটা। সারা মুখটা ঝক্ঝক্ করছে। কৈলাসের দিকে তাকিয়েই অনন্তর বুকটা হঠাৎ টিপ টিপ করে উঠলো। কোথা থেকে একটা ভয়ার্ত স্পন্দন অনন্তের দেহমনে ঠেলে উঠছে—চেষ্টা করেও কিছুক্ষণের মত সুস্থির হতে পারলো না অনন্ত।

প্রমীলাও উঠে এসে বাইরে দাঁড়িয়েছিল। অনন্ত আবার ভালো করে দেখলো, প্রমীলার মাথার চুলগুলি কত রুক্ষ হয়ে উঠেছে। গায়ে কোন গয়না নেই, শুধু হাতে দুগাছি চুড়। প্রমীলার চেহারাটা যেন কৃশ হয়ে আরও প্রখর হয়ে উঠেছে, চোখ দুটো এক নতুন অভ্যর্থনার আনন্দে চিক্ চিক্ ক'রে হাসছে।

কৈলাস এগিয়ে আসছিল, অনন্ত এগিয়ে যাচ্ছিল। অনেকগুলি প্যাসেঞ্জার বাস মোড়ের ওপর এসে পৌঁছে গেছে। যাত্রীদের কলরব শোনা যায়।

কৈলাসের দিকে তাকিয়ে অনন্ত একটু ব্যস্তভাবেই বললো—শুনলাম, কাল থেকে উপোস করে রয়েছ। একটু জিরিয়ে নাও, না খেয়ে দেয়ে চলে যেও না।

কথাগুলি বলেই অনন্ত যেন ছট্ ফট্ করে দৌড়ে চলে গেল। মোড়ের কাছে পৌঁছে তার প্রিয় জলসত্রটির কাছে দাঁড়ালো। একটা ঘটিতে জল ঢেলে নিয়ে তৈরী হলো অনন্ত।

তৃষ্ণার্তেরা একে একে ছুটে আসছে। বালক বৃদ্ধ যুবক যুবতী। কেউ অঞ্জলি ভরে জল খায়। কেউ পাত্রপূর্ণ করে নিয়ে চলে যায়। কেউ বা সাহস করে পা ধোয়ার জন্য লজ্জিতভাবে একটু জল চায়। অনন্ত এক ঘটি জল নিয়ে তার পায়ের ওপরেই ঢেলে

দেয়। লোকটি অপ্রস্তুত হয়ে পা সরিয়ে নিয়ে কুণ্ঠিতভাবে বলে—থাক্ থাক্। অনন্ত বলে—নাও আর একটু জল নাও, ভাল করে ধোও।

একটা জয়ধ্বনির উল্লাস। সকাল বেলায় শালবনের শান্তি শিউরে দিয়ে একটা ব্যাকুল হর্ষ যেন দক্ষিণ দিক থেকে ছুটে আসছে। কৌতূহলী হয়ে অনন্তরাম দূর পথের বাঁকের দিকে তাকিয়ে রইল।

একটু পরেই তাদের দেখা গেল। সড়কের ঢালু ধরে তারা যেন ঊর্ধ্বলোক থেকে চলে আসছে। দল বেঁধে তারা আসছে। সম্মুখে একটা বড় পতাকা উড়ছে। দু'পাশে শালবনের সবুজ, পায়ের নীচে শিশিরভেজা কালো পীচঢালা পথ, মাথার ওপর নতুন রোদের আভা—তারই মধ্যে এই অভিযাত্রী জনতার খদ্দরের সাজ যেন শুভ্রতায় প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে।

মোড়ের যাত্রীরা চেঁচিয়ে উঠল - এসে গেছে এসে গেছে। এখানেও তুফান পৌঁছে গেল।

জনতা মোড়ের কাছে পৌঁছে গেল। বার বার জয়ধ্বনি করলো। সবাইকে ডাক দিল—চল চল, সবাই চল।

স্বরাজের লড়াই সুরু হয়ে গেছে। জনতা এক মুহূর্তও অপেক্ষা করলো না। একটা মরণপণ প্রতিজ্ঞা যেন ঝড় হয়ে ছুটে চলে গেল, তসীল কাছারীর দিকে। পরশাসনের যত গ্লানি আর গ্লানির চিহ্নকে আজ ওরা অগ্নিসাৎ করবে। এক যজ্ঞের আগুন জ্বালতে ওরা চলে যাচ্ছে।

জনতা চলে গেল। অনন্তরামের কানে তখনো জনতার মিলিত কণ্ঠের গানের রেশ যাদুমন্ত্রের মত বাজছিল।—জান হাজির হ্যায় অগর কর্ দো ইসারা গান্ধী, হে গান্ধী তুমি যদি মাত্র ইসারা কর, তাহ'লেই এ প্রাণ উৎসর্গ করতে আমরা প্রস্তুত আছি।

এ যে তারই রামচরিতমানসের বাণী। কত বার কী নিবিড় বিশ্বাসে, কি শ্রদ্ধালসিত স্বরে এই আত্মদানের গান গেয়েছে অনন্তরাম।

হ্যাঁ, শুধু গান গাওয়াই সার হয়েছে। কিন্তু দেখে হিংসে হয়, এই জনতা যে নিজেরাই গান হয়ে গেছে। গান্ধীজী, গান্ধীজী—রামজীর আত্মাটি বুঝি নতুন করে আবির্ভূত হয়েছেন। কী ভাগ্যবান তারা, যারা তাঁর পুণ্য স্পর্শ পেয়েছে, তাঁর বাণীতে আত্মহারা হয়ে গেছে।

অনন্তরামের প্রতিদিনের অভ্যস্ত কাজের জীবনটা যেন আজকের ঝড়ে শুকনো ডালপালার মত ভাঙ্‌বার আগে মড়্‌মড় করে বেজে উঠলো।

তবু কাজ করে যায় অনন্ত। মোটর বাস, মোষের গাড়ী এসে মোড়ের ওপর থামে। পাল্‌কি থামিয়ে ক্লান্ত বেহারার দল হাঁপায় আর হাওয়া খায়। দোকানের চৌকীতে বসে

অনন্তরাম বিক্রী করে—আটা ছাতু কেরোসিন কুইনিন, আমলকীর আচার, ভাস্কর লবণ, হরধনুর্ভঙ্গের ছবি। এই বিকিকিনির তুচ্ছ সংসার ক্রমেই নিরাস্বাদ হয়ে আসছে, মোটেই ভাল লাগে না। তবু যেন অন্যমনস্কের মত এই ধরাবাঁধা কাজের ওপর শুধু হাত ছুঁইয়ে চলে যায় অনন্ত, শুধু নিজের মনকে হাতের কাছে পায় না।

জীবনে এই প্রথম, এক নিঃস্বতার অভিমানে অনন্তরামের চিরকেলে আশা বিশ্বাসের সত্তাটি যেন কুণ্ঠিত হয়ে রইল। রামচরিত মানস তো পরশমণি, যার ছোঁয়ায় সব ভাবনা সোনা হয়ে যায়। কিন্তু কই? মন যে তার ধুলো হয়ে ঝরে পড়ছে। যেন ঘুণ ধরে গেছে।

কংগ্রেস কি জয়! আর একটা জয়রোলের স্রোত পথের ওপর আচম্কা কোথা থেকে এসে গড়িয়ে পড়ে। বিহ্বলের মত অনন্তরাম পথের মোড়ে তাকিয়ে থাকে, জনতার উল্লাস যেন নতুন সরাইয়ের সকল দীনতার ধূলিলজ্জাকে মুছে দিয়ে চলে যায়। ধীরে ধীরে মোড়ের ওপর একটা ভীড় জমে উঠতে থাকে। অনন্ত দেখতে পায়—ঐ রঘুনাথ আহীর, ঐ বুড়ো মাহাতো কাশীনাথ। ঐ যে তাদেরই সঙ্গে রাজপুত বাড়ীর সব ছেলেগুলিই এসে দাঁড়িয়েছে। আরও আসছে। কী অদ্ভুত কাণ্ড! যেখানে শুকনো ডাঙ্গা ছিল, হঠাৎ কোন প্লাবনে সেখানে যেন জলে ভরে উঠলো। আরও দেখতে পাওয়া যায়, সেই জলে ঢেউ জাগছে, মত্ত ফেনিল ঢেউ। নয়াসরাইয়ের জনতা নীল আকাশের দিকে হাত ছুঁড়ে জয়ধ্বনি করলো—স্বতন্ত্র ভারত কি জয়!

অনন্তরাম জানে, লড়াই সুরু হয়ে গেছে। কিন্তু কী মনোমোহা এই লড়াইয়ের রূপ! স্তবে গানে শুচিতায় ও শুভ্রতায় এক অনুপম উৎসবের মত।

অনন্তরাম তাড়াতাড়ি হাতের কাজ সেরে ফেলতে চায়। ওরা যেন চলে না যায়। একটু অপেক্ষা করুক। আর কিছুক্ষণ। আর একটু সময় দিক অনন্তরামকে। মন স্থির করে নিক্ অনন্তরাম। কিসের এক ভীরুতায়, কেমন এক লজ্জায়, কতগুলি একেবারে নতুন অভিমানে ও মায়ায় তার মন আজ এই ঘরের ভেতরেই যেন হারিয়ে গেছে। ছুটে চলে যাবার আহ্বানও পৌঁছে গেছে, সম্মুখে কোন বাধা নেই। এক অবারিত ও আলোকিত পথ। তবু…।

তবু পেছন থেকে যেন একটা অন্ধকারের শিকল অনন্তরামের পা দুটোকে জড়িয়ে জড়িয়ে ধরেছে। প্রমীলাকে চিনতে পারা গেল না, আরও দুর্বোধ্য কৈলাস। আজ ওরা শুধু একবার অনন্তরামের সম্মুখে এসে দাঁড়াক, স্পষ্ট করে নিজের মুখেই বলে দিক, ওরা কে? তারপর আর কোন বাধা থাকবে না অনন্তরামের। পথের মোড়ে ত্রিবর্ণ পতাকা দুলছে, এক দৌড় দিয়ে এই রঙ্গীন যুদ্ধের আঙিনায় ছুটে চলে যেতে পারে অনন্ত।

ঘরের ভেতর থেকে ব্যস্তভাবে বের হয়ে এল প্রমীলা—ভাল ধূপ আছে?

অনন্ত—কেন?

প্রমীলা—পাঠ সুরু হয়েছে, ধূপ শেষ হয়ে গেছে, আর ও চাই।

অনন্ত—কিসের পাঠ?

প্রমীলা কৈলাস ভাই শিব স্তোত্র পড়ছে। তুমিও এস, একবার শুনে যাও, কি সুন্দর পড়ছে কৈলাস ভাই।

এক মুঠো ধূপ তুলে নিয়ে প্রমীলার দিকে এগিয়ে দিল অনন্ত। তারপরেই অন্য দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

ধূপ হাতে নিয়ে ব্যস্তভাবে চলে যেতে গিয়েই প্রমীলা থমকে দাঁড়ালো। এক পা দু'পা করে এগিয়ে এসে অনন্তরামের একেবারে গা ঘেঁষে দাড়ালো। অনন্ত আশ্চর্য হয়ে প্রমীলার দিকে মুখ ফেরাতেই দু'হাত দিয়ে অনন্তের মাথাটা বুকে জড়িয়ে ধরলো প্রমীলা —এত গম্ভীর হয়ে বসে আছো কেন? কি হয়েছে?

অপরাধীর মত সঙ্কোচে হঠাৎ বিব্রত হয়ে অনন্ত উত্তর দিল—না না, সত্যই কিছু হয়নি।

প্রমীলা হেসে হেসে চোখ দু'টো বড় ক'রে নকল শাসনের ভঙ্গীতে বললো—সত্যি বলছো তো?

অনন্ত - হ্যাঁ।

ব্যস্তভাবেই আবার ঘরের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল প্রমীলা।

ধীরে ধীরে একটা স্বাচ্ছন্দ্যের টানে কিছুক্ষণ ঘুরে ফিরে পায়চারী করে অনন্ত। বুকের ভেতর যেন এতক্ষণ একটা নির্লজ্জ অবিশ্বাসের বাতাস আটকেছিল। মনের কপাট খুলছে, বদ্ধ হাওয়ায় গ্লানি উড়ে সরে যাচ্ছে। প্রমীলাকে একবার ডাকতে ইচ্ছে করছিল অনন্তরামের।

কেন?

প্রশ্ন করলে এখনো ঠিক উত্তর দিতে পারবে না অনন্ত। নিত্য দোকানদারীর স্থাবর জীবন যেন নিছক স্থুস্থিরতার পাপে মরচে ধরে গেছে। ওদিকে রামচরিতের সব মহিমা আজ পুঁথির বন্ধন ছিঁড়ে হিন্দুস্থানের আকাশে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে। ঐ শালবনের চঞ্চল সবুজে, ঐ ঘূর্ণিহাওয়ার আবেগে, ঐ জয়ধ্বনির গর্বে। প্রমীলাকে একবার আশীর্বাদ করতে চায় অনন্ত।

কেন?

এখনো স্পষ্ট বুঝতে পারে না অনন্ত। মোড়ের ওপর জনতার সামনে দাঁড়িয়ে রাজপুত বাড়ীর সব চেয়ে ছোট ছেলেটা বক্তৃতা করছিল—এই ঝাণ্ডা আর এই বুক, এই আমাদের সম্বল। বাস্ এইবার আমরা রওনা হয়ে যাই। এই ঝাণ্ডার গায়ে আমাদের বুকের রক্তের ছিটে লাগবে। স্বরাজ নিতে হবে, আজ প্রাণের হিসাব করতে নেই। চলো চলো চলো…।

চলে যেতেই হবে। অনন্তরাম যেন এতক্ষণে মনের ভেতর একটা প্রশ্নের উত্তর শুনতে পায়। কিন্তু, কিন্তু আরও অনেক প্রশ্ন যে রয়ে গেল। এখনো উত্তর পাওয়া গেল না।

যাবার আগে রামচরিতখানা আর একবার কোলের উপর তুলে নিল অনন্তরাম। যাত্রার আগে যেন এক রত্নপেটিকা খুলে তার পথের সম্বল বেছে বেছে তুলে নিচ্ছে।

গুন্ গুন্ করে পড়তে থাকে অনন্ত, যেন একটা তন্দ্রাচ্ছন্ন স্বর।

রাম সিন্ধু ঘন সজ্জন ধীরা

চন্দন তরু হরি সন্ত সমীরা

রামচন্দ্র তুমি সমুদ্রের মত, সজ্জনেরা মেঘ। হে রাম তুমি চন্দন তরু, সজ্জনেরা বাতাস।

হ্যাঁ, মোড়ের উপর জনতার মূর্তি প্রতিজ্ঞায় গম্ভীর হয়ে উঠেছে। ওরা মেঘের মত। হ্যাঁ, কোথাও যেন চন্দন তরুর মাথায় ঝড়ের মন্ত্র লেগেছে, ওরা বাতাস হয়ে ছুটে যাচ্ছে।

মনে মনেই প্রমীলাকে আশীর্বাদ করে অনন্ত। তাকে চিনতে পারেনি অনন্ত, বড় ভুল হয়েছিল। মন বড় নোংরা হয়ে গিয়েছিল। বড় অহঙ্কার ছিল মনে মনে। আজ হৃদয়ের সব বিশ্বাস সঁপে দিয়ে অনন্ত পড়তে থাকে।

ভয়উ মনোরথ সুফল তব

শুনু গিরিরাজকুমারী

পরিহরু দুসহ কলেস সব

অব মিলিহহিঁ ত্রিপুরারি।

গিরিরাজকুমারী শোন, তোমার ইচ্ছা সফল হয়েছে। এখন সকল দুঃসহ ক্লেশ ছেড়ে দাও, শিবকে পাবে।

তাড়াতাড়ি পুঁথির পাতার পর পাতা উল্টে যায় অনন্ত। রামজীর কৃপা যেন তার জীবনে এতদিনে সত্য হয়ে উঠেছে। সব প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাচ্ছে, সব সংশয় একে একে দূরে সরে যাচ্ছে।

...ভরত হৃদয় সিয়া রাম নিবাস্

এই কি তিমির জহঁ তরণি প্রকাস্

ভাই ভরতের হৃদয়ে সীতারাম বাস করে। যেখানে সূর্য আছে, সেখানে কি অন্ধকার থাকতে পারে?

কৈলাস ভাই! আবেগ রোধ করতে না পেরে চেঁচিয়ে ডাকতে যায় অনন্ত। ছি ছি, কী ভয়ানক ভুল, কী নোংরা মনের প্রবঞ্চনা! ভাই ভরতকে এতদিন চিনতে পারেনি অনন্ত।

অনন্তের চেয়ে বেশী সুখী কেউ নেই। তার সীতা আছে, ভরত আছে। অন্ধ

হয়েছিল বলে এতদিন দেখতে পায়নি, তার ছোট সংসারে রামচরিতের পুণ্য জীবন্ত হয়ে রয়েছে।

করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! পথের মোড়ে আর একটা ধ্বনি, আর একটি জনতা, আর একটা নতুন জলপ্রপাতের হর্ষ!

অনন্তরামের গলার স্বরও নতুন এক আবেগের বন্যায় একেবারে ভেসে যায়।

…রাম কাজ কারণ তনুত্যাগী

হরিপুর গয়উ পরম বড় ভাগী।

রামের কাজে জীবন বলি দাও। তুমি হরিধামে যাবার মত পরম ভাগ্য লাভ করবে। রামচরিতখানা বন্ধ করে রেখে দোকানের চৌকী থেকে একটা লাফ দিয়ে নেমে পড়ে অনন্ত। খড়ম জোড়া পরে নিয়ে সবুজ ঘাসের ওপর দিয়ে দৌড় দেয়। পথের মোড়ে পৌঁছে যায়। ত্রিবর্ণ পতাকার প্রমত্ত ছায়া অনন্তরামের মাথার ওপর যেন এক চরম আবদারের দাবীতে হুটোপুটি করতে থাকে।

শিবপুরাণের একটা অধ্যায় পড়ছিল কৈলাস। ঘরের ভেতর একটা জায়গা পরিষ্কার করে নিকিয়ে দিয়েছে প্রমীলা। তারই ওপর আসন পেতে কৈলাস শান্তভাবে বসেছিল। সামনে একটু তফাতে মুখোমুখি বসেছিল প্রমীলা। ঘরের ভেতর রোদের আলো এসে পড়েছে, তবু একটা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছিল। ধূপ পুড়ছিল। প্রদীপ শিখার চঞ্চলতায় একটা দুঃসহ পবিত্রতার জ্বালা যেন স্বর্ণাভ ছায়ার মত কৈলাসের চোখে মুখে ছড়িয়ে পড়ছিল।

কৈলাস পড়ছিল—সেই মহাদেবই ভাস্কর, সেই মহাদেবীই প্রভা। এই শঙ্কর-শঙ্করীই আকাশ ও পৃথিবী, সমুদ্র ও বেলা, বৃক্ষ ও লতা…।

প্রমীলা হঠাৎ অনুরোধ করে—একটু থামুন কৈলাস ভাই। আমি এখনি আসছি।

পড়া থামিয়ে কৈলাস প্রশ্ন করে—কেন?

প্রমীলা ব্যস্তভাবে দাঁড়িয়ে বলে—জল ফুটছে, ডাল ছেড়ে দিয়ে আসি, নইলে রান্না দেরী হয়ে যাবে। ডাকগাড়ী এসে গেলে ওর আবার খাবার সময় হবে না।

প্রমীলা চলে যায়। কৈলাস বইটা একেবারে বন্ধ করে দিয়ে চুপ করে বসে থাকে। একমুঠো ধূপের গুঁড়ো নিয়ে, আগুনের সরার ওপর ছড়িয়ে দেয়। ভুর ভুর করে সুরভিত ধোঁয়ায় ঘরের বাতাস আচ্ছন্ন হতে থাকে। কৈলাসের মূর্তিটা যেন তার মধ্যে অত্যন্ত অবাস্তব ও অস্বাভাবিক হয়ে ওঠে।

কিছুক্ষণ পরেই ফিরে আসে প্রমীলা। নিজের জায়গাটিতে বসে। আগ্রহ ক'রে বলে—পড়ুন।

শিবপুরাণের অধ্যায়টা খুঁজে বের করতে অনেক সময় লাগে কৈলাসের, হাতটা অকারণে কাঁপতে থাকে।

হঠাৎ প্রমীলার দিকে চোখ তুলে তাকায় কৈলাস। দৃষ্টিটা বড় প্রখর, শিবভক্তেরও চোখে যেন আগুনের আভা ঝলকায়।

কৈলাস বলে—শিবের আরাধনায় কোন ফাঁকি রাখতে নেই প্রমীলা। তারপরেই পড়তে আরম্ভ করে কৈলাস—যিনি ভূমি নহেন, জল নহেন, আকাশ নহেন। যাঁর তন্দ্রা নেই, নিদ্রা নেই, গ্রীষ্ম নেই, শীত নেই। যাঁর দেশ নেই, ঘর নেই, সেই শিবকে...।

কৈলাসের গলার স্বর যেন এক কান্নার আবেগে ভেঙে পড়তে চায়। প্রমীলা স্থির দৃষ্টি তুলে দেখতে থাকে, পাঠ শোনে।

কৈলাস যেন ব্যাখ্যা করার জন্যই বলে—তার কিছু নেই প্রমীলা। সে একেবারে শূন্য।

প্রমীলা বলে—পড়ুন।

কৈলাস পড়ে—সে শুধু বিষপান করে, তাই সে নীলকণ্ঠ। সাপ তার গলা জড়িয়ে ধরেছে। তবু তারই বাম অঙ্গের শোভা হয়ে রয়েছেন স্বয়ং পার্বতী।

পড়তে পড়তে কৈলাস হঠাৎ থেমে যায়। অনেকক্ষণ মুখ নীচু করে বসে থাকে।

প্রমীলা বলে—পড়ুন।

কৈলাস তাকায় প্রমীলার দিকে। অন্তরেব সমস্ত বিশ্বাস চরম আবেদনের মত ফুটে ওঠে। বুকভরা আগ্রহ নিয়ে কৈলাস ডাকে—কাছে এস প্রমীলা। পাশে বসো।

প্রমীলা সেইখানেই নিশ্চলভাবে ব'সে থেকে বলে—পড়ুন।

একটা ধোঁয়ার পুঞ্জ কৈলাসের মুখের ওপর দিয়ে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে উড়ে চলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে কৈলাসের মূর্তিটাকেও বদলে দিয়ে গেল। যেন কৈলাসের মাথায় আগুন ধরে গেছে। মুখটা একেবারে কালো হয়ে গেছে। চোখের দৃষ্টিটা নীরব হাহাকারের মত, এক রিক্ত জগতের চারিদিকে অসহায়ের মত ছুটাছুটি করছে।

এত সেয়ানা শক্ত মানুষ কৈলাস যেন ছেলেমানুষ হয়ে গেছে। আবোল তাবোল বক্‌ছে—আমি শিবের পূজা কেন করি, তা আমি নিজেই জানি না প্রমীলা। বোধ হয় জীবনে কোন গৌরীর মূর্তিকে স্বচক্ষে দেখতে পাবো, সেই লোভে ..।

প্রমিলার নিশ্চল মূর্তিটা যেন একটা আঘাত লেগে আচমকা নড়ে উঠলো। তার পরেই আবার স্থির হয়ে থাকে।

কৈলাস বলে—দেবতা হোক্ আর মহাপুরুষ হোক, জীবনে কারু গৌরীলাভ হয় না জানি। মহাদেবও গৌরীর অর্ধেকটুকু পেয়েছিলেন প্রমীলা। আমি কোন্ ছার!

চিরকালের বোকা মেয়ে প্রমীলা চমকে উঠলো। মাথা হেঁট করে মাটির দিকে তাকিয়ে রইল।

কৈলাস যেন বুদ্ধিশুদ্ধি হারিয়ে একেবারে পাগল হয়ে গেছে—অনন্ত ভাইয়ের কাছে আমি কোন দোষ করতে চাই না প্রমীলা। তার কিছুই কাড়তে চাই না। আমি চোর নই।

মাথা হেঁট করেই ভয়ার্ত স্বরে প্রমীলা বলে—তবে আপনি কি?

কৈলাস—আমি ভক্ত। সত্যিই আমি শুধু ভক্ত, প্রমীলা। শিব আমার ভরসা।

প্রমীলা—আপনার কথা বুঝতে পারছিনা, কৈলাস ভাই।

কৈলাস—শুধু তোমার ভালবাসার অর্ধেকটুকু প্রমীলা।

প্রমীলা মুখ তুলে তাকালো—কি বললেন?

কৈলাস—আমার যেটুকু পাওনা, তাই বললাম।

প্রমীলা আর মাথা হেঁট করল না। যেন একটা জ্বালার আঁচ লেগেছে, চোখ দুটো বন্ধ করে কিছুক্ষণ বসে থাকে প্রমীলা।

প্রমীলার চোখ নিংড়ে বড় বড় জলের ফোঁটা ঝরে পড়ছিল। হঠাৎ ভয় পেয়ে উঠে দাঁড়ালো কৈলাস। কোথায় গৌরী? গৌরীরূপের কোন চিহ্ন নেই এই মেয়ের মুখে। আকুল হয়ে কাঁদছে, এ যে সীতার মূর্তি। অতি বোকা, অতি ছিচকাঁদুনে অথচ অত্যন্ত টিট মেয়ে সেই রামায়ণের সীতা।

একটা তাচ্ছিল্যের ঠেলা দিয়ে শিবপুরাণ পাশে সরিয়ে রাখলো কৈলাস, এই ব্যর্থ অপদার্থ মন্ত্রের জঞ্জাল। একটা ছলনার সিঁড়ি, মানুষকে ঝুটা দেবত্বের গাছে তুলে দিয়েই দূরে সরে যায়।

পালিয়ে যাবার আগে প্রমীলার সামনে একবার দাঁড়ালো কৈলাস। কৈলাসের হাত পা কাঁপছে। শুধু একটা শেষ কথা বলার চেষ্টা করতে গিয়ে কৈলাস বুঝলো গলা কাঁপছে।

আর এক মুহূর্ত দেরী করলো না কৈলাস। ভেতর ঘর থেকে বারান্দায়, বারান্দা থেকে দোকান ঘর। তারপরেই ছোট মাঠের ওপর দিয়ে এক দমে হন্ হন্ করে হেঁটে পথের মোড়ে এসে পৌছল কৈলাস।

একেবারে নির্জন হয়ে রয়েছে মোড়টা। কোন সাড়া শব্দ নেই। বস্তির ঘরগুলির কপাট বন্ধ। কোন গাড়ি দাঁড়িয়ে নেই, গাড়ীর চলাচলও নেই। নতুন সরাইয়ের জীবনের সাড়া যেন শালবন ভেদ করে দূরান্তরে পালিয়ে গেছে। এক বৈরাগীর ছাড়াভিটার মত নতুন সরাইয়ের শব্দমুখর পথের মোড় আরও গভীর শূন্যতায় উদাস হয়ে রয়েছে।

তসীল কাছারীর ফটকটা কেল্লার দরজার মত। কাছারীর চারদিকে বেঁটে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। একটা কাঁচা সড়ক নানাদিক ঘুরে ফিরে ফটকের কাছে এসে শেষ হয়েছে। প্রাচীরে ঘেরা এই ভূখণ্ডের ওপর ছোট ছোট সবুজ ঘাসের আঙিনা আর কাছারী ঘর। শুধু তসীল কাছারী নয়, কাছাকাছি ও আশেপাশে এক সৌভ্রাত্রের আবেগে অনেকগুলি অফিস দাঁড়িয়ে আছে। একটা খাজনাখানা আর জঙ্গল অফিস, একটা আবগারী অফিস, একটা ডাকঘর। ছোট একটা কৃষি অফিসও আছে। একটা অকেজো ট্র্যাক্টরের মরচে-পড়া কঙ্কাল কাত হয়ে পড়ে আছে সম্মুখের ঘাসের ওপর। ফটক পার হয়ে প্রথম দালান হলো থানাবাড়ী। ছোট ছোট অফিস আর ছোট ছোট আমলা, কিন্তু খুব বড় বড় কাজ হয়। এক বছরের ঘুসের টাকা এক সঙ্গে জমা করলে ইটের বদলে তাই দিয়ে আর একটা পাঁচিল তোলা যায়। সার্কেলের পেয়াদাটার মুখে শুধু একটু খুসী মেজাজের হাসি ফুটিয়ে তুলতে হলেও চার আনা ঘুস দিতে হয়। কথা বলাতে আট আনা—আর দরখাস্তখানা টেবিলের ওপর পৌছে দিতে এক টাকা। কয়েকটা গাঁভিহি বস্তি আর সরাই, কয়েকটা জঙ্গল পাহাড় ঝর্ণা আর ক্ষেত, কয়েক হাজার দীন মানুষের পাপ-পুণ্য সুখ-দুঃখ শোক ও উৎসবের মধ্যে নিতান্ত অবাস্তর এই তসীল কাছারী! তারই ফটকে কয়েকশত মানুষ আজ হানা দিয়েছে, যেন এক দুঃস্বপ্নের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে, হিসেব নিকেশ করতে।

সমস্ত কাছারী বাড়ীটার পাগড়ী আর উর্দি গরম হয়ে উঠেছে। লাঠিধারী পুলিশেরা সার বেঁধে পাঁচিলের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, যেন পাঁচিল টপকে কেউ ভেতরে না ঢুকতে পারে। ফটকের পথ রুখে প্রথম দফায় দাঁড়িয়ে ছিল একদল গুর্খা সৈনিক, সঙ্গে একজন গোরা মেজর। টেলিগ্রাম পাওয়া মাত্র চটপট মোটর লরী দাবড়িয়ে চলে এসেছে। সদর থেকে এক রায় বাহাদুর এস-ডি-ও পত্রপাঠ চলে এসেছেন। ভুঁড়ির ওপর বেল্ট, বেল্টের সঙ্গে রিভলবার। ভুঁড়িতে যতই স্নেহপদার্থ থাকুক রিভলবারটি একেবারে স্নেহবর্জিত। থানা-ইনচার্জ দারোগাবাবু হাতে বন্দুক তুলে নিয়েছেন।

মাত্র তিন শত গ্রাম্য মানুষের একটা জনতা। কারও হাতে একটা লাঠিও নেই। মনের ভুলে লাঠি ছেড়ে দিয়েছে তা নয়, ইচ্ছে করেই ওরা আজ লাঠি ছোঁবে না। কারও মাথার খুলি ভাঙতে ওরা আসেনি। ওদের দাবীটা বড়ই অদ্ভুত। শুনতে খুবই সামান্য, বলতে খুবই সোজা, বলছেও খুব স্পষ্ট করেই! কিন্তু ভাবতে বড় ভয়ানক! এক চরম বিপর্যয়ের মন্ত্র যেন ওদের দাবিতে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে। তসীল কাছারির সমস্ত নথিপত্র, কয়েক শত বছরের যত অপমানের ইতিহাসকে আজ শুধু ওরা হাতের মুঠোয় পেতে চাইছে। এই নথিপত্র নিয়ে ওরা চলে যাবে, কোন্ এক অলক্ষ্য বৈতরণীর জলে চিরকালের মত ভাসিয়ে দেবে কে জানে?

সবচেয়ে আশ্চর্য, অস্ত্রে আয়ুধে ও হিংস্র দম্ভে কণ্টকিত এই ফটকের মুখেই এসে ওরা ভীড় করেছে। থরে থরে সাজানো এই মৃত্যুর ভ্রকুটী ভেদ করে, এই পথেই ওরা কাছারী এলাকায় ঢুকতে চায়। পাঁচিল টপকে ভেতরে যাবার কোন স্পৃহা নেই কারও মনে। সস্তা পথে কোন লোভ নেই, চালাকির কেউ ধার ধারে না। ওরা ফাঁকির তস্কর নয়। পিস্তল বন্দুকের ঔদ্ধত্যকে অবাধে তুচ্ছ করে, এই দুঃস্বপ্নকে বিদ্রূপে ব্যর্থ করে দিয়ে ওরা চলে যাবে। তাই ওরা এগিয়ে যাবে। এগিয়ে চললো।

থানার জমাদার গর্ গর্ করে গলার রগ কাঁপিয়ে হুঁসিয়ারী চীৎকার ছাড়লো—হঠ্ না হায় তো হঠ যাও, নেহি তো মর যাওগে।

ঝটপট সঙ্গীণ চড়িয়ে গুর্খা রাইফেল্‌স্ শক্ত হয়ে দাঁড়ালো।

—হঠ্, যাও হিন্দুস্থানসে। মত্ত ঝড়ের গর্জনের মত প্রত্যুত্তর দিয়ে জনতা ফটকের দিকে কয়েকপা এগিয়ে গেল।

– হঠ্ না হায় তো হঠ্ যাও, নেহি তো মর যাওগে। আবার সেই গলায় শিরা কাঁপানো মৃত্যুর হুংকার।

টোটাভরা রাইফেলগুলি নিশানা করে যেন ফণা তুলে স্থির হয়ে রইল।

—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! নবীন মেঘের ভেরীর মত জনতার সংকল্প আবার বেজে উঠে প্রত্যুত্তর দেয়।

এস-ডি-ও অর্ডার হাঁকলেন—ফায়ার!

এক রাউণ্ড ছররা গুলি বারুদের গন্ধ পুরিয়ে সশব্দে ছিটকে পড়লো। জনতা যেন অচমকা ছন্নছাড়া হয়ে সড়কের উল্টোদিকে বহু দূর পর্যন্ত পিছিয়ে গেল। কেউ পথের পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপলো, কেউ হতভম্বের মত তাকিয়ে রইল, কেউ আতঙ্কে দৌড় দিল।

বারুদের প্রথম দফা ধোঁয়া আর গন্ধ মিটে যেতে না যেতেই এই পেছু-হটে যাওয়া দৃশ্যের মধ্যে মাত্র একটি বেপরোয়া আত্মা ফটকের ওপর হানা দেবার জন্য একলা ছুটে এগিয়ে গেল।

—করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে! করেঙ্গে ইয়া—।

অনন্তরামের মন্ত্রের অনুচ্চারিত সঙ্কল্প পূর্ণ হলো। মেজরের রিভলভারের গুলি এক নিমেষে ছুটে এসে অনন্তরামের বুকের পাঁজর ফুটো করে দিয়েছে।

কয়েকটি মুহূর্তের মত, এক স্পন্দনহীন মূক পৃথিবীর স্তব্ধতার মধ্যে মাটিতে লুটিয়ে ছট্‌ফট্ করে নিজে রঙীন হয়ে উঠলো অনন্ত, মাটি রঙীন হলো।

এর পরের ঘটনার হিসেব অনন্তরাম জেনে গেল না। সবার আগে কারও কাছে বিদায় না নিয়েই সে চলে গেছে। কিন্তু ঐ জনতাই অনন্তরামকে বিদেয় দেবার জন্য

কিছুক্ষণ পরেই আবার ফিরে এসে তসীল কাছারীর ফটকে দাঁড়িয়েছে। লাঠি তরবারি বল্লম বন্দুক ইট পাটকেল চালিয়েছে। প্রাণ দিয়েছে, প্রাণ নিয়েছে। তসীল কাছারীর ফটকে শোণিতের উৎসব কিছুক্ষণের জন্য ভয়াল হয়ে উঠেছে। সমস্ত কাছারী এলাকা আগুনে পুড়ে গেছে। শুধু দালানের কালো কালো দেয়ালগুলি বিধ্বস্ত প্রেতালয়ের চিহ্নের মত দাঁড়িয়ে থাকে। অঢেল ফুলের স্তবকে শবাধার সাজিয়ে অনন্তরামকে তারা তুলে নিয়ে চলে যায়।

তসীল কাছারীর ফটকে ঐ যে এক খণ্ড ভূমি, অনন্তরাম যার মাটিকে রঙীন করে দিয়ে গেল—সেই মাটিই এক এক খাবলা লোকে তুলে নিয়ে গেছে। শক্ত পাথুরে মাটি, লোকে জল ঢেলে নরম করে নিয়ে, এক এক মুঠো কাদা নিয়ে যায়, এক মুঠো পুণ্যের পরমাণু।

শোণিত আর আগুনের খেলা থেমেছে। কিন্তু সকাল সন্ধ্যে লোক আসছে তসীল কাছারীর ফটকে, এ গাঁ থেকে ওগাঁ থেকে ভিন্ন জেলার বাজার ও বস্তি থেকে—মাটি নিতে। শুধু এক মুঠো মাটি।

পোড়ো কাছারীর ফটকে দিনকয়েক পরে আবার দেখা দিল পুলিশ আর ফৌজের লোক। আর পাহারা দেবার মত কিছু নেই। কিন্তু বাধা দেবার মত আর একটা কাজ তারা পেয়ে গেছে ঐ একখণ্ড ভয়ানক জমির মাটিকে তারা ঘিরে রাখলো—কেউ মাটি নিতে পারবে না।

সত্যি কেউ মাটি নিতে পারে না। লোকে একটু দূরে দাঁড়িয়েই আগ্রহে তাকিয়ে থাকে। তারপর হতাশ হয়ে চলে যায়।

একদিন, দু'দিন, তিনদিন সপ্তাহ কেটে যায়। তারও পরে, শালবনের মাথার ওপর দিয়ে প্রতি রাত্রিতে কৃষ্ণা তিথির ক্ষীণ চাঁদের রূপ ধীরে ধীরে ভরে উঠতে থাকে। হঠাৎ একদিন ভোরের আলোকে দেখা যায়, ঐ এক খণ্ড মাটির গায়ে সবুজ ঘাসের আবির্ভাব সাড়া দিয়ে উঠেছে পুলিশ আর ফৌজের মানুষগুলিকে হঠাৎ দেখতে নতুন রকমের লাগে। যেন এক তীর্থ ভূমির পবিত্রতাকে ওরা পাহারা দিয়ে সযত্নে আগলে রেখেছে। ওরা এখনো জানে না যে, ভবিষ্যতের কোন পথিক হয়তো এক শিবালয় দেখবার জন্য ঠিক এখানেই এই ভয়ানক মাটির কাছে এসে, এমনি এক সকালবেলায় ।

এমনি এক সকালবেলায় মাত্র কয়েকটি দিন পরে তীর্থযাত্রীর মতই কয়েকটি মানুষ হেঁটে হেঁটে তসীল কাছারীর ফটকের প্রায় কাছাকাছি কাশফুলে ছাওয়া মাঠের ওপর এসে দাঁড়ালো। প্রমীলা, প্রমীলার বাবা নন্দলাল, প্রমীলার ছোটভাই বাসুদেব আর কৈলাস।

কি দেখতে ওরা এসেছে তা নিজেরাই ভাল করে জানে না। তবু ওরা তাকিয়েছিল ফটকের দিকে। বুড়ো নন্দলালের একজোড়া হতভম্ব চোখ জলে ভিজে গিয়েছে। লক্ষ্য

বছরের ধৈর্যে কঠিন, পিতা হিমাদ্রির বুকের বরফে আবার যেন নতুন করে পুত্রশোকের জ্বালা লেগেছে।

ছোট ছেলে বাসুদেব কান্না লুকোবার জন্যই যেন এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিল। হিন্দুস্থানের দেবদারু বনের একটি শিশু ঝড় হঠাৎ বড় আকাশের মেঘের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখে জলের ঝাপটা লেগেছে, ভাল করে বুঝতে পারছে না বলেই যেন অভিমান হয়েছে।

সবার পেছনে দুহাত দিয়ে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল কৈলাস।

শুধু কাঁদতে পারল না বিধবা প্রমীলা। প্রমীলা যেন এক তপস্বিনী সিদ্ধার্থিকার সত্তা লাভ করেছে। জীবনের ক্ষতবড় ক্ষতটার হিসেব খতিয়ে দেখবার কোন গরজ নেই! কোন দুঃখকেই আজ যেন আমল দিচ্ছে না প্রমীলা। কেমন দেবা-দেবা ভাব। যেন একটা চন্দন চাঁচত কঠিন আত্মাভিমানের মূর্তি। যাবার আগে একটা মুখের কথা পর্যন্ত না বলে যে চলে গেল, তার দেওয়া শাস্তি সে নিশ্চয় গ্রহণ করবে। কিন্তু কেঁদে কেটে নয়, হেসে হেসেও নয়, একেবারে শূন্য হয়ে গিয়ে। এই কয়টা দিন, সকাল সন্ধ্যা রাত্রি, শুধু গভীর বিশ্বাসে শিবনাম জপেছে আর শিবস্তোত্র পড়েছে প্রমীলা। শূন্যতার ভগবান তাকে কৃপা করে পথ দেখিয়ে দিয়েছেন।

ঘরে ফেরবার আগে প্রমীলা একবার কৈলাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো—আর কাঁদবেন না কৈলাস ভাই।

এই সান্ত্বনাকে সইতে না পেরেই কৈলাস যেন অভিমানী ছেলেমানুষের মত আরও বেশী আবোল তাবোল বকতে আরম্ভ করলো - আমি শিবভক্ত প্রমীলা বাহিন্। তুমি বিশ্বাস কর, আমি সত্যিই ভক্ত, শুধু ভক্ত।

তপস্বিনীর পাদবিভবা শূন্যতার গায়ে লেহাৎ অসাবধানেই যেন এক টুকরো মেঘের সজলতা লাগে। প্রমীলার গলার স্বর আর একবার যেন ভুল করে মমতার ছোঁয়ায় স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে—হ্যাঁ কৈলাস ভাই

কৈলাস—তাই তো আমি শিবালয় দেখতে এখানে এসেছি।

শিবালয়! প্রমীলার শুকনো চোখের দৃষ্টি তসীল কাছারির ফটকে একখণ্ড ঈষৎ শ্যামল মাটির বেদীর ওপর গিয়ে লুটিয়ে পড়লো। দু'টো পুলিশ তখনো জায়গাটা পাহারা দিচ্ছে। লম্বা লম্বা লাঠির ছায়া পড়েছে মাটির ওপর।

প্রমীলাদের সামনে অনেকগুলি কৌতূহলী পথচারী লোক একটা বিস্ময়ের ভীড় সৃষ্টি ক'রে দাঁড়িয়েছিল। তারা শুধু বুঝতে চেষ্টা করেছিল— কে এরা?

হঠাৎ বুকফাটা শোকের বিলাপ বাতাসে ছড়িয়ে, সুর করে টেনে টেনে, মাথা কুটে ক্ষমা চেয়ে, কেঁদে উঠলো প্রমীলা। গৌরী নয়, সীতাও নয়। কৌতূহলী জনতা শুধু বুঝতে পারলো, নতুন সরাইয়ের অনন্ত মুদীর বউ কাঁদছে।

চতুর্থ পানিপথের যুদ্ধ

আমাদের ক্লাসটা ছিল একটি নৃতত্ত্বের ল্যাবরেটরীর মত। এমন বিচিত্র মানবতার নমুনা আর কোন্ স্কুলে কোন্ ক্লাসে আছে জানি না। তিনটি রাজার ছেলে ছিল আমাদের ক্লাসে। একজন জংলী রাজার ছেলে, কুচকুচে কালো চেহারা। আর দু'জন ছিল সত্যিকারের ক্ষত্রিয়াগ্রজ—সুগৌর গায়ের রঙ, পাগড়ীতে সাচ্চা মোতির ঝালর ঝুলতো। তা ছাড়া ছিল—সিরিল টিগ্‌গা, ইম্যানুয়েল খাল্‌খো, জন বেস্‌রা, রিচার্ড টুডু আর ষ্টীফান হোরো এবং আরো অনেক। এত ওরাওঁ আর মুণ্ডা সন্তানের সমাবেশের মাঝখানে তবু আমরা ক'জন ইন্টারক্লাস পরিবারের বাঙালী ও বিহারী ছেলে শুধু বুদ্ধির জোরে সর্বকর্মের মোড়লীর গৌরব অধিকার ক'রে বসেছিলাম। রাজার ছেলেগুলোকে আমরা বলতাম সোনা ব্যাঙ, আর মুণ্ডা ও ওরাওঁদের বলতাম কোলা ব্যাঙ। ওদের কাওকে আমরা কোন দিন গ্রাহ্যের মধ্যে আনতাম না। রাজার ছেলেগুলি অবশ্য আমাদের সঙ্গে কথা বলতো না। অপর পক্ষে টিগ্‌গা, খাল্‌খো, বেস্‌রা, টুডু - ওরা আমাদের সঙ্গে দুটো কথা বলতে পারলে ধন্য হয়ে যেত। টিফিনের সময় একটা আনি নিয়ে টুডুকে দিতাম। বলতাম—টুডু, চট্ করে এক দৌড়ে এই এক আনার ঝালবাদাম নিয়ে এস তো'। গঙ্গা সাহুর দোকান থেকে আনবে।

স্কুল থেকে গঙ্গা সাহুর দোকান দেড় মাইল হবে। কৃতার্থভাবে আনিটা হাতে তুলে নিয়ে টুডু সেই প্রচণ্ড রোদে ঝলসানো মাঠের ওপর দিয়ে পোড়া হরিণের মত উদ্দাম বেগে দৌড়ে চলে যেত গঙ্গা সাহুর দোকানে। ফিরে এসে ঝাল বাদামের ঠোঙাটা আমাদের হাতে সঁপে দিয়ে নিজে দূরে সরে যেত। আমরা বলতাম—কী আশ্চর্য টুডু, এতটা পথ দৌড়ে এলে তবু তুমি একটুও হাঁপাচ্ছো না!

এই ফাঁকা কথার কারসাজীটাকে আন্তরিক অভিনন্দন মনে করেই টুডু দূরে দাঁড়িয়ে গর্বভরে হাসতো! আমরা চোখ টিপে লক্ষ্য করতাম—টুডু কেমন জোর করে তার পরিশ্রান্ত শ্বাসবায়ুটাকে ঢোঁক গিলে লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করছে। তাকে ঝালবাদামের একটু শেয়ার দিতে আমরা বোধ হয় ইচ্ছে করেই ভুলে যেতাম। দিতে গেলেও টুডু নিত না।

আমরা দেখতাম, একটু দূরে দাঁড়িয়ে সুতীব্র একটা দৃষ্টি দিয়ে ষ্টীফান হোরো আমাদের হাবভাব লক্ষ্য করছে। আমরা ঘাবড়ে যেতাম। ষ্টীফান যেন তীর মেরে

আমাদের বুকের ভেতরে ধূর্ত রসিকতায় তৈরী ফুলফুলটাকে খোঁচা দেখছে। সব বুঝে ফেলতে পারছে। কিন্তু সবার মধ্যে একমাত্র ষ্টীফানই পারে, আর কেউ নয় ?

টুডু, খালখো, টিগ্‌গা, বেস্‌রা সকলেই কতকটা এই রকমেরই বাধ্য বেকুব বিশ্বাসী আর নিরীহ ছিল। আমরা মনে মনে হাসতাম।—হায়রে, ধাঁচীর জঙ্গলের যত কোল, যত সব কোলা ব্যাঙ!

ওদের মধ্যে ঐ একটি মাত্র কাল কেউটে ছিল, ষ্টীফান হোরো। বড় উদ্ধত ছিল ষ্টীফানের স্বভাবটা। স্বীকার করতে লজ্জা নেই, হোরোর কাছে আমাদের আভিজাত্য চুপে চুপে হার মেনে নিত। ওর সঙ্গে সদ্ভাব রাখার জন্য মাঝে মাঝে যেচে ওর সঙ্গে কথা বলতে হয়েছে। আরও লজ্জার বিষয়, হোরো এক এক সময় আমাদের প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে অন্যমনস্ক ভাবে অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে নিত। ঐ মাথা-ঠাসা মোটা মোটা চুলের ঘুঙর, চেপ্টা নাক, আবলুস কালো চেহারা—তবু এত অহঙ্কার!

ষ্টীফানের ওপর প্রথম একটু ভয় ও শ্রদ্ধা হলো একটা ঘটনায়। সেদিন খেলার মাঠে দেখলাম—হোরো হকি ষ্টিক আনেনি; হোরো তবু খেলতে চায়। কিন্তু নিজের হকি নিয়ে খেলতে হবে—এই ছিল আমাদের নিয়ম। হোরো বার বার আমাদের অনুরোধ করলো—কিছুক্ষণের জন্য কেউ আমাকে একটা ষ্টিক ধার দাও, এক হাত খেলেই আবার দিয়ে দেব।

কেউ কারও ষ্টিক পরের হাতে দিতে রাজী ছিল না। হোরো বললো—আমি বিনা ষ্টিকেই খেলবে।

গোঁয়ার হোরো একটি ঘণ্টা আমাদের উদ্দাম হকি ষ্টিকের বাড়ি আর আছাড়ের সঙ্গে সমান স্বাচ্ছন্দ্যে পা দিয়ে খেলে গেল। হোরোর দুটি নিরেট শিশু কাঠের মত পায়ের ওপর বেপরোয়া হকি ষ্টিক চালাবার সময় এক একবার সন্দেহে আমাদেরই হাত কেঁপে উঠেছে—ষ্টিকটাই ভেঙে না যায়।

ষ্টীফান হোরো ক্রমেই আমাদের ভাবিয়ে তুলছিল। শুধু ভয় আর শ্রদ্ধা নয়—আর একটা কারণে আমরা হোরোকে একবার ঈর্ষা করতে আরম্ভ করলাম। লেখা পড়ার ব্যাপারে হোরো আমাদের মনের শান্তি নষ্ট করতে চলেছে। ইংরাজী কবিতার আবৃত্তি ও ব্যাখ্যায় সে আমাদের ইন্দুকেও পরাজিত করে ছাব্বিশ নম্বর বেশী পেল। ঘটনাটা জাতীয় অপমানের মত আমাদের গায়ে বিঁধলো। বেহারী ছাত্রদের জাতীয়তা কতটা ক্ষুণ্ণ হয়েছিল জানি না, কিন্তু হোরোর সম্পর্কে একটা নিন্দার ষড়যন্ত্রে তারাও আমাদের সঙ্গে ইউনাইটেড ফ্রন্ট করলো। আমরা বেশ জোর গলায় রটিয়ে দিলাম—এ স্কুলে

অখৃষ্টানদের ওপর বড় অবিচার চলছে। মাষ্টারেরা সবাই খৃষ্টান। সুতরাং খৃষ্টান হোরো বেশী নম্বর পাবে তাতে আর আশ্চর্য কি? কিন্তু কি ভয়ানক অন্যায়!

আমাদের অভিযোগকে মনে প্রাণে সত্য বলে বুঝলেন শুধু একমাত্র অখৃষ্টান শিক্ষক। সংস্কৃতের মাষ্টার বৈজনাথ শর্মা—পণ্ডিতজী।

পণ্ডিতজী আমাদের সান্ত্বনা দিলেন কি আর করবে বাবা! পাদরীদের স্কুলে এই রকমই অন্যায় কাণ্ড হয়ে থাকে। যাক্, ইউনিভার্সিটি তো আছে। সেইখানে ধরা পড়ে যাবে কার কতখানি যোগ্যতা।

প্রমোশনের পর নতুন বছরে ষ্টীফান হোরো আরও ভয়ানক এক গোঁয়ার্তুমি করে বসলো—পা দিয়ে হকি খেলার চেয়েও ভয়ানক। ষ্টীফান হোরো তার অ্যাডিশনাল ইংরাজী ছেড়ে দিয়ে সংস্কৃত নিল। খৃষ্টান টীচারেরা সবাই হোরোকে ধমকালেন, হেড মাষ্টার ফাদার লিগুন ক্ষুণ্ণ হলেন, পণ্ডিতজী অদ্ভুতভাবে হাসতে লাগলেন। তবু অনাথ হোরোর সংস্কৃত পড়ার প্রতিজ্ঞা তিলমাত্র বিচলিত হলো না।

পণ্ডিতজী আমাদের আড়ালে ডেকে নিয়ে একটা অস্বস্তির হাসি হেসে বললেন—ষ্টীফান হোরো সংস্কৃত নিয়েছে। আর কি? এইবার দেবভাষার কপালে কি আছে কে জানে।

পণ্ডিতজী হাসতে লাগলেন। আমাদের কেমন সন্দেহ হলো—পণ্ডিতজীকে যেন খুসী খুসী দেখাচ্ছে! যাক্।

শীঘ্রই আমাদের যত ধারণা সংশয় আক্রোশ ও আশঙ্কা পর পর কতগুলি ঘটনায় আরোও জটিল হয়ে উঠতে লাগল।

নিউ টেষ্টামেণ্ট থেকে ডেভিডের গাথাগুলি আগাগোড়া নির্ভুল আবৃত্তি করে ফার্ষ্ট প্রাইজ পেল ষ্টীফান হোরো। সেকেণ্ড, থার্ড ও ফোর্থ প্রাইজের অগৌরবে মুখ শুক্‌নো ক'রে আমরা বসে রইলাম। ফাদার লিগুন উচ্ছ্বসিত আনন্দে হোরোর প্রশংসা ক'রে ঘোষণা করলেন—ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর তোমায় নিশ্চয় দারোগা করে দেবো হোরো, আমি প্রতিশ্রুতি দিলাম।

তা করতে পারেন ফাদার লিগুন। এতটুকু সুপারিশ করার ক্ষমতা তাঁর আছে, কিন্তু ঐটুকুই যদি ষ্টীফান হোরোর জীবনের পরমার্থ হয়, হোক, তার জন্য আমরা মোটেই হিংসা করি না। তার জন্য এত কষ্ট করে নিউ টেষ্টামেণ্ট মুখস্থ করার দরকার নেই আমাদের।

তার পরের দিনই বাইবেল ক্লাসে হোরোকে একেবারে ভিন্ন রূপে দেখতে পেলাম আমরা। দুর্বোধ্য বিস্ময়ে আমরা শুধু খাবি খেতে লাগলাম।

বাইবেল ক্লাসের একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে বসেছিল হোরো। পড়াতে পড়াতে

ফাদার লিগুন বার বার পুলকিত নেত্রে হোরোকে প্রশ্ন করছিলেন—ষ্টীফান তুমিই উত্তর দাও। তুমিই সবচেয়ে ভাল উত্তর দিতে পারবে।

—জানি না স্যর। ষ্টীফানের রুক্ষ গলার স্বরে চমকে উঠে আমরা সবাই তার দিকে তাকালাম। দেখলাম, ষ্টীফান হোরোর আরও রুক্ষ ও বিরক্ত মুখটা ডেস্কের ওপর ঝুঁকে রয়েছে। ফাদার লিগুনের দিকে যেন তাকাতে চায় না হোরো।

ফাদার লিগুনের সোনালী দাড়ির ওপর লালচে মুখে ক্ষণে ক্ষণে গাঢ় রক্তচ্ছটা ছড়িয়ে পড়ছিল। চোখের দৃষ্টিটা তীব্র হয়ে উঠছিল। ষ্টীফানের দিকে তাকিয়ে রুষ্ট স্বরে বললেন—ষ্টীফান, আজ কি তোমার ব্রেনটাকে দরজার বাইরে রেখে ক্লাসে এসেছ তুমি? উত্তর দিতে পারছো না কেন?

—জানি না স্যর। আবার ষ্টীফান হোরোর সেই স্পষ্ট অবিচল ও অকুতোভয় উত্তর শুনে আমাদের বুকে দুরু দুরু স্বরু হয়ে গেল। আকস্মিকভাবে অসময়ে ক্লাস বন্ধ করে ফাদার লিগুন চলে গেলেন।

কিন্তু ষ্টীফান হোরোর এত রাগ কেন? এত অভিমান কেন? নিউ টেস্টামেণ্ট মুখস্থ করে কার মাথা কিনেছে? কি হতে চায়? হাউস অব লর্ডস্-এর সদস্য?

এর পর বিপদে পড়লেন পণ্ডিতজী। পণ্ডিতজীর মতি-গতিও ক'দিন থেকে কেমন একটু বিসদৃশ দেখাচ্ছে। আমাদের এড়িয়ে যেতে পারলেই যেন পণ্ডিতজী একটু স্বস্থ বোধ করেন। দেখা হলেই ব্যস্ত হয়ে সরে পড়েন। অথচ পণ্ডিতজীকে কত কথাই না জিজ্ঞাসা করার আছে। ফার্ষ্ট টার্মিনাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। এই তো যত নম্বর প্রমোশন আর পজিশন নিয়ে একটা দুশ্চিন্তা গবেষণা ও কৌতূহলের সময়। পণ্ডিতজীর উদার হাতের নম্বর অনেক সময় আমাদের টোটাল'কে পরিস্ফীত করে কৃপণ খৃষ্টান শিক্ষকদের ষড়যন্ত্র থেকে আমাদের বাঁচিয়েছে। আজও আমরা তাই জানতে চাই—পণ্ডিতজী কার জন্যে কতদূর করলেন। ইন্দুকে যদি একবার বুক ঠুকে পঁচাশি দিয়ে দেন তবে টোটালে তার ফার্স্ট হওয়া সম্বন্ধে আর কোন সংশয় থাকে না। সব খৃষ্টানী ষড়যন্ত্র জব্দ হয়ে যায়।

পণ্ডিতজীর বাড়ীতে গিয়েছি, লাইব্রেরী ঘরে একা একা পেয়েছি, পথে পথরোধ করেছি—কিন্তু পণ্ডিতজী কিরকম গোলমেলে কথা বলে সব কৌতূহল যেন চাপা দিতে চান। আমাদের সন্দেহ আরও প্রখর হয়ে ওঠে।

আমৃতা আমৃতা করে দু'বার মাথা চুলকিয়ে পণ্ডিতজী সত্য সংবাদটা ব্যক্ত করে দিলেন।—সংস্কৃতে ষ্টীফান হোরো সবচেয়ে বেশী নম্বর পেয়েছে, একশোর মধ্যে পঁচাত্তর।

—আর ইন্দু? আমাদের প্রশ্নে একটু অপ্রস্তুত হয়ে পণ্ডিতজী অপরাধীর মত বললেন—বত্রিশ।

মাত্র বত্রিশ! পণ্ডিতজীর মত বিশ্বাসহন্তা পৃথিবীতে আর নেই। আমাদের ক্ষোভ অসংযত হয়ে উঠেছিল। পণ্ডিতজী মিনতি করে বললেন—ষ্টীফান হোরো এত ভাল সংস্কৃত লিখেছে, এ-তো তোমাদেরই গৌরব, আর্যভাষার গৌরব। এতে তো তোমাদের খুসী হবার কথা। এটা হোরোর জয় নয়, এটা হলো সংস্কৃত ভাষার জয়।

চুলোয় যাক সংস্কৃত ভাষার জয়। ইন্দু ফার্ষ্ট হতে পারবে না, এটা যে আর্যত্বের কত বড় পরাভব, বাঙালীর কত বড় অপমান—তা পণ্ডিতজী বুঝলেন না। কিন্তু আমরা ঠিক রহস্যটি বুঝে ফেললাম—পণ্ডিতজী হলেন বেহারী, তাই।

কিন্তু বাতাসের নিশ্চয় সেই পরম গুণ আছে, যার জন্য শত অন্যায়ের অবরোধের মধ্যেও ধর্মের কল নড়ে ওঠে। লাইব্রেরী ঘরে যেদিন বোর্ড নিবদ্ধ মার্ক-শীটের কাছে আমরা গিয়ে চোখ তুলে দাঁড়ালাম, সেদিন আমরা বিশ্বাস করলাম—সত্যের জয় আছে, মিথ্যার পরাজয় আছে।

ইন্দুই ফার্ষ্ট হয়েছে। ষ্টীফান হোরো অনেক নীচে। ইংলিশে, ইতিহাসে, ভূগোলে, অঙ্কে—সব বিষয় অতি নগণ্য নম্বর পেয়েছে ষ্টীফান হোরো, একমাত্র সংস্কৃত ছাড়া। ভেবে অবাক্ হলাম আমরা, খৃষ্টান টিচারেরা হোরোর ওপর হঠাৎ এত নির্দয় হয়ে উঠলেন কেন?

আরও কিছুদিন পরে ষ্টীফান হোরো আমাদের কাছে একেবারে দুর্বোধ্য হয়ে গেল। শুধু আমাদের কাছে নয়, খাল্‌খো, বেস্‌রা, টিগ্‌গা সবাই বলাবলি করে—কি জানি হয়েছে হোরোর!

বড়দিনের উৎসবে আমরাও পিকনিক করতে গিয়েছিলাম শিলোয়ারার জঙ্গলে। রান্নার কাঠের জন্য মহা উৎসাহে একটা মরা কেঁদ গাছ ভাঙছিলাম আমরা। হঠাৎ দেখলাম, স্রোতের ধার দিয়ে একা একা হোরো চলেছে। হাতে একটা গুলতি। আমরা চেঁচিয়ে ডাকলাম হোরোকে। এ রকম অভাবিত ভাবে হোরো যখন এসেই পড়েছে, তখন সেও আমাদের সঙ্গে এই বনভোজনের আনন্দের একটু শেয়ার নিক্ না কেন। পোলাও হবে, মাংস হবে, দই আছে, বৈকুণ্ঠ ময়রার সন্দেশ আছে। খেয়ে খুসী হবে হোরো। একেবারে আন্‌কোরা মুণ্ডা, জীবনে বোধ হয় এসব খায়নি কখনো।

হোরো এগিয়ে এল। আমাদের কাছে এসেই একটা শাল গাছের শাখার দিকে নিবিষ্টভাবে তাকিয়ে রইল। তারপরেই শিকার লক্ষ্য ক'রে গুলতি তুলে ধরলো!

সঙ্গে সঙ্গে একটা হৃষ্টপুষ্ট কাঠবিড়ালী আহত হয়ে ধপ করে মাটির ওপর পড়লো। একটা লাফ দিয়ে আহত কাঠবিড়ালীটাকে লুফে নিয়ে পকেটের ভেতর রাখলো ষ্টীফান।

আমরা আতঙ্কিত হয়ে প্রশ্ন করলাম—ওটা কি হবে ষ্টীফান।

—খাব। নিঃসঙ্কোচে কথাটা বলে ফেললো হোরো। মনের ঘেন্না চেপে রেখে তবু আমরা হোরোকে নিমন্ত্রণ করলাম। ওসব ছুঁড়ে ফেলে দাও ষ্টীফান। পাগল কোথাকার। এস আমাদের পিকনিকে তুমিও খাবে আমাদের সঙ্গে।

না। হোরোর কাল মুখের ভেতর থেকে ঝক্‌ঝকে দুপাটি সাদা দাঁতের হাসি আপত্তি জানালো।

এ রকম জংলী হয়ে যাচ্ছে কেন ষ্টীফান? রিচার্ড টুডু একদিন কানে কানে আমাদের বললো,—সত্যিই কি জানি হয়েছে হোরোর। বোধ হয় শীগগির পাগল হয়ে যাবে। ফাদার লিগুন আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন, হোরোর সঙ্গে যেন কেউ না মেশে।

আমরা জিজ্ঞাসা করলাম।—কেন টুডু।

টুডু—একজন বুড়ো সোখার সঙ্গে আজকাল বড় ভাব হয়েছে। লুকিয়ে লুকিয়ে প্রতিদিন মঙ্গলবারের হাটে গিয়ে সোখার সঙ্গে দেখা করে হোরো।

—তাতে কি এমন অপরাধ করেছে হোরো?

টুডু ভুরু কুঁচকে বললো—অপরাধ নয়? এ'তে বাইবেলের অপমান করেছে হোরো। চার্চে যায় না, কারও কথা শোনে না। তিন দিন বোর্ডিংয়ে ছিল না। ওকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে।

—বোর্ডিংয়ে ছিল না? কোথায় ছিল?

টুডু গলার স্বর আরও নামিয়ে চুপে চুপে বললো—বুরুতে গিয়েছিল। সেখানে নেচে গেয়ে এসেছে। পেট ভরে ইলি খেয়ে নেশা করেছে। তাছাড়া......।

টুডু হঠাৎ থেমে গিয়ে বললো। একটা কথা বলছি, কাউকে বলো না যেন। জানতে পারলে হোরো আমায় মেরে ফেলবে।

টুডুকে অভয় দিলাম।—না, কেউ জানতে পাবে না, তুমি বল।

টুডু—একটি মেয়ের সঙ্গে ওর খুব ভাব হয়েছে। মেয়েটার নাম চিরুকি, মোরাজি পাহাড়ের মুরমুদের মেয়ে।

টুডুর কথাগুলি মুগ্ধ হয়ে যেন গিলছিলাম আমরা। আমাদেরই সহপাঠী—দীন দরিদ্র মুণ্ডা হোরো, কতই বা বয়স; তবু সেই হোরো আজ এক মুহূর্তে আমাদের বাইবেল ক্লাস, সংস্কৃতের নম্বর আর হকি খেলার সব আনন্দ উত্তেজনাকে মূল্যহীন করে দিয়ে, এক রোমাঞ্চময় অনুরাগের স্কুলে গিয়ে সবার অগোচরে নাম লিখিয়ে এসেছে।

সেই মেয়েটি, চিবুকি মুরমু তার নাম, তাকে যেন আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি। শাল ফুলের মালা গলায় দিয়ে, খোঁপায় একটা বনজবা গুঁজে, স্রোতের ভাষার মত খল্ খল্ হাসির বন্ধনের হোরোর কালো হৃদয়ের সব দুরন্তপনাকে বন্দী করে কোন্ উপত্যকার একটি নিভৃতে নিয়ে চলে গেছে। সেখান থেকে ফিরে আসার সাধ্য নেই হোরোর। কোন্ সাধেই বা আসবে?

টুডু তখনো সেই রকম পাকা পাকা কথা বলে চলেছিল।—মুরমুরা বোঙা পুজো করে, ওদের সঙ্গে মেলামেশা কি উচিত হলো? বড় ভুল করেছে হোরো।

স্টীফান হোরোকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, এটা শুধু একটা গুজব হয়েই রইল। কার্যতঃ দেখলাম, হোরোকে তাড়ানো হলো না। নিজের ইচ্ছে মত ক্লাসে আসে হোরো। নিজের ইচ্ছে মতই অনুপস্থিত হয়। অনুগত খৃষ্টান ছাত্রেরা হোরোকে এড়িয়ে যায়। হোরো যেন একঘরের মধ্যেই একঘরে হয়ে আছে।

রিচার্ড টুডু যে-আশঙ্কা প্রচার করেছিল, কাজের বেলায় দেখলাম তার উল্টোটাই হয়েছে। হোরোকে বোর্ডিং থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়নি। সে বোর্ডিংয়েই আছে, অথচ তার সম্পর্কে যেন সব শাসন প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

আমরা দেখে অবাক্ হয়ে যেতাম, এক একদিন বিকেলে ফাদার লিণ্ডন টেনিস খেলছেন হোরোর সঙ্গে। আশ্চর্য! টুডু বেস্রা টিগ্গা—এরা হোরোর চেয়ে কম কালো আর বেশী বিশ্বাসী খৃষ্টান। কিন্তু আজ পর্যন্ত ওরা শুধু ফাদার লিণ্ডনের টেনিস খেলার সময় বল কুড়িয়ে দেবার মর্যাদা পেয়েছে। তার বেশী নয়। আর স্টীফান একেবারে···সত্যি আশ্চর্য।

বোর্ডিংয়ের বাগানে বিকাল বেলা জল দেবার ভার ছিল হোরোর ওপর। এই কর্ত্তব্যটুকুর বিনিময়ে হোরো বোর্ডিংয়ে ফ্রী খেতে পেত আর থাকতো। আমরা দেখলাম, হোরো আর বাগানে যায় না, জল তোলে না। উদ্যানসেবার ভার টিগ্গার ওপর চাপানো হয়েছে। বেচারী টিগ্গা! সকাল বেলার রান্নার জন্য কাঠ কাটে, তার ওপর আবার বিকেল বেলা জল তোলা!

টুডু এসেই আর একদিন একটা খবর দিল—আজকাল আর হাটে যাবার সুযোগ পায় না স্টীফান, প্রতি মঙ্গলবারে সারা দুপুর ফাদার লিণ্ডনের ঘরে বসে পিলগ্রিম্স্ প্রগ্রেস পড়ে। পড়া শেষ হলে নাকি চা-বিস্কুট খায় হোরো। ফাদার লিণ্ডন খাওয়ান।

আমাদের উৎসাহ ঔৎসুক্য আলোচনা আর গবেষণার সীমা ছিল না। অলক্ষ্যে কত বড় একটা ঘটনার দ্বন্দ্ব জমে উঠেছে, তার কিছু কিছু আভাষ আমরা আমাদের অনুভব দিয়ে ধরতে পারছিলাম। এক দিকে কেম্ব্রিজের এম-এ বিখ্যাত শিক্ষিত সুসভ্য ও শ্রদ্ধেয় ফাদার লিণ্ডন।···অপর দিকে কোন্ এক জংলী মুণ্ডা ডিহির বুড়ো সোখা

দীনতম নগণ্য অর্ধোলঙ্গ বর্বরবেশী এক যাদুমন্ত্র। যেন দুই যুগে লড়াই—বিংশ শতক বনাম প্রাক্ ইতিহাস। বুড়ো সোখা বোধ হয় সে লাঞ্ছনা ভুলতে পারে না—ছেলেধরা পাদরীরা তাদের ছেলেকে ধরে নিয়ে গিয়েছে, খৃষ্টান করে দিয়েছে হোরোকে। তারই প্রতিশোধ নেবে বুড়ো সোখা। এই সুসভ্য ডাইনদের দুর্গ থেকে আবার জঙ্গলের ছেলেকে জঙ্গলে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে।

ফাদার লিগুন তাই বোধ হয় সতর্ক হয়েছেন। স্টীফান হোরো যদি আবার জংলী হয়ে যায়, সে পরাজয় আর অপমান বড় বেশী করে বুকে বাজবে। সহ্য করা কঠিন হবে। লিগুন জানেন প্রতি মঙ্গলবারের হাটে বুড়ো সোখা আসে। একটা আরণ্য আত্ম প্রতিশোধ নেবার জন্য যেন আশেপাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, সুযোগ খুঁজছে। চা বিস্কুট টেনিস—সুসভ্যতার এক একটি প্রসাদ খাইয়ে হোরোকে যেন পোষ মানিয়ে রাখতে চাইছিলেন ফাদার লিগুন।

আমরা বললাম—চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধ। দেখা যাক্, কে জেতে কে হারে।

গুড ফ্রাইডের ছুটিতে সবাই দেশে যাবার ছুটি পেল। টুডু টিগ্‌গা বেসরা খাল্‌খো সবাই চলে গেল। ওদের পক্ষে যাবার কোন বাধা ছিল না। কাঁধের লাঠিতে এক একটা পোঁটলা ঝুলিয়ে জঙ্গলের পথে ত্রিশচল্লিশ মাইল একটানা হেঁটে ওরা চলে যাবে নিজের নিজের ডিহিতে! কোন পাথেয় দরকার হয় না। ততখানি পয়সা খরচ করার সামর্থ্যও নেই ওদের।

কিন্তু হোরোকে ছুটি দিতে রীতিমত বিচলিত হয়ে পড়লেন ফাদার লিগুন। হোরো যেদিন গেল, সার্ভিস বাসটা এসে দাঁড়ালো বোর্ডিংয়ের কাছে। আমরা দেখলাম, ফাদার লিগুন মাণিব্যাগ থেকে টাকা বের করছেন, বাসের টিকিট কিনে দিচ্ছেন হোরোকে।

আমাদের মধ্যে বাজি ধরা হলো—হোরো আর ফিরে আসবে কি না। ইন্দু বললো—নিশ্চয়ই আসবে। ফাদার লিগুন ওর জংলীপনা ঘুচিয়ে দিয়েছেন। দুবেলা চা-বিস্কুট মারছে আজকাল। তার আস্বাদ কি ভুলতে পারবে হোরো!

আমি বললাম—আর ফিরে আসবে না হোরো। এখানে না হয় চা-বিস্কুট আছে, কিন্তু ওদিকে যে …।

ইন্দু—ওদিকে কি ?

বললাম—চিবুকি মুরমুকে ভুলে গেলে ?

ইন্দু একটু নিরাশ হয়ে পড়লো।—তাই তো !

ছুটি ফুরিয়ে গেলে আবার বোর্ডিংয়ের জীবন চঞ্চল হয়ে উঠলো। সবাই এসেছে।

স্টীফান হোরো ফিরে এসেছে। ইন্দুর জিত হলো। আমরা নিরাশ হয়ে পড়লাম। রাগ হ'লো হোরোর ওপর। হোরোটা সত্যিই একটা গবেট ও বেরসিক।

কিন্তু টুডুর কাছে গল্প শুনে আমাদের এই আক্ষেপ মুহূর্তে মুছে গেল। আমরা শুনলাম বুড়ো সোথার কথা, হোরোর কথা, চিরকি মুরমুর কথা। হোরোদের জঙ্গলের ছবিটা মুহূর্তের মধ্যে যেন দূরের ফোটা পলাশের আলেয়ার মত আমাদের কল্পনার সীমার পারে দুলতে শুরু করে দিল। ইন্দু বললো—চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে বুড়ো সোথার জয় অবধারিত।

হোরোর পাশের ভিহির ছেলে টুডু। খৃষ্টান টুডুরা অখৃষ্টানদের সঙ্গে মেশে না। টুডু তবু যেন গোয়েন্দার মত হোরোর সব কীর্তি দেখে এসেছে। তবে টুডু প্রাণ থাকতে ফাদার লিণ্ডনের কানে এসব কথা কখনো তুলবে না। হোরোর ওপর প্রচণ্ড একটা শ্রদ্ধা ও মমতা আছে টুডুর। হোরোর কাছে গিয়ে কিছু বলতে পারে না ব'লেই আমাদের কাছে বলে। ব'লে ব'লে যেন স্তব্ধ শ্রদ্ধার বেদনা খানিকটা হালকা করে নেয়।

টুডু দেখেছে—একদিন তীর দিয়ে একটা হরিণ মেরেছিল হোরো। স্রোতের ধারে হোরো দাঁড়িয়ে ছিল ধনুক হাতে। চিরকি মুরমু তার পা ধুইয়ে দিচ্ছিল।

টুডু দেখেছে—চিরকি তাদের গাঁয়ের ঘুমঘর থেকে জ্যোৎস্নারাতে চুপে চুপে পালিয়ে এসেছে। হোরো আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে চিরকিকে হাতে ধরে নিয়ে গেছে।

টুডু দেখেছে—হোরো খৃষ্টান হয়েও আখারাতে গিয়ে মাদল বাজিয়েছে। চিরকিও নাচে কিনা সেখানে। বুড়ো সোথা ভালবাসে হোরোকে। কেউ তাই হোরোকে ঘৃণা করে না।

টুডু বললো—জংলীদের সঙ্গে মিশে দুদিন সেণ্ডেরা করেছে হোরো। টাঙি হাতে উৎসবে পাগলের মত নেচেছে। শিমূল গাছে আগুন ধরিয়েছে, দাউ দাউ করে আগুন জলেছে। সবার আগে এক লাফ দিয়ে এক কোপে জলন্ত গাছ কেটেছে হোরো।

টুডু গলার স্বর খুব অস্পষ্ট করে ভয়ে ভয়ে বললো—আমি দেখেছি, তারপর গায়ের ফোস্কাতে ঠাণ্ডা বাতাস লাগবার জন্য আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হোরো! চিরকি মুরমু আস্তে আস্তে এসে হোরোকে বুকে জড়িয়ে ধরেছে।

বোর্ডিংয়ের পাশে ছোট মাঠের ঘাসের ওপর সন্ধ্যার অন্ধকারে বসে আমরা টুডুর গল্প শুনছিলাম। হঠাৎ বোর্ডিংয়ের বারান্দা থেকে একটা বাঁশির স্বর ভেসে এল। সঙ্গে সঙ্গে তারই সঙ্গে মিলিয়ে, তালে তালে মাথা দুলিয়ে, টুডু গুন্ গুন্ করে গাইতে লাগলো।—

বাতা মাতা বিরুকো তালা
রে নালো হোম নির্ জা
রাগা ইংগা

উৎফুল্ল টুডুর হাবভাব আর উৎসাহ দেখে মনে হলো, এখনি সে নাচতে সুরু করে দেবে।

—কে বাজাচ্ছে বাঁশী। কে?

আমাদের ব্যস্ত জিজ্ঞাসার উত্তরে টুডু গান থামিয়ে বললো—ঐ, সেই গান। হোরো সেই সুরটা বাজাচ্ছে।

—কোন্ গান।

—চিরুকি মুরমুর গান।

—গানটার মানে কি টুডু?

টুডু উত্তর দিল—গানটার অর্থ, শোন আমার জোয়ান বন্ধু, পালিয়ে যেও না, এই ঘন জঙ্গলে আমায় একা ফেলে চলে যেও না।

একটা পুলকের সঞ্চার আমাদের মনের অগোচরে ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছিল। বললাম—এ যে আমাদেরই মত গান টুডু!

ইন্দু চাপা সুরে আবৃত্তি করলো।—শুন শুন হে পরাণ পিয়া… !

কিছুক্ষণ আবিষ্টের মত নিঝুম হয়ে বসেছিলাম আমরা। বোধ হয় আমরা মনে মনে চিরুকি মুরমু নামে বনের লতার মত না-দেখা একটি মেয়েকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলাম—না, তোমার বন্ধু পালিয়ে যাবে না। আমরা প্রার্থনা করছি, হোরো তোমার কাছে ফিরে যাবে।

ফাদার লিগুনের গর্জন শুনতে পেয়ে চমকে উঠলাম। বোর্ডিংয়ের বারান্দায় অন্ধকারে যেন একটা ধস্তাধস্তি চলেছে। টুডু দৌড়ে গিয়ে ঘটনাটা স্বচক্ষে দেখে ফিরে এল। সন্ত্রস্তের মত হাঁপাতে হাঁপাতে বললো। ফাদার লিগুন হোরোর বাঁশী ভেঙে দিয়েছে।

আমাদের সবার মনে একসঙ্গে ধক করে কতগুলি প্রতিহিংসার শিখা জ্বলে উঠলো। রাগের মাথায় বললাম—ঘা কতক জমিয়ে দিতে পারলো না হোরো?

টুডু বিমর্ষ ভাবে বললে—আমারও কেমন ভয় হচ্ছে। হোরো বড় গোঁয়ার। ফাদারকে এর ফল টের পাইয়ে দেবে ষ্টীফান।

কিন্তু এর পর ষ্টীফান হোরোর গোঁয়ার্তুমির কোন প্রমাণ পেলাম না। বরং দেখলাম, গোঁ ধরেছেন ফাদার লিগুন। ফাদার লিগুনের অভিযান আরম্ভ হয়ে গেছে। প্রতি সপ্তাহে একবার সফরে বের হন। কখনো ভোজপুরী লেঠেল সঙ্গে যায়, কখনো

বা আট দশটা কনেস্টবল। থানাতে একটা চিঠি দিলেই কনেস্টবল চলে আসে। যেন একটা যোদ্ধার দল নিয়ে দুদিনের জন্য জঙ্গল এলাকায় অদৃশ্য হয়ে যান ফাদার লিগুন। সত্যিই তিনি একজন ধর্মযোদ্ধা। আমরা শুধু মনমরা হয়ে ভাবতাম ফাদার লিগুনের এই রহস্যময় আনাগোনা কবে বন্ধ হবে? কবে শান্ত হবে তাঁর লাল্‌চে মুখের উত্তেজনা?

টুডুর কাছে শুনে স্পষ্ট করে বুঝলাম—মোরাঙ্গি পাহাড়ের মুরমুদের ডিহিতেই ফাদার লিগুনের অভিযান সুরু হয়েছে। পাহাড়ের গায়ে এরই মধ্যে একটি মাটির গির্জা তৈরী করে ফেলেচেন ফাদার লিগুন। অরণ্যের বুকের ভেতর ঢুকে তিনি যেন লক্ষ বছরের বৃদ্ধ যত বোঙাদের শিলাময় বেদী কাঁপিয়ে দিয়ে এসেছেন।

খুব বেশী দিন পার হয়নি, শুনলাম, মোরাঙ্গি পাহাড়ে একটা হাঙ্গামা হয়ে গেছে। মাটির গির্জাটা ভেঙ্গে ধুলো করে দিয়েছে। কে করেছে?

যে করেছে, তাকে আমরা স্বচক্ষে দেখলাম। বুড়ো সোখা। সেসন জজের আদালতে ভীড়ের মধ্যে মাথা গুঁজে আমরাও রায় শুনলাম—বুড়ো সোখার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর।

স্টীফান হোরোকে দেখতাম, বোর্ডিংয়ের বাগানে একটা বুড়ো বটের ঝুরিতে দোল্‌না বেঁধে সময় অসময় শুধু দোল খায়। দুলে দুলে যেন এক দুঃসহ গায়ের জ্বালা জুড়িয়ে নিচ্ছে স্টীফান হোরো।

নন-কো অপারেশনের ঝড় বইল সারা দেশে। আমরা স্কুল ছাড়বো। জালিয়ানওয়ালা বাগের অপমান আমাদের অশান্ত করে তুললো।

আমরা বাঙালী আর বিহারী ছেলেরা স্কুল ছাড়লাম। রাজার ছেলেরা কেউ ছাড়লো না। খৃষ্টান ছেলেরাও নয়—টুডু টিগ্‌গা বেসরা খাল্‌খো কেউ নয়। আমরা পিকেটিং করে ওদের বাধা দিতে লাগলাম।

আমাদের খুব ভরসা ছিল, হোরো আমাদের দলে আসবে। ফাদার লিগুন যেভাবে ওকে অপমান করেছে, জীবনে সে আর কোন পাদরী বা সাদা-চামড়াকে সহ্য করতে পারবে কি না সন্দেহ।

আমরা স্কুলের ফটকে পিকেটিং করছিলাম। দেখলাম হোরো আসছে।—স্বতন্ত্র ভারত কি জয়! জয়ধ্বনি করে আমরা হোরোকে অভ্যর্থনা জানালাম।

হোরো এগিয়ে এসে ইন্দুকে একটা ধাক্কা দিল, পরেশের হাতটা ঠেলে সরিয়ে দিল। বন শূয়োরের মত গোঁ গোঁ করে পথ ক'রে নিয়ে ক্লাসে গিয়ে ঢুকলো।

সেইদিন হোরোকে আমরা ভাল করে চিন্‌লাম। পাদরীদের ক্রীতদাস, মনুষ্যত্বহীন, মর্যাদাশূন্য, মূর্খ জংলী হোরো। স্বতন্ত্র ভারতবর্ষকে চিনলো না, একটু শ্রদ্ধা

করলো না। চিনলো শুধু ওর জঙ্গলটাকে। কিন্তু তোর জঙ্গলটা যে ভারতবর্ষের মধ্যেই রে বনরুষ! ভারতবর্ষের বাইরে তো নয়!

আট বছর পরের কথা। আমি লেপো থানার ভারপ্রাপ্ত দারোগা। সকাল-বেলায় কজন বিরসাইট মুণ্ডা এসেছে হাজিরা দিতে। জেল থেকে আজই ওরা খালাস পেয়েছে। এখানে হাজিরা দিয়ে তারপর নিজের নিজের ডিহিতে চলে যাবে। বিরসাইটরা অত্যন্ত সন্দেহভাজন জীব। প্রতি বছর হাঙ্গামা বাধায়। পুলিশকে ব্যতিব্যস্ত করে। জঙ্গল আইন মানে না, মহাজনদের পিটিয়ে তাড়িয়ে দেয়, চৌকীদারী ট্যাক্স দিতে চায় না। বাজারে বসলে তোলা দেবে না। জমি ক্রোক করতে গেলে আদালতের পেয়াদাকে টাঙি নিয়ে কাটতে আসে। দু'বছর আগে একবার স্বরাজ ঘোষণা করেছিল বিরসাইট মুণ্ডারা। পাদরীকে মেরেছে, পুলিশকে মেরেছে, অনেকগুলি পুল ভেঙেছে। ওরমান্ঝির জঙ্গলে একটা খণ্ডযুদ্ধ হয়েছিল ওদের সঙ্গে।

সব চেয়ে শেষে হাজিরা লেখাতে যে লোকটা উঠে এল তার নাম রুন্নু হোরো।

ডায়েরীর ওপর থেকে চোখ তুলে লোকটার মুখের দিকে তাকালাম। তার মাথার চুলের জংলী খোঁপাটাও জটার চূড়ার মত হয়ে গেছে। গলায় একটা ভেলাফলের মালা, আদুড় গা, কোমরে ছোট একটি কাপড় জড়ানো। হাতে একটা কাঁসার বালা। এই প্রাগৈতিহাসিক সজ্জার মধ্যে শুধু একজোড়া সুশানিত আধুনিক চোখ…।

বিস্ময় চাপ্‌তে গিয়ে তার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বললাম—ষ্টীফান হোরো।

লোকটা মিষ্টি হেসে বললো—না না ঘোষ, আমি রুন্নু হোরো।

—তুমিও একজন বিরসাইট?

—আমি বিরসা ভগবানের শিষ্য!

—বিরসা ভগবান? সে কে?

—সে আমাদের গান্ধী ছিল ঘোষ। আমি তাঁকে চোখে দেখিনি, আমার বাবার মুখে তাঁর কথা শুনেছি। ইংরেজের জেলখানার অন্ধকারে একজন কয়েদির মত মরে গেছে আমাদের বিরসা ভগবান। তাঁর চেহারা দেখতে কেমন ছিল জান ঘোষ।

—কেমন?

—যীশু খ্রীষ্টের মত।

একটু চুপ করে থেকে হোরো বললো—আমাদের জঙ্গলে বাইরে থেকে অনেক পাপ

এসে ঢুকেছে, ঘোষ। তাই বিরসা ভগবান আমাদের সাবধান করে দিয়েছেন। তাঁর অনুরোধ কি ভুলতে পারি?

আমি ডাক্‌লাম। —স্টীফান হোরো।

হোরো প্রতিবাদ করলো। —বল, রুনরু হোরো।

চুপ করে গেলাম। হোরো নিজে থেকেই খুসী হয়ে নানা খবর জিজ্ঞাসা করতে আরম্ভ করলো। —ইন্দু কোথায়? পরেশ কি করছে?

চারদিকে একবার সাবধানে তাকিয়ে নিয়ে হোরোকে প্রশ্ন করলাম—এত রোগা হয়ে গেলে কেন হোরো?

হোরো—আমার টি-বি হয়েছে। আচ্ছা, এবার যাই আমি।

একটা কথা জানবার জন্য মনটা ছট্‌ফট্‌ করছিল। তবু সঙ্কোচ কাটিয়ে উঠতে পারছিলাম না। শেষে সাহস করে বলেই ফেল্‌লাম। —একটা খবর জানতে বড় ইচ্ছে করছে হোরো।

হোরো—বল।

জিজ্ঞাসা করলাম—চির্‌কি মুরমু কোথায়?

হোরো শান্তভাবে উত্তর দিল। —ও; জানে না বুঝি? ফাদার লিগুনের মিশনে চলে গেছে চির্‌কি। খৃষ্টান হয়েছে। এখন হাজারিবাগের কনভেণ্টে থাকে।

স্টীফানের চোখের দৃষ্টিটা চিক চিক ক'রে উঠলো, তীক্ষ্ণ তীরের ফলার মতই, কিন্তু জলে ভেজা। আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করা হলো না, স্টীফানও নিঃশব্দে চলে গেল।

কাউকে মুখ ফুটে বল্‌তে লজ্জা করবে, একটা ভুলের স্মৃতি কিছুক্ষণের জন্য কাঁটার মত মনের মধ্যে বিঁধছিল, হয়তো আমরাই নিরপেক্ষ থেকে চতুর্থ পাণিপথের যুদ্ধে স্টীফানকে হারিয়ে দিলাম। স্টীফানও বনবাসে চলে গেল।

তিন অধ্যায়

অহিভূষণ হঠাৎ এসে বললো—'ভাই ভবানী, একটা কন্‌ফিডেন্সিয়াল টক ছিল তোর সঙ্গে।'

আড্ডার মাঝখানে বসেছিলাম। বারীন তখন বলছিল—'কি আশ্চর্য, মেয়েটাকে মুহূর্তের জন্যও হাসতে দেখলাম না। লোকের দিকে একটু চোখ তুলে তাকাবার সাহস পর্যন্ত নেই। এই ধরণের মেয়েদের মতি-গতি যদি একটু অ্যানালিসিস করে দেখ, তা'হলে বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়……।'

পুলিন বাঁড়ুয্যের মেয়ে বন্দনার কথা বলছিল বারীন। এই রকম একটা সুপ্রাসঙ্গিক অবস্থায় এসে অহিভূষণ বাধা দিল। আরও বেশী অপ্রসন্ন হয়ে উঠলাম, অহিভূষণ যখন বললো—'এখানে বলতে পারবো না ভাই, একটু ডিসট্যান্সে যেতে হবে।'

এই রকম বিশ্রী ভাবেই অযথা ইংরেজী বলে অহিভূষণ। ইদানীং আরও বেশী ক'রে বলে। অবশ্য আমরা জানি, অহিভূষণের লেখাপড়া ফোর্থ ক্লাসের চৌকাঠ পার হয়নি। সেই যে আট বছর আগে আমরা অকৃতি অহিকে একা ফোর্থ ক্লাসে রেখে সদলে থার্ডে চলে গেলাম, তারপর থেকে জীবনে সত্যিই ক্লাস হিসেবে ওর সঙ্গে আর এক হতে পারলাম না। অহি আজও যে আমাদের ক্লাবে ও আড্ডায় আসে সেটা তার নিজেরই আগ্রহ। আমরা ওকে কখনো চাইনি। চলে যেতেও অবশ্য স্পষ্ট করে কখনো বলি না। কিন্তু আমাদের আচরণে সেটা ওর বোঝা উচিত ছিল। অহি যেন আমাদের তাচ্ছিল্যগুলিকে একেবারেই গায়ে মাখে না। সব জেনে শুনেই সে আমাদের সঙ্গে মেশে। তার প্রতি আমাদের একটা নির্বিকার ঔদাসীন্য অনাগ্রহ ও করুণাকে সে মাথা পেতে মেনে নিয়েছে। অহি যেন আজও আমাদের ক্লাসটা ছাড়তে চায় না। যেন শেষ বেঞ্চের এক কোণে একটু পৃথক হয়ে, সবার পেছনে বসে থাকবে, তবু আমাদেরই সঙ্গে।

বলতে ভুলে গেছি, বারীনও সেই ফোর্থ ক্লাসেই ফেল করেছিল। আর পড়া শুনা না করে স্কুল ছেড়ে দিল। এবং ইংরিজীও বলে বেশ বিশ্রীভাবে। কিন্তু আট বছর পরেও বারীন আর আমরা যেন এক ক্লাসেই আছি। বারীন কণ্টাকট্রারী করে, এরই মধ্যে বেশ কিছু, যাকে বলে, বেশ সম্পন্ন হয়ে উঠেছে বারীন। কিন্তু অহি? অহি ঠিক তার উল্টো।

অহির কথা একেবারে স্বতন্ত্র। বড় সাংঘাতিকভাবে ফেল করেছে অহি। বাইশ টাকা মাইনের একটি চাকরী করে। দুঃখটা আসলে ঐ বাইশ টাকায় বাঁধা দীনতার জন্য নয়। আসল কথা হলো চাকরীটাই। বড় নীচে নোংরা নগণ্য চাকরী। কখনো কোন ভদ্রলোকের ছেলেকে এরকম চাকরী করতে আমরা দেখিনি, শুনিনি।

খুব ভোরে ঘুম ছেড়ে বাইরে বেড়ানো যাদের অভ্যাস, তারাই শুধু অহিভূষণের চাকরীর স্বরূপ জানে, কারণ তারাই ব্যাপারটা স্বচক্ষে দেখতে পায়। এক হাতে প্রকাণ্ড একটা খাতা, আর এক হাতে একটা লক্কড় সাইকেলের হ্যাণ্ডেল ধরে সহরের যত লেন আর বাইলেনের মোড়ে কিছুক্ষণের জন্য দাঁড়িয়ে থাকে অহিভূষণ। ভোরের আবছা অন্ধকারের মধ্যে সরুগলির মুখ থেকে এক এক করে চার পাঁচটি অদ্ভুত ধরণের মূর্তি এসে অহির কাছে দাঁড়ায়। খাতাটা খুলে অহি তাদের হাজিরা লেখে। নীচু স্বরে কয়েকটা কথা বলে অহি, কখনো বা বিরক্ত হয়ে ধমক দেয়। তারপরেই অহিভূষণের লক্কড় সাইকেল আবার আর্তনাদ করে ওঠে। আর একটা গলির মোড়ে গিয়ে দাঁড়ায় অহিভূষণ চাটুয্যে।

আমাদের এই ছোট সহরের ছোট মিউনিসিপ্যালিটির একজন কর্মচারী হলো আমাদের পরিচিত ও প্রাক্তন সহপাঠী অহিভূষণ। রাত্রি ভোর হতে না হতে, পাখির ঘুম ভাঙ্গার আগেই মেথরেরা সহরের ময়লা পরিষ্কার করে, এক একটা দল বের হয় ঝাড়ু হাতে রাস্তা ঝাঁট দিতে, কয়েকটা দল বের হয় মাথার ওপর পুরীষবাহী বড বড টিনের টব নিয়ে। দু'চাকার ওপর পিপে বসানো একটা অদ্ভুত ধরণের গাড়ী আছে মিউনিসিপ্যালিটির। একটা বুড়ো বলদ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে গাড়ীটাকে রাস্তা দিয়ে টেনে নিয়ে যায়। পিপের গায়ে দু'সারি ফুটো আছে। খুব ভোরে উঠলেই দেখতে পাওয়া যাবে, পিপে গাড়ীটা ভ্রাম্যমান ধারাযন্ত্রের মত হেলে দুলে কঁকিয়ে কঁকিয়ে চলে যাচ্ছে, রাস্তার ধুলোর দৌরাত্ম্যকে শান্তিজল ছিটিয়ে শান্ত করে দিয়ে। আমাদের অহিভূষণের চাকরীটা হলো —এই সব কাজ তদারক করা। তারই জন্য বাইশটি টাকা মাইনে পায় অহি। লেখাপড়া শেখেনি, বাপ বেঁচে নেই, বাপের পয়সাও ছিল না। মা আছে, মায়ের অসুখও আছে। তা ছাড়া নিজের পেটের দায় তো আছেই। সামর্থ্য নেই, যোগ্যতা নেই, তাই বোধ হয় এই সামান্য জীবনের দায়টুকু মেটাতে গিয়ে, উপায় খুঁজতে খুঁজতে একেবারে নরকের কাছাকাছি চলে এসেছে অহি।

দুপুর বেলা যখন আদালতে দশটার ঘণ্টা বাজে, অর্থাৎ ঠিক যেসময়ে ভদ্রলোকের কাজের জীবন কলরব করে ওঠে, সেই সময়ে এক ভাঙা ঘরের নিভৃতে অহিভূষণের ক্লান্ত শরীর নিঃশব্দে ঝিমোয়। সূর্য উঠলে আমরা ঘরের বার হই। সূর্য উঠলে অহি ঘরে ঢোকে। আমরা কাছারী রোড দিয়ে গাড়ি ঘোড়া শব্দ ও জনতা ভেদ করে যাই জীবিকা অর্জন করতে। অহি ঘুরে বেড়ায় নির্জন নিস্তব্ধ ও অবসন্ন শেষরাত্রের অস্পষ্ট

গলিঘুঁজির মোড়ে, ড্রেন পায়খানা ডাষ্টবিনসঙ্কুল একটা ক্লেদাক্ত জগতের চোরাপথে।

বিকেল বেলা অহিকে আরও দুবার কাজের ক্ষেত্রে দেখা যায়। লক্কর সাইকেলটার পিঠে সওয়ার হয়ে মাইল দেড়েক দূরে সহরের বাইরে গিয়ে শ্মশান ঘাটের সিঁড়িতে একবার দাঁড়ায়। ডোমটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে, মড়া আর চিতার হিসাব নেয়। তার পরেই গিয়ে দাঁড়ায় খালের ধারে—ময়লা ময়দানের কাছে। দুটো ইনসিনারেটারের চিম্‌নি থেকে দগ্ধ পুরীষের দুর্গন্ধ ধূম বাতাস আচ্ছন্ন করে। অহির সাইকেলের শব্দ একটা অলস গৃধিনীর দল আবর্জনার স্তূপের আড়ালে চমকে ওঠে, বড় বড় পাখা ছড়িয়ে আকাশে উঠে চক্কর দিয়ে উড়তে থাকে। অহি দাঁড়িয়ে থাকে কিছুক্ষণ। উড়ন্ত গৃধিনীর পাখার চঞ্চল ছায়া আর শব্দের নীচে দাঁড়িয়ে এইখানে সূর্যাস্ত দেখে অহিভূষণ।

কথায় কথায় অহি বলে—এমন চাকরী থাকলেই বা কি আর গেলেই বা কি? চাকরীর ব্যাপারে কত ভাবে ফাঁকি দিচ্ছে অহি, সেই সব বিবরণ বেশ ফলাও করে মাঝে মাঝে শোনায়। আমাদের একেবারে নিসংশয় করবার জন্য অহি প্রায়ই বলে—'সত্যি বলছি ভবানী, প্রাণ গেলেও আমি গলি ফলির ভেতর ঢুকতে পারবো না।'

বারীন প্রশ্ন করে—'ময়লা ময়দানে যেতে হয়না তোকে?'

অহি—'কস্মিন কালেও না। আমি দূরে রাস্তার ওপরে দাঁড়িয়েই কাজ দেখি।'

আমি জিজ্ঞাসা করি—'চিতা গুণতে যাস না আজকাল?'

অহি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দেয়—মোটেই না! ঘাটের সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে হিসাব নিই, শ্মশানে নামি না।

একটু চুপ করে থেকে অহি আবার নিজে থেকেই একটু অস্বাভাবিক ভাবে গর্ব করে বলতে থাকে—কী ভেবেছে মিউনিসিপ্যালিটি, বাইশটে টাকা মাইনে দেয় বলেই বামুনের ছেলেকে দিয়ে যাচ্ছেতাই করিয়ে নেবে?

আমরা প্রায় একসঙ্গে সবাই হেসে ফেলতাম। অহি একটু আশ্চর্য হয়ে তাকিয়ে থাকতো, আমাদের হাসির অর্থ বুঝবার চেষ্টা করতো।

অহির কথা নিয়ে বেশীক্ষণ মাথা ঘামাবার মত উৎসাহ কারও ছিল না। কথা প্রসঙ্গে এক আধটু যা হলো তাই যথেষ্ট। পর মুহূর্তেই আমরা উৎকর্ণ হয়ে উঠতাম, কারণ বারীন একটি সুস্বাদু কাহিনী পরিবেশন আরম্ভ করে দিয়েছে।—কি বলবো ভাই আজকাল যে সব কাণ্ড আরম্ভ করেছে ললিতা! ফিক্ ফিক্ করে হাসে। ইয়া বড় বড় চোখ করে বেপরোয়া তাকিয়ে থাকে। হাবভাবে স্পষ্ট জানিয়ে দিচ্ছে যে...কিন্তু আমি ভাই ভিড়তে চাই না।

অহি বেফাঁস রসিকতা করে বসে—'তা হ'লে আমি ভিড়ে যাই, কি বল?'

হঠাৎ প্রসঙ্গ বন্ধ করে দিয়ে, মুখটা কঠোর করে অহির দিকে তাকিয়ে বারীন বলে—'তোমাকে এর মধ্যে ফোড়ণ দিতে বলেছে কে ?'

এসব কুৎসার অম্বলে ফোড়ণ সচরাচর আমরাই দিয়ে থাকি। অহি কখনো মন্তব্য করতো না, ভদ্রবাড়ীর তরুণীদের নামে কোন রসাল প্রসঙ্গ উঠলেই অহি বরং নিস্পৃহ ভাবে চুপ করে থাকতো। অতি পরিচিত এই সব প্রতিবেশিনীদের কাহিনীগুলিও ওর কাছে আজ যেন রাণী পরী আর দেবীর রূপকথার মত এক অতিদূর অলীক দেশের গল্প হয়ে গেছে। এই সব প্রসঙ্গে তাই অহিকে কখনো উৎসাহ প্রকাশ করতে আমরা দেখিনি ! এই প্রথম হঠাৎ ভুল করে ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে বারীনও তাকে সাবধান করে দিল। চুপ করে রইল অহি। আর কখনো তার এ ভুল হয়নি।

অহি এইভাবেই তার অধিকারের সীমা আমাদের ধমক খেয়েই বুঝে ফেলে। যেন মাথা পেতে ক্রটি স্বীকার করে নেয়। মেলা মেশার দিক দিয়ে আমাদেরই আড্ডার ছেলে অহিভূষণ, আমাদেরই প্রাক্তন সহপাঠি, এক সহরের ছেলে। কিন্তু মনের রুচির দিক থেকে সে যে ভিন পাড়ার লোক, সে তত্ত্ব তাকে আমরা কারণে অকারণে বুঝিয়ে দিই। অহিও বুঝতে পারে।

কিন্তু একটি ক্ষেত্রে একটু ব্যতিক্রম ছিল। সেদিনের আড্ডায় বারীন সেই মেয়েটির নামেই যা-খুসী-তাই বলছিল। মেয়েটির নাম বন্দনা। এই বন্দনারই মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করে বারীন বুঝতে পেরেছে যে…।

বন্দনার নামে যখন কথা উঠতো, তিলমাত্র ভদ্রতার সঙ্কোচ বা শ্রদ্ধার বালাই কেউ অনুভব করতো না। বিশেষ করে বারীন। বন্দনাকে একটু ভাল করেই আমরা চিনে ফেলেছি। তাই অবিশ্বাস করার মত কোন প্রশ্ন থাকতে পারে, কষ্ট করে এতটা ভাববার কোন দরকার ছিল না আমাদের। অন্য কোন মেয়ের সম্পর্কে বারীনের রসনার অসংযম হয়তো আমরা বাধা দিতাম, প্রশ্ন করতাম, সন্দেহ প্রকাশ করতাম। কিন্তু বন্দনা ঠিক সেই সব মেয়েদের দলে নয়, তাদের বাইরে, অনেক নীচে। যদিও আমাদেরই পরিচিত পুলিন বাঁড়ুজ্যের মেয়ে বন্দনা। বন্দনার চারিত্রিক রহস্য নিয়ে সবাই আপসোস করতো, কটূক্তি করতো, ঘৃণায় ছটফট করে উঠতো। কখনো বা এক ঝাঁক রসিকতার মাছি ভন্ ভন্ করে উঠতো। অহিও হেসে মাথা নেড়ে মন্তব্য করতো—ডোবালে, ডোবালে, ভদ্র সমাজের নাম ডুবিয়ে ছাড়লে ছুঁড়ি।

শুধু এই একটি ক্ষেত্রে অহির অধিকারের সীমা স্মরণ করিয়ে দেবার কথা আমাদের কারও মনে হতো না। একক্ষেত্রে অহির অধিকার যেন পরোক্ষভাবে আমরা স্বীকার করে নিয়েছিলাম। বন্দনাকে কুৎসা করার এই সমানাধিকার পেয়ে অহি যেন ধন্য হয়ে যেত।

মুখ খুলে রসিকতা করতো অহি। এই একটি সুযোগকে বার বার সদ্ব্যবহার ক'রে অহি উপলব্ধি করতো—সে আমাদেরই মধ্যে একজন।

শুধু সন্ধ্যে হলে অহি আমাদের আড্ডায় একবার আসে। না এসে পারে না; নেশাড়ে মানুষ যেমন সন্ধ্যে হলে একবার শুঁড়ির দোকানে না যেয়ে পারে না, অহির অবস্থাটা বোধ হয় সেই রকম। সেই কবে আট বছর আগে আমাদের সঙ্গে এক ক্লাসে পড়তো, অহিভূষণ, একই রিং-এ বক্সিং করতো, একই প্যারালাল বারএ পীকক হতো—সেই পুরানো নেশা আজও বোধ হয় ছাড়তে পারেনি অহি। একটু বেশী ধোপ-দুরস্ত কাপড় চোপড় পরে সন্ধ্যে বেলা আমাদের আসরে দেখা দেয়। আমাদের বিদ্রূপ বিরক্তি অশ্রদ্ধা—সবই অকাতরে সহ্য করে। ছেলেবেলায় অহির এক একটা কঠোর স্ট্রেট লেফট ও ডান হাতের পাঞ্চ কতবার আমাদের ছিটকে বের করে দিয়েছে রিং থেকে বাইরে—তিন হাত দূরে। আজ যেন সেই অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করছে অহি। আমাদের সব অশ্রদ্ধার আঘাত সহ্য করে, সাধ করেই পরাজিত হয়ে আমাদের রিং-এর মধ্যে থাকতে চায় অহিভূষণ।

—একটু ডিসট্যান্সে যেতে হবে ভাই, প্রাইভেট টক আছে।

অহির অনুরোধ শুনে উঠে গিয়ে একটু আড়ালে দাঁড়ালাম। বললাম—'কি বলছিলি, বল্।'

অহি—'তোর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলতে হবে ভাই, যেন আমার নামটা কেটে না দেন।'

আমার কাকা হলেন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান। কাকা একটু বেশী পরোপকারী ও সদয় মানুষ। তাই আশ্চর্য হলাম, অহিভূষণের মত এক গরীব কর্মচারীর চাকরীটা খাবার মত উৎসাহ তাঁর কেন হবে?

বললাম—'তোকে বরখাস্ত করার কথা হয়েছে নাকি?'

'—বরখাস্ত নয় ভাই, আমার নামটা কেটে দিচ্ছেন।'

'—বরখাস্ত নয়, নাম কেটে দেওয়া হচ্ছে, কথাটার অর্থ বুঝতে পারছি না, অহি। ঠিক করে বল্।'

—'তুই তো জানিস, আমার পোষ্টটার নাম ছিল…।

—'না জানি না।'

—আমি হ'লাম এ সি এস।

—সেটা আবার কি জিনিস?

—'আমি হলাম অ্যাসিষ্টেণ্ট কন্‌জারভেন্সী সুপারভাইসার। পাঁচ বছর ধরে এই নাম চলে আসছে। আজ হঠাৎ তোর কাকা চেয়ারম্যান হয়ে কোথায় একটু

উপকার করবেন, না উঠে পড়ে লেগেছেন আমার নামটার পেছনে। নামটা বদলে দিচ্ছেন।'

—তাতে তোর ক্ষতিটা কি? মাইনে তো আর কমলো না।

—না মাইরি, সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নাম সহ্য করতে পারবো না মাইরি। তুই বল্ ভাই, ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে…।

—তোরই বা এত নাম নিয়ে মাথাব্যথা কেন? তোর আগে যে লোকটা সর্দার ছিল, সেই মান্‌কিরাম যে তোর চেয়েও বেশী মাইনে পেত।

অহির মুখটা বিষণ্ণ হয়ে উঠলো। একটু অভিমান করেই যেন বললো—শেষে তুইও মান্‌কিরামের সঙ্গে আমার তুলনা করলি, ভবানী?

একটু রাগ করে বললাম—মান্‌কিরাম তোর চেয়ে ছোট কিসে রে অহি? মানুষকে যে খুব ছোট করে দেখতে শিখেছিস অথচ নিজে…

অহি শুধু চুপ করে তাকিয়ে রইল, কোন উত্তর দিল না। এইভাবেই সামান্য একটা ধমকে তার সব বিদ্রোহ শান্ত হয়ে যায়। আজও চুপ করে আমার ধমক আর মন্তব্যটাকেই মেনে নিল অহি।

বাড়ীতে ফিরে এসে অহির কথাটা কেন জানি বারবার মনে পড়ছিল। কাকাকে হেসে হেসে বললাম—অহি নামে আপনাদের মিউনিসিপ্যালিটির একজন প্রকাণ্ড অফিসারের ডেসিগনেশানটা নাকি আপনি খারিজ করে দিচ্ছেন?

কাকা উত্তর দিলেন—হুঁ, ঐ নামটা আইনতঃ চলে না। ঐ নাম থাকলে মাইনে ও গ্রেড আইনমাফিক করতে হয়। তা ছাড়া তাহলে অহির চাকরীও থাকে না। কেন না, অ্যাসিষ্টেণ্ট কন্‌জারভেন্সী সুপার-ভাইসার রাখতে হলে ট্রেনিং-নেওয়া পাশ করা লোক চাই। অহির তো সে সব যোগ্যতা নেই।

—কিন্তু সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নামটা সত্যিই বড় বিশ্রী। গরিব হলেও ভদ্রলোকের ছেলে তো, অহির মনে বড় লেগেছে।

কাকা দুঃখিত হয়ে বললেন—কি করবো বল্? কোন উপায় নেই। অহির মাইনে তিন টাকা বাড়িয়ে দেবার ক্ষমতা আছে আমার এবং বাড়িয়ে দেবো ঠিক, কিন্তু ঐ পোষ্টটা, ও ভাবে ঐ নাম দিয়ে রাখবার উপায় নেই। আইনে বাধে।

পরদিন সকাল বেলা অহির কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু ঘরে বসে অহির গলার স্বর শুনতে পেয়ে আবার ঘটনাটা নতুন করে মনে পড়ে গেল। কাকার সেরেস্তায় এসে অহি কাকাকে সেই অনুরোধ নিয়েই আবার পাকড়াও করেছে।

অহি বলছিল—আমার এই পোষ্টের নামটা বদলে দেবেন না কাকাবাবু।

কাকা বোধ হয় একটু বিরক্ত হয়েই বললেন—কেন হে কাকাবাবু?

কাকার উত্তরটার মধ্যে এবং গলার স্বরে একটা প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের আভাসও ছিল যেন। অহির মুখে 'কাকাবাবু' ডাক হয়তো তিনি পছন্দ করলেন না।

কাকার সেরেস্তার দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু আড়াল থেকে উঁকি দিলাম। দেখলাম, অহি দাঁড়িয়ে আছে। অহির নোংরা খাকি হাফ প্যাণ্ট আর বগলদাবা, হাজিরা খাতাটা ওর সর্দারীর সাজটা নিখুঁত করে তুলেছে। অহির মুখটা আজও কিন্তু সেই পুরানো ধাঁচেই রয়ে গেছে। নাক আর চিবুকে সেই দক্ষিণী নটরাজের ব্রঞ্জের মত ছাঁদটা আজও মুছে যায়নি। গড়নটা কঠিন, কিন্তু ছাঁদটা কোমল। এই অহি একদিন আমাদের স্কুলে প্রাইজের অনুষ্ঠানে কপালে রক্তচন্দনের তিলক কেটে মেঘনাদ সেজেছে, আবৃত্তি করেছে। কী সুন্দর ওকে মানাতো!

আপাততঃ দেখছিলাম, অহিভূষণ কাকার প্রশ্নে একটু কাঁচু-মাচু হয়ে বললো—আজ্ঞে আমি বলছিলাম···।

কাকা—কিছু বলতে হবে না তোমাকে। আমি যা করেছি তোমার ভালর জন্যই করেছি। হয়তো মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেব যদি······।

অহি—মাইনে বাড়াবার জন্য আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাই না, স্যার। কিন্তু আমার পোষ্টের নামটা যদি আপনি একটু অনুগ্রহ করে···।

কাকা আমার পরম দয়ালু মানুষ, কিন্তু ভিক্ষে করবার এত বস্তু থাকতে কেউ এসে পোষ্টের সম্মান ভিক্ষে করবে, সে ঔদ্ধত্যকে বোধ হয় পৃথিবীর কোন দয়ালু প্রশ্রয় দিতে পারেন না। কাকা হঠাৎ ভয়ানক ভাবে চটে গিয়ে চোখ পাকিয়ে হিন্দী করে বলতে লাগলেন—মাইনে বাড়ানোর দরকার নেই, না? তবে চাকরীটারই বা কি দরকার হে সর্দার? খুব বাড় বেড়েছে দেখছি?

—আজ্ঞে না হুজুর! সঙ্গে সঙ্গে এক সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের মুখ দীনতায় সঙ্কুচিত হয়ে আর্তস্বরে যেন ক্ষমা প্রার্থনা করে উঠলো।

কাকা বললেন—যাও, খাড়া মৎ রহো।

অহি আজকাল আর আমাদের সান্ধ্য আড্ডায় প্রতিদিন আসে না। আসে মাঝে মাঝে একটু গম্ভীর হয়ে থাকে। অহি বোধ হয় আমাদের অন্তরঙ্গতার সীমা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছে।

অহির আচরণের এই পরিবর্তন সকলেই লক্ষ্য করলো। আমিই একদিন সকলকে রহস্যটা ফাঁস করে দিলাম—মিউনিসিপ্যালিটি অহিকে সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার নাম দিয়েছে, অ্যাসিষ্টেণ্ট কন্‌জারভেন্সী সুপারভাইজার নামটা রদ করে দেওয়া হয়েছে, তাই অভিমান

হয়েছে অহির। কাকার কাছে এই নিয়ে তর্ক করতে গিয়েছিল। কাকা ধমক দিয়ে খেদিয়ে দিয়েছেন।

এর পরে যেদিন অহি আড্ডাতে এল, সকলে মিলে বেশ মিঠেকড়া করে ধম্‌কে দিল—'তোর আবার এই সব ঘোড়ারোগ কেন রে অহি? মাইনের পরোয়া করিস না, তাই নিয়ে চেয়ারম্যানের সঙ্গে মুখের ওপর তর্ক করতে যাস্‌। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের কাজটা করবি, অথচ বললে তোর একেবারে মাথা কাটা যাচ্ছে। তুই কি ভাবছিস নিজেকে, তুই একটা ভয়ানক রকমের অফিসার?

ধমক খেয়ে প্রতিবাদ করে না অহি। অভিযোগ স্বীকার করে নেয়। আজও অহি নিরুত্তর থেকে অভিযোগ স্বীকার করে নিল। কিন্তু বলিহারি ওর ধৈর্য আর সহ্যগুণ! শুধু আমাদের আড্ডার স্পর্শটুকুর লোভে ও সব সহ্য করতে পারে।

পর পর অনেকদিন পার হয়ে গেল, অহি আর আড্ডায় আসে না। হঠাৎ একদিন হাসতে হাসতে ক্লাবের বৈঠকে দেখা দিল অহি।

বীরভূমের এক গাঁয়ের এক গরীব স্কুলমাষ্টারের মেয়ের সঙ্গে আমাদের অহির বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেছে। অহি নিজে গিয়ে মেয়েকে দেখে এসেছে। আমাদের কাছে একটা সলজ্জ আনন্দে সব কথা বললো অহি—মেয়েটি দেখতে বেশ, ম্যাট্রিক ক্লাশ পর্যন্ত পড়েছে, গানটানও গাইতে পারে।

অহি যেন তার জীবনের এক নতুন সূর্যোদয়ের কথা বলে চলে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে সে বুঝতে পারেনি যে, কী বিসদৃশ, কী অশোভন, কী অন্যায় কুকাণ্ডের একটি বার্তা সে আমাদের কানের কাছে ছেড়ে দিয়ে গেলো। আমাদের মনের শান্তি নষ্ট হলো।

আমরা বুঝলাম, কত বড় ভাওঁতা দিয়ে এক ভদ্রলোকের মেয়ের সর্বনাশ করতে চলেছে অহি। বেচারী স্কুলমাষ্টার কখনো কল্পনাও করতে পারেনি যে এক সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের হাতে তাঁর মেয়েকে তিনি সঁপে দিতে চলেছেন! তিনি হয়তো শুধু জানেন, অ্যাসিষ্টেণ্ট কন্‌জারভেন্সী সুপারভাইজার নামে এক কর্‌করে অফিসারের সঙ্গে তাঁর মেয়ের……!

সমাজের একটা স্বাভাবিক আত্মরক্ষা করার শক্তি আছে। সেদিনই দু'পাতা চিঠি লিখে সব ব্যাপার আমরা জানিয়ে দিলাম স্কুলমাষ্টার ভদ্রলোককে। অহিও তিন দিন পরে বীরভূমের এক গেঁয়ো ডাকঘর থেকে টেলিগ্রাম পেল—বিয়ের প্রস্তাব বাতিল।

আমাদের যা করবার সব গোপনেই করেছিলাম। অহি কি বুঝলো, তাও আমরা জানি না। কিন্তু অহি আর আমাদের আড্ডায় এল না। এক মাসের মধ্যে নয়, এক বছরের মধ্যে একবারও নয়। এতদিনে সত্যি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল অহি।

মনুষ্যত্বের দিক দিয়ে বোধ হয় অনেক দিন আগে থেকেই বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল

অহি। শুধু ধোপদুরস্ত কাপড় পরে জোর করে ভদ্রলোক সাজবার চেষ্টা করতো। অল্পদিনের মধ্যে আমরা দেখলাম, হ্যাঁ খাঁটি সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার বটে অহি। হাজিরা খাতা বগলে নিয়ে গলিতে গলিতে নিঃসঙ্কোচে ঘুরে বেড়ায়, শ্মশানের চড়ায় নেমে চিতা গুণে আসে, ময়লা ময়দানের মাঝখানে দাঁড়িয়ে ট্রেঞ্চ কাটায়। ড্রেনের পাশে বসে মেরামত তদারক করে। নোংরা খাকি হাফ প্যাণ্ট পরে ক্লেদাক্ত পৃথিবীর চিহ্নিত পথে আন্তরিক নিষ্ঠা নিয়ে ঘুরে বেড়ায় অহি—লক্কড় সাইকেল আর্তনাদ করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পুলিনবাবু আর বন্দনা ঠিক এই ধরণের সমস্যাকেই একবার জটিল করে তোলবার চেষ্টা করলো।

দেনা দৈন্য আর বেকার অবস্থায় জীবনের বার আনা ভাগ সময় পণ্ড করে দিয়ে পুলিন বাঁড়ুয্যে শেষকালে জুতোর দোকান খুলেছিলেন। আমরা দেখতাম, পুলিনবাবুর দোকানে মেজের ওপর তিনচারজন মুচি সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা জুতো সেলাই করে। একটা কাঁচের আলমারী ছিল দোকানে, তার মধ্যে নতুন চামড়ার বাণ্ডিল সাজানো—ক্রোম, উইলোকাফ, কিড আর শামোয়া। দোকান ঘরের মধ্যেই কিছুটা স্থান ভিন্ন করে, একটা ভাল মেহগনি টেবিল আর চেয়ার নিয়ে বসে থাকতেন পুলিনবাবু। টেবিলের পাশে আবার একটা সুন্দর রঙীন পর্দা ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

এখানে বসলে মুচিদের আর ঠিক পাশাপাশি বা মুখোমুখি দেখতে পাওয়া যায় না। ঐ রঙীন পর্দাটা যেন পুলিনবাবুর মনের একটা সতর্ক ও জাগ্রত শ্রেণীমর্যাদার প্রতীকের মত ঝুলতো। মুচিদের কর্মভূমি থেকে তিনি যেন স্পষ্ট করে তাঁর জীবনের আসরটুকু সযত্নে ভিন্ন করে রাখতেন। শত হোক্, পরলোকগত ত্রৈলোক্য পণ্ডিতের নাতি তো! সাত-পুরুষের কৌলিক চেতনাকে একটা উপার্জনের দায়ের সঙ্গে একাকার করে দিতে পারেন না তিনি।

তিনজন মুচির মধ্যে একজনকে তিনি মিস্তিরি ব'লে ডাকতেন। আলমারী থেকে চামড়া বের করে মাপ মত কেটে মুচিদের দেওয়া, খদ্দেরের পায়ের তলায় কাগজ পেতে মাপ এঁকে নেওয়া ইত্যাদি সব কাজ মিস্তিরিই করে। জুতোর দোকানের জুতোত্বর সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখেন না পুলিনবাবু, তাঁর সম্পর্কে শুধু দোকানত্বের সঙ্গে। এর চেয়ে বেশী নীচে নামতে পারেন না পুলিনচন্দ্র বাড়ুয্যে।

এই পুলিনবাবুর মেয়ের নাম বন্দনা। এই সহরের স্কুলেই পড়েছে, এপাড়া আর ওপাড়ার মেয়েদের সঙ্গে মিশে কোনকালে মহিলা সমিতির বাৎসরিকীতে অভিনয় করেছে। চার বছর আগের কথাই ধরা যাক্, আমার ভাগ্নীর বিয়েতে বন্দনা একাই গান গেয়ে বাসর জমিয়েছে। বন্দনার স্কুল-বান্ধবীরা অনেকেই আর আজ বাপের

বাড়ীতে নেই ; শ্বশুরবাড়ী থেকে তারা মাঝে মাঝে যখন আসে, সবারই সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় তাদের। শুধু দেখা হয় না বন্দনার সঙ্গে। বন্দনা আজ সেই পুরাতন সখীত্বের বৃত্ত থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। বন্দনার খোঁজ বড় কেউ করে না। বন্দনা এখন কি বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে, সবাই জানে সে কথা। সেই সখীত্বের আগ্রহ দূরে থাক্, তাদের মনের দিক দিয়ে অস্পৃশ্যতা গোছের একটা বাধা বন্দনাকে আজ একেবারে অস্পৃষ্ট করে দিয়েছে।

হাসপাতালে কি একটা কাজ করছে বন্দনা। বন্দনার মা অবশ্য লোকের কাছে বলেন—নার্সের কাজ। কিন্তু তাই বা কি করে হয়? বন্দনা তো নার্সবিদ্যা পাশ করেনি। যাই হোক্, এতটা বাড়াবাড়ি পুলিন বাঁড়ুয্যের উচিত হয়নি। জীবনে টাকার প্রয়োজন কার না আছে? কিন্তু তাই ব'লে সব ভদ্রয়ানার সংস্কার অমান্য করে, সমাজের স্বীকৃতি-অস্বীকৃতির তোয়াক্কা না করে, রুচি-অরুচির বালাই না রেখে, শুধু কাজ আর পয়সাকে শ্রেষ্ঠ করে তোলা মানুষের লক্ষণ নয়! এ'কে জীবিকা অর্জন বলে না, এটা হলো জীবনকে বিকিয়ে দেওয়া।

পুলীন বাঁড়ুয্যে খুবই গরীব সন্দেহ নেই। তাঁর গরীবত্বের জন্য অবশ্য আমাদের সবারই সমবেদনা আছে। কিন্তু গরীবত্ব ঘোচাবার যে পথ তিনি বেছে নিলেন, সেই পথটাকে কেউ সম্মান করবে না।

পুলিনবাবু বোধ হয় তাঁর ভবিষ্যৎটা বুঝতে পারেননি, নইলে এতটা স্পর্দ্ধা তাঁর হতো না। কিন্তু অতি অল্পদিনেই তিনি বুঝলেন, একেবারে মর্মে মর্মে বুঝলেন।

কাকা একদিন আমাকে ডেকে বললেন—হ্যাঁ রে ভবানী, পুলিন চামারের দোকানে জুতো-টুতো কেমন তৈরী করে? বেশ ভাল?

কাকা অক্লেশে যে কথাটা বললেন, তাতেই হঠাৎ একটা শক পেলাম যেন। আজ এক বছরের মধ্যে পুলিন বাঁড়ুয্যে কাকার কাছে কত সহজ ও স্বাভাবিক নিয়মে পুলিন চামার হয়ে গেছে।

বিব্রত ভাবে উত্তর দিলাম—হ্যাঁ, ভালই তৈরী করে।

কাকা—তাহ'লে এবার পূজোর সময় পুলিন চামারকেই অর্ডার দিস্!

কথাটা যেন বাতাসে ছড়িয়ে পড়লো। ঠাট্টা ক'রে নয়, বেশ সহজভাবেই সকলে পুলিন চামার কথাটা ব্যবহার করে। পুলিনবাবুও নিশ্চয় স্বকর্ণে কথাটা শুনেছেন। এখন বুঝুন তিনি, এই নতুন উপাধির গৌরব প্রতি মুহূর্তে তিলে তিলে উপভোগ করে প্রায়শ্চিত্ত করুন।

জুতোর অর্ডার দিতে গিয়ে দেখলাম, ক'মাসের মধ্যে আশ্চর্য রকমের বদলে গেছেন পুলিনবাবু। এক বছর আগেও আমাকে 'তুমি' বলে সম্বোধন করেছেন। আজ

আমাকে 'আপনি' করে বললেন। আলমারী খুলে নানা রকম চামড়া বের করে দেখালেন। এক জোড়া অক্সফোর্ড হান্টিং দরকার ছিল আমার। পুলিনবাবু খুসী হয়ে আমার পায়ের তলায় একটা কাগজ পাতলেন, পেন্সিল দিয়ে মাপ এঁকে নিলেন। ভয়ানক রকম একটা অস্বস্তির মধ্যে আমার পা-টা সিরসির করে উঠলো। যেন একটা অপরাধ করছি, মনের কোণে এইরকম একটা দুর্বলতা নিঃশব্দ গঞ্জনার মত পীড়া দিতে লাগলো। এইরকম অপ্রস্তুত অবস্থায় দাঁড়িয়ে দেখলাম, পুলিনবাবু আমার পায়ের কাছে মাথা ঝুঁকিয়ে জুতোর মাপ নিচ্ছেন। পুলিনবাবুর হাতের পেন্সিল এক অপার্থিব তুলির মত সুড়সুড়ি দিয়ে আমার পায়ের পাতার চারদিকে ঘুরছে। আমি দেখছিলাম, প্রৌঢ় পুলিনবাবুর কাঁচা-পাকা চুলে ভরা মাথাটা আমার হাঁটুর কাছে হেঁট হয়ে আছে।

এর পরেও দেখেছি, সেই মেহগনি টেবিল চেয়ার আর রঙীন পর্দা নেই। মিস্তিরি নেই। পুলিনবাবু মেজের ওপর জুৎ ক'রে বসে নিজেই কাঁচি দিয়ে হিসেব মত চামড়া কেটে মুচিদের দিচ্ছেন। পুলিন চামারের দোকান সত্যিই সার্থক হয়ে উঠেছে এতদিনে।

বন্দনাকেও আমরা প্রায়ই দেখতে পেতাম, কখনো পায়ে হেঁটে, কখনো বা রিক্সায় চড়ে হাসপাতালে যায়। বারীন সব চেয়ে বেশী চটে যেত বন্দনার সাজ-সজ্জার নিষ্ঠা দেখে। নার্সদের অ্যাসিষ্টেন্ট, কুড়ি টাকা মাইনে, তার জুতো সাড়ী আর ব্লাউজের এতটা বাহার একটু বিসদৃশ ঠেকে বৈকি। তার ওপর আবার মাঝে মাঝে রিক্সায় চড়ে! আমরা অবশ্য বন্দনার পক্ষ নিয়ে কখনো-কখনো বারীনকে প্রতিবাদ করতাম—একটু রিক্সাতে চড়লোই বা! এতটা পথ এই দুপুরের রোদে চলাফেরা করা একটা মেয়ের পক্ষে কষ্টকর নয় কি ?

বারীন একেবারে ক্ষেপে উঠতো—থাক্ থাক্, আমাকে আর শেখাতে এস না কেউ। জমকালো সাড়ী আর রিক্সার পয়সা যে এমনিতেই হয়, সে তত্ত্ব আমি বুঝি।

পথে বন্দনার সঙ্গে আমাদের মুখোমুখি দেখা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করেছি, বারীন আমাদের সঙ্গে থাকলে বন্দনা কখন ভুলেও চোখ তুলে তাকাতো না। একটু সঙ্কুচিত হয়ে মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিত। কখনো বা চকিতে মুখটা বিবর্ণ হয়ে উঠতো, যেন হঠাৎ ভয় পেয়েছে। বারীন আবার চটে উঠে বলতো—ঠিক এই, এই ধরণের হাবভাব যেসব মেয়েদের দেখা যায়, যারা ইচ্ছে করেও হাসতে পারে না, চোখ তুলে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি একটু অ্যানালিসিস করলেই বুঝতে পারবে যে, তারা শুধু চায়...।

পুলিনবাবু তো এরই মধ্যে দমে গিয়ে একেবারে অমানুষ হয়ে গেছেন। কিন্তু

পুলিন-গিন্নি দম্‌বার পাত্রী নন। যার স্বামী জুতো বেচে, মেয়ে সদর হাসপাতালে কে-জানে-কি করে, তাকে আজও একটু লজ্জিত হতে দেখিনি। যেকোনো পরিচিতা প্রতিবেশিনীর সঙ্গে দেখা হলে আলাপক্রমে একবার নিজের বংশগর্বটাকে বড় ক'রে এবং আলাপিতাকে একটু নীচুঘর প্রমাণ না ক'রে তিনি শান্ত হন না। প্রয়োজন হলে সৌজন্য ভুলে ঝগড়া করতেও কুণ্ঠিত হন না। যে সব বুড়ী নির্জলা একাদশী করতে পারে না, তাদের গায়ে পড়ে দুকথা শুনিয়ে দিয়ে আসেন। তাঁকে কেউ আমল দেয় না, তবু গায়ে পড়ে সবাইকে বিব্রত করেন। পুলিনবাবু আর বন্দনার ঠিক উল্টোটি হলেন পুলিনগিন্নী। ক্বোন্ বামুনের বাড়ীতে এক ফেঁাটা গঙ্গাজল নেই, কারা তিথি নক্ষত্র মানে না, কার মেয়ের অনগ্নে বিয়ে হয়ে গেল—সব খবর রাখেন পুলিনগিন্নী এবং সবাইকে তার জন্য কটূক্তি করতে ছাড়েন না।

কবে এবং কি করে পুলিনগিন্নী বন্দনাব একটা বিযের ব্যবস্থা ও পাকাপাকি করে ফেলেছেন, তা আমরা আগে জানতে পারিনি। কিন্তু ধর্মেব কল বাতাসে নড়ে। পাত্রের মামা বন্দনাকে আশীর্বাদ করতে এলেন এবং উঠলেন আমাদের বাড়ীতে। পাত্রের মামা আমার কাকার বন্ধু। তাঁর কাছেই সব খবর শুনলাম—তাঁর ভাগ্নে অর্থাৎ পাত্রটি হলো পাটনার একজন প্রফেসাব। বেশ ভাল চেহারা, মভার্ণ ও স্মার্ট ছেলে। পুলিন-গিন্নী বন্দনাকে নিয়ে মাত্র দুদিনের জন্য পাটনায় গিয়েছিলেন। মেয়ে দেখে পাত্র খুশি হয়েছে, পাত্রপক্ষ রাজী হগেছে।

আমরা আশ্চর্য হলাম, কাকা আতঙ্কিত হলেন। তারপরে সবাইমিলে হাসতে লাগলাম। কাকার বন্ধুমশায় অপ্রস্তুত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—'কি ব্যাপার ?'

কাকা তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন—'যাক্, আপনার ভাগ্য ভাল যে আমার এখানে উঠেছিলেন। আপনাব ভাগ্নের জন্য অন্য পাত্রী দেখুন। সব কথা পরে হবে। এখন বিশ্রাম করুন।

রাত্রিবেলা ক্লাব থেকে ঘবে ফিরেই দেখি, পুলিনগিন্নী খুড়ীমার সঙ্গে কথা বলছেন। বারান্দায় চেয়ার টেনে নিয়ে পুলিন-গিন্নীব কথাবার্তা শোনবার জন্য বসলাম।

পুলিন-গিন্নী যেন করুণভাবে আবেদন করছিলেন—'আপনি বিশ্বাস করুন দিদি, বন্দনা কখনো রোগীর বেড প্যান ট্যান ছোঁয় না। চাকরী করে এই মাত্র, তাই বলে ব্রাহ্মণের মেয়ে কি ওসব নোংরামি করতে পারে দিদি ?

একবার উঁকি দিয়ে পুলিন-গিন্নীর চেহারাটা দেখলাম। সে চেহারাই নয়। একটা প্রচ্ছন্ন আশঙ্কায় পুলিন-গিন্নীর মুখটা নিষ্প্রভ হয়ে আছে। যেন তার সর্বস্ব ডুবতে বসেছে। খুড়িমার কাছে যেন একটা পরিত্রাণের প্রার্থনা বার বার কাতর ভাবে শোনাচ্ছিলেন পুলিনগিন্নী।

খুড়িমা বললেন—এ সব কথা আমায় বলে লাভ নেই। কর্তারা যা ভাল বুঝবেন, তাই হবে!

পুলিন-গিন্নী যেন ফুঁপিয়ে উঠলেন—আপনি ভবানীর কাকাকে একটু বুঝিয়ে বলুন দিদি। ছেলের মামা ওঁর বন্ধু। আমি জানি, উনি হাঁ বললেই বিয়ে হবে, উনি না বললেই বিয়ে ভেঙে যাবে। উনি তো বন্দনাকে ছেলে বেলা থেকে দেখে আসছেন, উনি জানেন বন্দনা কেমন মেয়ে।

খুড়িমা বললেন—তাই হবে। উনি যদি ভাল বোঝেন তবে...।

পুলিন-গিন্নী ওঠবার আগে খুড়িমার হাত ধরে আর একবার অনুরোধ করলেন—আপনি একটু বুঝিয়ে বলবেন দিদি।

পুলিনগিন্নী যাবার সময় কাকার বৈঠকখানার দরজার কাছে হঠাৎ কি ভেবে দাঁড়ালেন। কাকা তখন তাঁর বন্ধুকে এই কথা বোঝাচ্ছিলেন—মেয়ে হলো হাসপাতালের জমাদারণী, এই রকম একটি মেয়ের সঙ্গে আপনার ভাগ্নের বিয়ে দিতে চান?

পাত্রের মামাবাবু কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে থেকে বললেন—না।

কথাগুলি কানে যাওয়া মাত্র, পুলিন-গিন্নী ছটফট করে পালিয়ে গেলেন।

পুলিন-গিন্নীর ষড়যন্ত্র ফেঁসে গেল, এই ব্যাপারে বোধ হয় খুশী হলো সবাই। বারীন খুসী হলো এই কারণে যে, বন্দনার বিয়ে ভেঙ্গে গেল। বন্দনার চেয়েও কত গরীবের মেয়ের বিয়ে হয়েছে বড়লোকের সঙ্গে। তার মধ্যে তো বিসদৃশ কিছু কেউ দেখেনি। গরীব বলে নয়, পুলিন বাঁড়ুয্যে আর বন্দনা, বাপ বেটি মিলে যা বেপরোয়া জুতোটুতো বেচতে আরম্ভ করলো—তারই ফল ফলছে একে একে। সমাজে কুলের প্রশ্ন হয়তো বড় পুরনো হয়ে গেছে, সে-সব নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না। এটা শীলের প্রশ্ন। এক সমাজে থাকতে হলে একই রকম শীলাচার মানতে হবেই। তার ব্যতিক্রম হলে সমাজ ক্ষমা করতে পারে না। আমরা কাল্চারের দিকটাই দেখছিলাম।

আমরা যে ভুল করিনি, তার প্রমাণ এই যে, বার বার দু'বার আমরা জিতে গেলাম। দু'বারই দুটো অন্যায় হতে চলেছিল, তাই সামান্য আঘাতে ভেঙে গেল। প্রথম অহি, দ্বিতীয় পুলিনবাবু।

ঐ মানুষগুলিও কত সহজে ও সামান্য আঘাতে ভেঙ্গে গেল। সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার বলা মাত্র হু হু করে নেমে গেল অহি। পুলিনবাবুও তাই। চামার নামে শুধু একটা কথার কথায় যেন চামার হয়ে গেলেন। আসলে ওদের মনুষ্যত্বটাই স্ক্যাভেঞ্জার ও চামার হয়ে গিয়েছিল অনেক দিন আগেই। আমরা শুধু মুখোসটা খুলে দিয়েছি। আমাদের দোষ নেই। অপবাদ দিয়ে আমরা ওদের মিথ্যে করে দিয়েছি, একথা

সত্য নয়। এবং যেটুকু শিক্ষা আমাদের বাকী ছিল তাও অল্প দিনের মধ্যে চরম করে শিখিয়ে দিল বন্দনা।

হৃদয়ভেদী এক একটি সংবাদ শুনতে পেলাম। সতু তাদের চাকরটাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে গিয়েছিল। কম্পাউণ্ডার এসে দুটো টাকা ঘুষ নিয়ে গেল। কোথা থেকে বন্দনাও এসে নির্লজ্জ ও নিষ্কম্প স্বরে চাইলো—আমারও পাওনা আছে। একটা টাকা দিতে হবে। না দিলে···।

শশীদের বাড়ীতে রোগিনী দেখতে লেডি ডাক্তার এসেছিলেন। তার সঙ্গে এসেছিল বন্দনা। লেডি ডাক্তার ফী নিলেন আট টাকা, বন্দনা পেল এক টাকা। এই ন্যায্য পাওনা ছাড়া অক্লেশে হাত পেতে বক্‌সিস দাবী করে বসলো বন্দনা।- আরও কিছু দিতে হবে।

শশীর বাবা কৃপণ মানুষ, বার বার আপত্তি তুললেন। বন্দনা জেদ ছাড়লো না। অপ্রস্তুত হয়ে, অবাক্ হয়ে, শশী তাড়াতাড়ি নিজের পকেট থেকে আট আনা বক্‌শিস দিয়ে উদ্ধার পেল।

সতু আর শশীর কাছে এই কাহিনী আমরা শুনলাম। বুঝলাম, সত্যিই মনেপ্রাণে জমাদারণী হয়ে গেছে বন্দনা।

আমাদের মনেও আর কোন অনুশোচনা নেই। যা করেছি, ভালই করেছি। অহিভূষণকে বন্দনাকে ও পুলিনবাবুকে আমরা ঘৃণা করি না, কিন্তু সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার, জমাদারণী ও চামারকে আমরা আমাদের রুচি গত জীবনের আসবে ও বাসরে গ্রাহ্য করতে পারি না। কোন অন্যায় করিনি আমর', ওদের কোন ক্ষতি করিনি আমরা, ওদের জীবিকাই ওদের কাল্‌চার নষ্ট কবেছে। ওরা যা ওরা তাই। আমরা শুধু নিজেদের বাঁচিয়েছি।

অনেক দিন পরে সমস্যাটা হঠাৎ তৃতীয় অধ্যায়ে পৌছে গেল, কিরকম যেন অদ্ভুত হয়ে উঠলো। ক্লাবে গিয়ে দেখলাম, টেবিলে দশ বারোটা রঙীন লেপাফাবদ্ধ চিঠি পড়ে রয়েছে। বিয়ের চিঠি। অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে। অহি আমাদের নেমন্তন্ন করেছে।

বিশ্রী রকমের একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। কি অদ্ভুত কাণ্ড! অহির সঙ্গে বন্দনার বিয়ে। এই কি উচিত হলো! কিন্তু কেন উচিত নয়? এই বিয়ে সমর্থন করতে কোন আনন্দ পাচ্ছি না। কিন্তু অসমর্থন করারও কোন হেতু খুঁজে পাচ্ছি না।

বারীন অযথা রেগে পাগল হয়ে উঠলো। বারীনের মতে, এটা হলো অহির সর্বনাশ। বারীন চেঁচাতে লাগলো—'শত বাজে লোক হোক অহি, তবু বন্দনার মত জমাদারনীর সঙ্গে ওর বিয়ে হতে পারে না।'

সতু ও শশী তার চেয়ে জোরে চেঁচিয়ে উত্তর দিল—'বন্দনা যতই যা তা হোক্, কোন সর্দার স্ক্যাভেঞ্জারের সঙ্গে ওর বিয়ে হওয়া উচিত নয়।'

দু'পক্ষেরই আচরণ বড় গর্হিত, হৃদয়হীনতার মত লাগছিল। ওদের নিয়ে আর মাথা ব্যথা কেন? ওরা সরে গেছে, ওরা আমাদের কেউ নয়। ওদের জীবিকা ভিন্ন, তাই ওদের জীবনও ভিন্ন। আজ ওদের কথা নিয়ে এতটা বিতণ্ডা করা আমাদের পক্ষে অনধিকার চর্চা নয় কি?

কিন্তু কার মনে কি আছে? পরের মঙ্গলের গরজেই সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। সতু ও শশী পুলিন বাবুর কাছে বেনামী চিঠি ছাড়লো—যেন এ বিয়ে না হয়। এত ভাল মেয়ে আপনার, তার জন্য ঐ সর্দার স্ক্যাভেঞ্জার পাত্র?

বারীন চার পাতা কাগজ ভরে অহিকে চিঠি লিখলো—সাবধান, নিজের সর্বনাশ করো না। বন্দনার মতো জমাদারনী মেয়েকে কি তুমি চেন না? যে-সব মেয়ে ইচ্ছে করেও হাসতে পারেনা—চোখ তুলে ভদ্রভাবে তাকাতে পারে না, তাদের মতিগতি সম্বন্ধে একটু অ্যানালিসিস করলে দেখতে পাবে যে, তারা শুধু চায়...।

তাহ'লে কি এ বিয়ে ভেঙ্গে যাবে? এর আগে দু' দু'বার তাদের বিয়ে আমরা ভেঙেছি। আমাদের নাগালের মধ্যে তারা এসেছিল, তাই। আজ কিন্তু ঘটনা সে নিয়মের মধ্যে নেই। তারা নিজের পৃথিবীতে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। তবে? তবে কি কোন উপায় নেই?

অহির বিয়ের নিমন্ত্রণ লিপি অর্থাৎ সেই রঙীন খামের চিঠিগুলি ক্লাবের টেবিলের ওপরেই পড়েছিল। কেউ আগ্রহ করে তুলে নেয়নি, সঙ্গেও নিয়ে যায়নি। কোন প্রয়োজন হয়তো ছিল না। প্রতি সন্ধ্যায় তাস খেলার সময় মাত্র দুটি করে সেই রঙীন চিঠির সদ্ব্যবহার করতাম। সিগারেটের ছাই ফেলার জন্য কোন পাত্র তাড়াতাড়ি পাওয়া যেত না, এহেন সঙ্কটে গোটা দুয়েক রঙীন খামই ভস্মাধারের কাজ করতো। তাস খেলা শেষ হলে ক্লাবের মালী এসে সতরঞ্চি গুটিয়ে রাখতো। ছাই ঠাসা রঙীন খাম দুটো ছুঁড়ে বাইরে ফেলে দিত।

অহি আর বন্দনার বিয়ে নিয়ে তর্জন-গর্জন ধিক্কার ভ্রুকুটি—সবই কেন জানি হঠাৎ চাপা পড়ে গেল। অহির বিয়ের রঙীন আবেদনের চিহ্নগুলি চোখের সামনে থাকা সত্ত্বেও ঘটনাটা যেন কারও মনে পড়লো না। অহির বিয়ের মত একটা ঘটনা, একি নিজের তুচ্ছতায় চাপা পড়ে যাচ্ছে? মাত্র কদিন আগে যারা এই ব্যাপার নিয়ে ক্ষুব্ধ হয়েছিল, তারাও যেন আজ ভয় পেয়ে চুপ করে গেছে। বারীন সতু আর শশী এ বিষয়ে কোন কথাই বলে না। শেষ রঙীন খামটা যেদিন আমাদের তাসের

আড্ডা থেকে ভস্মাবশেষ নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল, সেদিন হঠাৎ আমার একবার কৌতূহল হয়েছিল—অহির বিয়ের দিনটা কবে ?

তরে পরেই মনে হলো—জেনেই বা কি হবে ?

সন্ধ্যের দিকে খুব জোরে বৃষ্টি হয়ে থেমে গেল। ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে বের হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম। তারপর রওনা হলাম। আজই রাত্রে অহির বিয়ে। কেমন করে তারিখটা সঠিক জানতে পারলাম, জানি না। তবু বুঝলাম পুলিনবাবুর বাড়ীর দিকে চলেছি, একা একা, অন্ধকারে, চুপে চুপে।

অন্ধকারে একটু দূরে দাঁড়িয়েই দেখছিলাম, বরের আসরে বসেছিল অহি। ছোট একটি সামিয়ানা, ওপরে একটি বেলোয়ারী ঝাড়ের আলো জল্‌ছে। দুটি ছোট ছোট কার্পেট পাতা। তার ওপরে বসে আছে জন কয়েক বরযাত্রী—মিউনিসিপ্যালিটির মুন্সী হীরালাল, রামনাথ পানওয়ালা, অক্ষয় ময়রার ছেলে গোলক আরও ঐ ধরণের কয়েকজন। সবাই বেশ ভালমত সাজগোজ করে এসেছে, বেশ সজ্জনের মত বসে আছে। বড় কৃতার্থ খুসী ও গর্বিত ভাবে বরযাত্রীরা বসেছিল।

আসরের দিকে আর বেশী দূর এগিয়ে যেতে পারলাম না। আজ আবার অনেক বছর পরে অহির ঘুসি খেয়ে যেন রিং থেকে বাইরে ছিট্‌কে পড়েছি। ঐ রিংএর ভেতর অহি এখন সর্বেশ্বর। সামিয়ানার নীচে যেন এক ভিন্ন পৃথিবীর শান্ত আলো ফুটে রয়েছে। সেখানে সব চেয়ে স্পষ্ট হয়ে আছে অহি। দক্ষিণী ব্রঞ্জের চিবুক আর কপালের ওপরে চন্দনের ছিটে লেগে রয়েছে, কী সুন্দর দেখাচ্ছে অহিটাকে।

পিঁড়িতে বসিয়ে বন্দনাকে বিয়ের আসরে নিয়ে আসা হলো। বন্দনাও আশ্চর্য করলো। লাল চেলির সাড়ী জড়ানো সলজ্জ ও সন্ত্রস্ত একটা মূর্তি ধনুকের মত বেঁকে রয়েছে। হিন্দুস্থানী পুরুত মন্ত্র পড়লেন। ভীড় নেই, কলরব নেই। আস্তে একবার শাঁখ বাজলো। সকল ভদ্রয়ানার ষড়যন্ত্রের আবর্জনা সরিয়ে পুলিনবাবুর বাড়ী বাগান আর উঠোনের এক কোণে আজ একটা নতুন সংসারের রূপ স্পষ্ট ও কঠিন হয়ে উঠেছে। ইতিহাসের দেবীবর ঘটক আড়ালে আড়ালে মেল বেঁধে দিচ্ছেন। কাকা আর ক্লাবের সুগম্ভীর সমাজতত্ত্ব এইখানে এসে চরমভাবে ভুয়ো হয়ে গেছে।

হঠাৎ দেখলাম, আমার পাশে কতগুলি অপরাধী দাঁড়িয়ে আছে—সতু শশী আর, একে একে সবাই এসেছে। যাক্‌। কিন্তু বারীন কই ?

একটু পরেই দেখলাম, বারীনও আসছে। আমাদের পাশ কাটিয়ে চলে গেল, তবু আমাদের দেখতে পেল না। বিয়ের আসরটার দিকে এক লক্ষ্য রেখে ধীরে এগিয়ে গেল বারীন। একেবারে আসরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। হিন্দুস্থানী পুরুত তখন

জোরে চেঁচিয়ে মন্ত্র আবৃত্তি ক'রে হোম করছিলেন। দেখলাম, বারীন হাঁ করে অহির দিকে তাকিয়ে আছে। বারীনকে দেখতে পেয়ে অহির সারামুখে অদ্ভুত একটা হাসি উজ্জ্বল হয়ে উঠলো। বন্দনার মাথাটা আরও হেঁট হয়ে পড়লো।

কিছুক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে বারীন উঠে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। দেখলাম, পুলিন গিন্নীর সঙ্গে বারীন একটা বচসা বাধিয়েছে। পুলিন-গিন্নী হাসছেন। তারপর, পুলিনবাবুর কাছে গিয়ে বারীন হাত নেড়ে চেঁচিয়ে যেন একদফা ঝগড়া করলো। পুলিনবাবু হাসতে লাগলেন। পর মুহূর্তে বারীন কোথায় যেন চলে গেল এবং কয়েক মিনিট পরে ফিরে এল। বারীনের সঙ্গে বারীনের জেঠীমা, বারীনের বোন দীপ্তি, বারীনের ভাগ্নী ডলি।

বারীন হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পড়লো। চাকরগুলোকে ধমক দিল। শেষে স্পষ্ট শুনতে পেলাম, পুলিন-গিন্নীর ওপর চটে গিয়ে বারীন গরম গরম কথা বলছে--ছি ছি, কোন একটা ব্যবস্থা নেই আপনাদের। এ কী রকমের কাণ্ড ?

দেখলাম, দীপ্তি আর ডলি একটা ঘর থেকে জিনিসপত্তর টানাটানি করে বের করছে। বাসর ঘর তৈরী করছে। বারীনদের গোমস্তা এক ঝুড়ি ফুল দিয়ে গেল। ঘরের চৌকাঠের কাছে, একটা হ্যাসাক বাতি জ্বাল্‌বার জন্য, খুট্‌খাট্ করে কাজ করতে বসলো বারীন।

বারীনের কাণ্ডকারখানা দেখে আমাদের সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল। শেষ কালে একেবারে প্রকাশ্য ভাবেই আসরের কাছে গিয়ে আমরা দেখা দিলাম। বিয়ে তখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে।

বারীন আমাদের দেখেই বলে উঠলো —এই যে, তোমরা তো শুধু গিলতে এসেছ, গিলেই যাও।

এতক্ষণে সত্যিই একটা বিয়ে বাড়ীর কলরব জেগে উঠেছে। অহি আর বন্দনা আমাদের পাশ দিয়েই বাসর ঘরে চলে গেল। সবাই হাসি মুখে ইসারায় অভিনন্দন জানালাম। লজ্জায় ও আনন্দে অহি আমাদের দিকে একবার তাকিয়েই চোখ নামিয়ে নিল।

বেশ পেট ভরেই গিলে নিলাম আমরা। বারীন তখনও ব্যবস্থা তদারক করছে। পুলিনবাবু সাম্‌নে এসে একবার বললেন—'লজ্জা করে খেওনা কিন্তু তোমরা। লুচি-মিষ্টি যত খুসী দরকার চেয়ে নেবে।'

আজ তিন বছর পরে পুলিনবাবু হঠাৎ আবার আমাদের 'তুমি' বলে সম্বোধন করলেন।

এইবার আমরা বাড়ী ফিরবো। বারীন তখন বাসর ঘরের কাছে ঘুরঘুর করছিল। ডাকলাম বারীনকে।

বারীন সামনে এসে দাঁড়ালো। বড় বেশী ক্লান্ত দেখাচ্ছিল বারীনকে। কপালটা ঘেমে আছে, আস্তে আস্তে হাঁপাচ্ছে। মাথার উস্কো-খুস্কো চুলের ছায়ায় ওর চোখ দুটো যেন অন্ধকারে লুকিয়ে থাকবার চেষ্টা করছে।

বারীনকে বললাম—'কি হে, আর কতক্ষণ? চল এবার।'

বারীন সেই মুহূর্তে ঘাব্‌ড়ে গিয়ে যেন ব্যস্ত হয়ে পড়লো—'না এখন আমি যাব না। কাজ আছে।'

বারীনের বাড়াবাড়ি দেখে আমরা বিরক্ত বোধ করছিলাম। হয়তো আর একটু পরেই খুব রেগে উঠতাম, কিন্তু তার আগে বারীন নিজের থেকেই বেফাঁস বলে ফেললো—'খুব কষে চটাচ্ছি, কিন্তু আশ্চয মেয়ে, প্রত্যেক কথায় শুধু হাসছে।'

সকলে এক সঙ্গে আশ্চর্য হয়ে প্রশ্ন করলাম—'কাকে চটাচ্ছো? কার কথা বলছো? কে হাসছে?

হঠাৎ সাবধান হয়ে উঠলো বারীন। সাম্‌লে গেল। সেই পুরাতন শ্লথ বিদ্রূপের সুরে, একটু লঘু কুৎসার হাওয়া জাগিয়ে, শুধু কথার চালাকিতে শেষবারের মত আমাদের ফাঁকি দেবার চেষ্টা করলো—'তোমাদের মিসেস চ্যাটার্জ্জী, আবার কে? ফাইন হাসছে কিন্তু, যাই বল।'

আর বলবার কিছু নেই। বারীনকে রেখে আমরা রওনা হলাম। আরও কিছুক্ষণ থাকুক বারীন। আজ যেন ওর অন্তরাত্মা চরম ভাবে হেরে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করছে। আজ বোধ হয় বারীন সত্যিই অ্যানালিসিস করে বুঝতে পেরেছে যে - এই ধরনের মেয়েরা, যারা চোখ তুলে তাকাতে পারতো না, ইচ্ছে করেও হাসতে পারতো না, তারা শুধু চায় যে……।

শেষ